[illegible] সংখ্যা] কার্ত্তিক, ১৩৪০ [ষষ্ঠ বর্ষ

মশা ও কামান

সম্প্রতি কোনও বাংলা সাময়িক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত [illegible] লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে তিনি [illegible] উচ্ছ্বাস-প্রমাণে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরং মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি আসলে তত বড় ছিলেন না বা নন, বাংলার তরুণেরাই তাঁহাদের বড় করিয়া তুলিয়াছে। কথাটা মিথ্যা হইলেও শুনিতে বেশ।

উল্লিখিত তিন জনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জীবিত আছেন। 'বলাকা' পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাই, 'বলাকা' হইতে 'শেষের কবিতা' পর্য্যন্ত তদানীন্তন তরুণেরা তাঁহার বিরুদ্ধতাই করিয়া আসিতেছিলেন। 'সাহিত্যধর্ম্ম' প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে প্রবীণ তরুণ শরৎচন্দ্র এবং ন[illegible]ও রবীন্দ্রনাথের সহিত [illegible] কসুর করেন নাই। 'বৃ[illegible]যাই রবীন্দ্রনাথের কথা আমাদের [illegible]

পাতিয়া লইতে হইবে, এরূপ কথা আমরা মানিব না',—'রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ হইয়াছে, তিনি আমাদের পথ রোধ করিয়া বসিয়া আছেন',—'রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দেয় দিয়াছেন'—ইত্যাদি অনেক কথা তখন তরুণদের মুখে মুখে শোনা গিয়াছিল। হঠাৎ 'শেষের কবিতা' প্রকাশের ফলে একটা বিপর্য্যয় ঘটিল। যে সকল উদগ্র তরুণ 'রবীন্দ্রনাথকে প্রায় সাবাড় করিয়া আনিয়াছি' এই কল্পনা করিয়া কালনেমির লঙ্কাভাগ সুরু করিয়াছিল তাহারাই 'সাবাস গুরুদেব' বলিয়া রবীন্দ্রনাথের পদধূলি মাথায় লইল। রবীন্দ্রনাথ যাহা তাহাই রহিলেন, শুধু তরুণসম্প্রদায়ের কাছে তিনি কাঁচিয়া তরুণ হইলেন।

এদিকে দ্রুত (fast) জীবন-যাপনের ফলে অথবা যে কারণেই হউক কাঁচা তরুণদের মুখোসে একটু পাক ধরিল, তাহাদেরও পরবর্ত্তী যাহারা তাহাদের উদগ্রতায় চমকিত হইয়া নিজেদের অবস্থাটা সম্যক বুঝিবার চেষ্টায় তাহারা একটু পিছন ফিরিয়া চাহিল, দেখিল—পূরাপূরি দানা বাঁধিবার পূর্ব্বেই তাহারা যেন একটু ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহাকেই কারণ ভাবিয়া আবার কিছুদিন তাঁহাকে লইয়া টানাটানি চলিল। এই দ্বিতীয়বারের বিরুদ্ধতায় রুষিয়ার বলশেভিজ্‌মের কিঞ্চিৎ আমেজ ছিল। তিনি বিত্তশালী, বড়ঘরানা, ইঙ্গবঙ্গ সমাজের পৃষ্ঠপোষক, এই ধরণের কথা তাঁহার সম্বন্ধে উল্লিখিত হইল। 'অভিজাত-পত্রিকা' 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক কবিতা' ও 'সাহিত্যের মাত্রা' বিষয়ক প্রবন্ধে আবার অতি-আধুনিকতা অর্থাৎ তারুণ্যকে খোঁচা দিলেন। শরৎচন্দ্রও পূর্ব্ববৎ গায়ে পড়িয়া কোন্দল করিলেন।

ফলে ব্যক্তি ছাড়িয়া 'ক্লাস-ওয়ার' সুরু হইল। রবীন্দ্রনাথ হইলেন অভিজাত-সম্প্রদায়ের (বালীগঞ্জী) মুখপাত্র। তরুণেরা নিজেদের

প্রোলিটারিয়েট ধর্ম্মের বালাই লইয়া [illegible] দ্রনাথ ত[illegible] [illegible]য়া সম্প্রদায়ের লইয়া হা-মা-কা করিতে লাগিল। ইণ্টারন্যাশন্যাল [illegible]জরে তাহারা কলমের খোঁচায় এমন একটা কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যে, ড্রয়িংরুম, মোটর-বিলাসী শিক্ষিতা মহিলারা লজ্জা পাইলেন।

কাহারও নাম করিবার প্রয়োজন নাই; 'সাহিত্য-ধর্ম্ম' প্রবন্ধ রচনার কালে যাহারা ছিল অতি-আধুনিক, মরিয়া হাজিয়া ডাঁসিয়া তাহারাই এই লড়াই চালাইতে লাগিল বটে কিন্তু আসল কাঁচা তারুণ্য ততক্ষণে কূল ছাপাইয়া ভিন্ন খাতে বহিতে সুরু করিয়াছে।

এই অবস্থায় (কার্ত্তিক ১৩৪০, ভারতবর্ষ) রবীন্দ্রনাথের নূতন নাটক 'বাঁশরী'র প্রথম অংশ প্রকাশিত হইল। আপাতদৃষ্টিতে এটা রবীন্দ্রনাথের বাড়াবাড়ি মনে হইলেও তলাইয়া দেখিতে গেলে বলিতে হইবে, ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গত্যন্তর ছিল না। অনেকে ইহাতে শ্রেণী-যুদ্ধের আভাস পাইবেন, ঝাঁঝ যে একটু নাই জোর করিয়া তাহা বলিতে পারি না; অন্ততঃ 'বাঁশরী'র যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া অথবা ইঙ্গবঙ্গ সমাজ সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা না লইয়া যাহারা উক্ত সমাজ সম্বন্ধে বক্রোক্তি করে তাহাদের প্রতি শ্লেষ দুই একস্থানে তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত না পড়িলে রবীন্দ্রনাথের মনে যে কি আছে জোর করিয়া বলাও চলে না। তৎসত্ত্বেও বলিতে পারি, রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন এবং পাকা প্রবীণ পোক্ত যোদ্ধা হইলেও তিয়াত্তর বৎসর বয়সের পক্ষে যথেষ্ট কেরামতি দেখাইয়াছেন। এই বয়সে তরবারির খেলায় এমন মুন্সিয়ানা মুন্সী বার্ণার্ড শ'ও দেখাইতে পারেন নাই। এই যুদ্ধে যাহারা আহত হইবে তাহারাও বুদ্ধিমান হইলে রবীন্দ্রনাথকে নমস্কার নিবেদন না করিয়া পারিবে না।

কথা উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথ মশা মারিতে কামান দাগিয়াছেন—যদিচ মশারা দলে ভারী এবং কামান একক তথাপি এক্ষেত্রে মশা ও কামান বিষয়ক প্রবাদ বাক্যটি সত্য হইয়াছে বলিয়াই অনেকের ধারণা। অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে চান, কয়েকজন অক্ষম লেখকের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযান বলসমতার দিক হইতে সমীচীন হয় নাই ; তিনি ইহাদের উপেক্ষা করিলেই পারিতেন। 'বাঁশরী'র দুই একটি চরিত্র দুই একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির ঘাড়ে চাপাইয়াও অনেকে অনেক কথা কহিতেছেন। মোটের উপর 'বাঁশরী' লইয়া রীতিমত একটি আন্দোলন সুরু হইয়াছে।

বাঁশীতে যাহার সুরু, তাহার শেষ মসীতে অথবা অসিতে তাহা এখনও বলা চলে না ; শুনিলাম ইতিমধ্যেই ক্ষিতীশের চরিত্রকে নিজের চরিত্র কল্পনা করিয়া একজন তরুণ সাহিত্যিক 'বাঁশরী'র জবাবে 'আ মরি' নামক একটি নাটক ফাঁদিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথকে না কি তুলো ধুনিয়া দেওয়া হইতেছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে মশারা নেহাৎ মশা নয়। রবীন্দ্রনাথকে ঠিক যতটা দোষী করা যাইতেছে তিনি ততটা দোষী নন ; পাকা হাতের এইরূপ একটা মারের প্রয়োজন ছিল।

প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের আত্মরক্ষার জন্য। তিনি সমাজের যে স্তরে উদ্ভূত হইয়া জীবন ও সাহিত্যের রস সংগ্রহ করিয়াছেন, আঘাত উদ্যত হইয়াছে সেই স্তরের বিরুদ্ধে। নিজেকে এবং নিজের সমাজকে বাঁচাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে নিজের অক্ষম শিষ্যানুশিষ্যবর্গের সঙ্গেই মসীযুদ্ধে নামিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ইহাই বড় সাফাই।

আমাদের দুঃখ এই যে শাশ্বত সাহিত্যের এত বড় একজন দিক্‌পাল নিছক সাহিত্যকে, তাঁহার প্রাণের ধর্ম্মকে বাঁচাইবার জন্য এতকাল

অস্তধারণ না করিয়া নিজের দলের প্রতি মমতাবশত অনেকটা আত্ম-বিস্মৃত হইয়াই এই কাণ্ড করিলেন; ধর্ম্ম অপেক্ষা গোষ্ঠী তাঁহার নিকট বড় হইল।

তবু ইহা মন্দের ভাল; যে কারণেই আসুক রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে এরূপ একটা আঘাত না আসিলে আমাদের সন্দেহ হইত—রবীন্দ্রনাথ বুঝি জীবিত নাই। কারণ, তিনি যে বৈরাগ্যবশত এই ছোটখাট ব্যাপার উপেক্ষা আজিও করিতে পারেন না, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব ও প্রবোধকুমারের উপন্যাস-কবিতা সমালোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এমন হেঁয়ালির সৃষ্টি করিয়াছেন যে দুইটি বিভিন্ন দল সমান গলাবাজির সহিত বলাবলি করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ নিছক প্রশংসা করিয়াছেন অথবা রবীন্দ্রনাথ বেশ এক হাত লইয়াছেন। এবারে আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় নাই, যাহা লিখিয়াছেন তাহা এতই স্পষ্ট যে যাহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাহারাও বুঝিতে পারিবে।

একেবারে গোড়া হইতেই রবীন্দ্রনাথ খাপখোলা তলোয়ার লইয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার দলের বাঁশরীকে দিয়া এই সব তরুণ সাহিত্যিকদিগের একজন(ক্ষিতীশ)কে বলাইয়াছেন—

> ক্ষিতীশ, সাহিত্যে তুমি নূতন ফ্যাশনের ধূমকেতু বললেই হয়। জলন্ত ল্যাজের ঝাপটায় পুরোনো কায়দাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছ আকাশ থেকে। যেখানে তোমাকে এনেছি এটা বিলিতী বাঙালী মহল, ফ্যাশনেবল্ পাড়া। পথ ঘাট তোমার জানা নেই। দেউড়ীতে কার্ড তলব করলেই ঘেমে উঠতে। তাই সকাল সকাল আনলুম।

আপাতত একটু আড়ালে বোসো। সকলে এলে প্রকাশ কোরো আপন মহিমা।

ক্ষিতীশ একটু মৃদুরকম আপত্তি করে; কলম রবীন্দ্রনাথের হাতে; বাঁশরী বলে,

এবারে তারই প্রমাণ পেলুম তোমার এই হালের বইটাতে যার নাম দিয়েছ "বেমানান।" শস্তায় পাঠক ভোলাবার লোভ তোমার পূরো পরিমাণেই আছে। মাঝারি লেখকেরা মরে ঐ লোভে। তোমার এই বইটাকে বলি আধুনিকতার বটতলায় ছাপা, খেলো আধুনিকতা।

ক্ষিতীশ। কিঞ্চিৎ রাগ হয়েছে দেখছি; ছুরিটা বিঁধেছে তোমাদের ফ্যাশনেব্‌ল্ শার্টফ্রন্ট্ ফুঁড়ে।

বাঁশরী। রামো! ছুরি বল ওকে! যাত্রার দলের কাঠের ছুরি, রাংতা মাখানো! ওতে যারা ভোলে তারা অজবুগ।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা মেনে নিলেম। কিন্তু আমাকে এখানে কেন?

বাঁশরী। তুমি টেবিল বাজিয়ে বাজনা অভ্যাস কর, যেখানে সত্যিকার বাজনা মেলে সেইখানে শিক্ষা দিতে নিয়ে এলুম। এদের কাছ থেকে দূরে থাক, ঈর্ষ্যা কর, বানিয়ে দাও গাল। তোমার বইয়ে নলিনাক্ষের নামে যে দলকে দৃষ্টি করে লোক হাসিয়েছ সে দলের মানুষকে কি সত্যি করে জান?

ক্ষিতীশ। আদালতের সাক্ষীর মতো জানিনে, বানিয়ে বলবার মতো জানি।

বাঁশরী। বানিয়ে বলতে গেলে আদালতের সাক্ষীর চেয়ে

অনেক বেশী জানা দরকার হয়, মশায়। যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য, এখন সাবালক হয়েছ তবু ঐ কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হোলেই তাকে বলে সাহিত্য।

ক্ষিতীশ। ছেলে মানুষী রুচিকে রস জোগাবার ব্যবসা আমার নয়। আমি এসেছি জীর্ণকে চূর্ণ করে সাফ করতে।

বাঁশরী। বাস্‌রে! আচ্ছা বেশ; কলমটাকে যদি ঝাঁটাই বানাতে চাও তাহোলে আস্তাকুঁড়টা সত্যি হওয়া চাই, ঝাঁটা-গাছটাও, আর সেই সঙ্গে ঝাড়ু-ব্যবসায়ীর হাতটাও। এই আমরাই তোমাদের নলিনাক্ষের দল, আমাদের অপরাধ আছে ঢের, তোমাদের আছে বিস্তর। কসুর মাপ করতে বলিনে, ভালো করে জানতে বলি, সত্যি করে জানাতে বলি, এতে ভালোই লাগুক মন্দই লাগুক কিছুই যায় আসে না।...আমাদের দলেও মানান বেমানানের একটা নিক্তি আছে। চিটেগুড় মাখিয়ে কথাগুলোকে চট্‌চটে করে তোলা এখানে চলতি নেই। ওটাতে ঘেন্না করে।...অশ্বত্থামার ছেলেবেলাকার গল্প পড়েছ। ধনীর ছেলেকে দুধ খেতে দেখে যখন সে কান্না ধরল, তাকে পিটুলি গুলে খেতে দেওয়া হোলো। দু'হাত তুলে নাচতে লাগলো দুধ খেয়েছি বলে।

ক্ষিতীশ। বুঝেছি, আর বলতে হবে না। অর্থাৎ আমার লেখার পিটুলি-গোলা জল খাইয়ে পাঠক শিশুদের নাচাচ্ছি।

বাঁশরী। বানিয়ে-তোলা লেখা তোমার, বই-পড়া লেখা। জীবনে যার সত্যের পরিচয় আছে তার অমন লেখা [illegible] লাগে।

গত পাঁচ বৎসর যাবৎ আমরা শনিবারের চিঠির মারফৎ এই কথাটাই বলিতে চাহিতেছিলাম—অতি আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তি জীবনের সত্যে নয়; অক্ষম কল্পনায়-কল্পিত, পাঠ্য পুস্তক হইতে নিতান্ত অন্যমনস্কতায় আহৃত কতকগুলি বুলি লইয়া এই সাহিত্য—সত্যসংস্পর্শ-লেশহীন। এতকাল পরে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সহজ সত্যকথাটা বলিবার জন্য তাঁহাকে একটি নাটকের আশ্রয় লইতে হইল। মধ্যে মধ্যে তরুণ সাহিত্যিকগণের ব্যাজস্তুতি না করিয়া যদি তিনি পূর্ব্বেই তাঁহার মনোভাব প্রকট করিতেন তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের এই ক্ষিতীশ-সম্প্রদায় এতখানি বাড়াবাড়ি করিতে সাহস করিত না।

এই নাটকের আর একটি দোষ এই যে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ নাট্যকারের মত সকল চরিত্রের প্রতি সমান মমতা বা নির্ম্মমতা দেখাইতে পারেন নাই; সতীশ-সুধাংশু-তারক এণ্ড কোম্পানির প্রতি তাঁহার টানটা স্বতঃই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলে ক্ষিতীশকে নাস্তানাবুদ করিবার প্রচেষ্টা দুই এক স্থলে হাস্যকর হইয়া পড়িয়াছে—যথা, ক্ষিতীশের এণ্ডির চাদরে কালীর দাগ সম্পর্কিত মন্তব্য।

Better too late than never—দেহগত বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে শেষ পর্য্যন্ত এই স্রোতের মুখ ফিরাইবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন এজন্য তাঁহাকে নমস্কার করি। নিজে তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'দীনাহীনা' বঙ্গবাণীকে উপেক্ষা করিতেছিলেন এইরূপ একটা জনরব সৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার দীর্ঘ ষাট বছরের সাধনার বস্তুকে যে-আধুনিকতা বারম্বার লাঞ্ছিত ও [illegible] হইয়াছে তিনি নীরব থাকিয়া যেন তাহাকেই প্রশ্রয় দি[illegible] একটা ধারণা লোকের মনে জন্মাইয়াছিল। মৃত্যুর

সহিত মুখামুখি দাঁড়াইয়াও যে তিনি তাঁহার প্রতিবাদহস্ত উত্তোলন করিলেন ইহাতে আজ প্রমাণ হইল—বাংলাসাহিত্যকে এখনও তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

আমরা দর্শক, শেষ পর্য্যন্ত ইহার ফল কি দাঁড়ায় দেখিবার জন্য আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আপাততঃ আমরা শুধুই দেখিয়া যাইতেছি, রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য কি কি :

১। আধুনিক সাহিত্যিকদের লিখিবার বিষয় ও লিখিবার পদ্ধতি।

> "জয়দেব পদ্মাবতীকে নিয়ে তাজা গল্প। জয়দেব দূর থেকে ভালবাসে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে। রাজবধূর যেমন রূপ তেমনি সাজসজ্জা, তেমনি বিদ্যেসাধ্যি। অর্থাৎ একালে জন্মালে সে হোতো ঠিক তোমারি মতো শৈল (বালীগঞ্জী)। এদিকে জয়দেবের স্ত্রী ষোল আনা গ্রাম্য, ভাষায় পানাপুকুরের গন্ধ, ব্যবহারটা প্রকাশ্যে বর্ণনা করবার মতো নয়, যে সব তার বীভৎস প্রবৃত্তি, ড্যাস্ দিয়ে ফুট্‌কি দিয়েও তার উল্লেখ চলে না। লেখক শেষকালটায় খুব কালো কালীতে দেগে প্রমাণ করেছে যে, জয়দেব স্নব্। পদ্মাবতী মেকি, একমাত্র খাঁটি সোনা মন্দাকিনী।"

"শেয়ালদহ ষ্টেশনে কি গাইড রাখতে হয় চেঁচিয়ে জানাতে যে কলকাতা সহরটা রাজধানী! এই পরশু দিন পড়েছি আপনার "বেমানান" গল্পটা। পড়ে হেসে মরি আর কি। ...আচ্ছা সত্যি বলুন, নিশ্চয় ঘরের লোক কাউকে লক্ষ্য করে লিখেছেন। রক্তের যোগ না থাকলে অমন অদ্ভুত সৃষ্টি বানানো যায় না। ঐ যে, যে-জায়গাটাতে মিস্টার কিষেণ

গাপ্টা বি-এ ক্যাণ্টাব, মিস্ লোটিকার পিঠের দিকের জামার ফাঁক দিয়ে আঙটি ফেলে দিয়ে খানাতল্লাসীর দাবী করে হো হা বাধিয়ে দিলে!·· আপনার লেখা ভয়ানক রিয়ালিষ্টিক ক্ষিতীশবাবু। ভয় হয় আপনার সামনে দাঁড়াতে।"

"মোষ্ট ইণ্টারেষ্টিং—আপনার বইখানা। এমন সব মানুষ কোথাও দেখা যায় না। ঐ যে মেয়েটা কী তার নাম—কথায় কথায় হাঁপিয়ে উঠে বলে, মাই আইজ, ও গড্—লাজুক ছেলে স্যাণ্ডেলের সঙ্কোচ ভাঙবার জন্যে নিজে মোটর হাঁকিয়ে ইচ্ছে করে গাড়িটা ফেললে খাদে, মৎলব ছিল স্যাণ্ডেলকে দুই হাতে তুলে পতিতোদ্ধার করবে। হবি তো হ' স্যাণ্ডেলের হাতে হোলো কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার। কী ড্রামাটিক, রিয়ালিজমের চূড়ান্ত! ভালোবাসার এত বড়ো আধুনিক পদ্ধতি বেদব্যাসের জানা ছিল না। ভেবে দেখুন, সুভদ্রার কত বড়ো চান্স মারা গেল, আর অর্জ্জুনেরও কব্জি গেল বেঁকে।"

২। পথ ও উপদেশ—

"সত্যি করে দেখতে শেখো, সত্যি করে লিখতে শিখবে। চারিদিকে অনেক মানুষ আছে, অনেক অমানুষও আছে, ঠাহর করলেই চোখে পড়বে। দেখো দেখো ভাল করে দেখো।"

৩। এথীনা, মিনর্ভা ও পানওয়ালী—

"পোড়া কপাল আমাদের! এথীনা! মিনর্ভা মরে যাই! ওগো রিয়ালিস্ট, রাস্তায় চলতে যাদের দেখেছ পানওয়ালীর

দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মুর্ত্তি, তারাই সেজে বেড়াচ্ছে, এথীনা মিনর্ভা।...মিনর্ভার মুখোসটা ফেলে দাও টান মেরে। ঠোঁট লাল করে তোমাদের পান-ওয়ালী যে মন্তর ছড়ায় ঐ আশ্চর্য্য মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তরই ছড়াচ্ছে।"

জানি, তথাকথিত তরুণেরা এই সকল মতামত ও উপদেশ সহসা শিরোধার্য্য করিবে না। মেঘ জমিতেছে অ্যাটমসফিয়ারে ডিপ্রেশন দেখা যাইতেছে; একটা ঝড় সুরু হইল বলিয়া। এই যুদ্ধে তরুণেরা বৃদ্ধ শরৎচন্দ্রকে দালাল না পাকড়াইলেই ভাল করিবে।

আমরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

কয়েকজন মফঃস্বল এজেন্ট শনিবারের চিঠি বিক্রয়ের মূল্য নিয়মিত না দেওয়াতে আমরা সেই সব এজেন্টকে পত্রিকা দেওয়া বন্ধ করিলাম। অতঃপর যে এজেন্ট নিয়মিত টাকা পাঠাইবেন না, তাঁহাকেও আমরা পত্রিকা দেওয়া বন্ধ করিব।

সুতরাং পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি তাঁহারা যথাসম্ভব আমাদের নিকট হইতেই গ্রাহক হইবেন—ইহাতে তাঁহাদের পত্রিকা পাওয়ায় অযথা বিলম্ব হইবে না, এবং নিয়মিত পাইবেন।

রেলোয়ে বড় ষ্টল্ সমূহে শনিবারের চিঠি নিয়মিত পাওয়া যায়।

বেল ও বোল্‌তা

(প্রাচীন নর্থপোলীয় কবিতা হইতে)

বেল কয়, "কাছে আয় ওলো সই বোলতা
কি করে হলুদ রঙ্‌ পেলি তুই খোলতা !
হলুদ বরণ তোর গিনি-সোণা-জিনিয়া
মোর মরমের রঙ্‌ নেছে যেন চিনিয়া !
কাছে এসে ভালো করে চেয়ে দেখ ভিতরে
বাহিরে সবুজ মোর ভিতরে যে পীত রে !
সবুজে ও পীতে হল যে প্রণয়-পিত্ত
হজম করিবে সে যে প্রেয়সীর চিত্ত !
আয় সখি গায়ে বোস্‌"

—এই শুনি পেয়ারা

কহিল, "ভুলোনা যেন হুল্‌টা যে বেয়াড়া !

—বিষে আছে ভরে তা' !"

বেল কয়, "রে পেয়ারা, ছাল মোর শক্ত
না হলে কি হই কভু বোল্‌তার ভক্ত !

—তুই শুধু সরে যা !"

শ্রীবন্দ্যোজাতা মুখোপাধ্যায়

লি, লিট্‌।

———

বনবাসের ডায়েরি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শূর্পনখা আমার কাছে আসিয়া কহিল—তুমি সীতাকে পরিত্যাগ কর—তোমার যদি বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ না পাইয়া থাকে তাহা হইলে সীতার মত একটি কৃশোদরা বিরূপা অসতী লইয়া আর এক মুহূর্ত্তও বাস করিও না—আমার দিকে একবার চাও মাইরি, আমার যে আর সহ্য হয় না। সীতা মাগীকে এখনই আমি তোমার সম্মুখে গিলিয়া ফেলিতেছি—সতীনের পথে জন্মের মত কাঁটা পড়িয়া যাক।

By Jove, শূর্পনখা সত্যই সীতাকে ভক্ষণ করিবার জন্য উদ্যত হইল। সীতা ত প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে এখন উপায়? লক্ষ্মণকে ডাকিয়া কহিলাম—তুমি এরূপ ইতর স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইয়ার্কি করিয়া বড় অন্যায় করিয়াছ, এখন ইহাকে সামলাও। একেবারে মারিয়া ফেলিও না—উহার অঙ্গহানি করিয়া ছাড়িয়া দাও। লক্ষ্মণ আমার আদেশ পাইবামাত্র লাফ দিয়া উঠিয়া শূর্পনখার নাক ও কান কাটিয়া ফেলিল। শূর্পনখা যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল—তাহার সমস্ত মুখচোখ রক্তে ভিজিয়া উঠিল। এই বীভৎস কাহিনীটি লিখিতে কলম সরিতে চাহে না। আমাদের বনবাসের ইতিহাসে স্ত্রীলোককে লইয়া এই প্রথম কলঙ্ক ঘটিল এবং ইহার পরিণাম যে শুভ নহে এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

হে মহাকাল, হে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা তোমাকে নমস্কার করি, তুমি রয়্যাল ফ্যামিলির ছেলেদিগকে এ কি পথে চালনা করিয়া লইয়া

যাইতেছ তাহা বুঝি না, কিন্তু আমার মনে হইতেছে আমাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ মুখ-ব্যাদান করিয়া আছে—এবং আমরা সেই দিকে দ্রুত ধাবিত হইয়া চলিতেছি। আজ একটু introspectionএ ঢুকিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমিই যে অযোধ্যার প্রিন্স রামচন্দ্র তাহা শত চেষ্টাতেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আমার সে গাম্ভীর্য্য কোথায়? আমার সে আত্মসম্মানবোধ কোথায়? যত সব ছোটলোকের পাল্লায় পড়িয়া নিজেকে অত্যন্ত ছোট করিয়া ফেলিয়াছি—এবং তাহারই ফলে শূর্পনখার মত একটা pitiable hagএর সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত এই সব করিতে হইল! উচ্চ শ্রেণীর মদ খাইতে যে অভ্যস্ত সে আজ চণ্ডু চরস খাইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে! বনবাসের ইতিহাসের এটা যে একটা decisive ঘটনা একথা স্বয়ং বাল্মীকি পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন, এবং আমারও এবিষয়ে মতভেদ নাই।

সাত পাঁচ ভাবিতেছি এমন সময় দেখি একটি দুইটি নয় চৌদ্দজন গুণ্ডাজাতীয় লোক আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। শূর্পনখা তাহার ভাই 'খর'কে নাক কান কাটার সংবাদ দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলে এবং তাহার ফলে খর এই চৌদ্দজন রাক্ষসকে পাঠাইয়াছে। ইহারা যতই লম্ফ ঝম্ফ করুক আমার সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কেন? আমি একে একে উহাদিগকে সাবাড় করিয়া ফেলিলাম। আমাদের দাঙ্গাটি শূর্পনখা দূর হইতে দেখিতেছিল। যখন সে দেখিতে পাইল—চৌদ্দজনের একজনও জীবিত রহিল না তখন সে আবার খরের নিকট ছুটিয়া গিয়া casualtyর সংবাদ দিল। আশ্চর্য্য এই রাক্ষসের জাতি! নাক এবং কান কাটিয়া গেল তবু একটি স্ত্রীলোক তাহাতে কাবু হইল না।

যাহা হউক ব্যাপারটা ক্রমশই জটীল হইয়া উঠিতেছে। খর স্বয়ং চৌদ্দ হাজার সিপাই লইয়া আমার বিরুদ্ধে লড়িতে আসিল। Thanks to my অস্ত্রগুরু, আমি একে একে সিপাইকুল নির্ম্মূল করিলাম—খরও রেহাই পাইল না। লক্ষ্মণকে গিরিগুহার ভিতর সীতা দেবীর গার্ড হিসাবে রাখিয়া আমি যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলাম।

লক্ষ্মণকে আমার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট করিয়া লইলে সীতা হয়ত ভয়ে কেলেঙ্কারি বাধাইয়া তুলিত। "পতি পরম গুরু" অথবা "স্ত্রী পতির সহধর্ম্মিণী" এইরূপ কোনো সেণ্টিমেণ্টে সে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই আসিয়া উপস্থিত হইত! দায়ে পড়িয়া স্ত্রীলোককেও যুদ্ধ করিতে হইয়াছে ইতিহাসে এরূপ উল্লেখ আছে—কিন্তু পারতপক্ষে উহাদিগকে পুরুষের এই মনোপলির ক্ষেত্রে আসিতে না দেওয়াই ভাল।

অযোধ্যাদর্পনের পাঠক একবার ভাবুন ত আপনার স্ত্রী সিপাই সাজিয়া কুচকাওয়াজ করিতে গিয়াছেন এবং আপনি আপনার কনিষ্ঠ সন্তানটিকে ঘাড়ে করিয়া অন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। শিশু মা মা করিয়া কাঁদিতেছে এবং আপনি ক্রমাগত নিজেকে দেখাইয়া বলিতেছেন, এই ত মা, এই ত মা, কিংবা একটা উড়ন্ত পাখীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, ঐ যে মা উড়িতেছে—এখনি পাখা চালাইয়া আসিয়া পড়িবে। আমি জানি এরূপ কল্পনা করিয়া আপনি সুখ পাইতেছেন না। এ সম্বন্ধে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদে যদি দেশে ফিরিতে পারি তাহা হইলে কয়েকদিন সভা করিয়া এবিষয়ে লেকচার দিব। সংবাদটা রাবণের কর্ণগোচর হইল। অমনি রাবণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া মারীচের নিকট ছুটিয়া আসিল। রাবণ প্রস্তাব করিল—সে সীতাহরণ করিয়া ইহার শোধ তুলিবে। কিন্তু মারীচ ইহাতে রাজি হইল না—

উপরন্তু রাবণকে বিস্তর কটু কথা শুনাইয়া দিল। সে বলিল—রাম একজন বিশেষ ক্ষমতাবান যোদ্ধা—তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা করিলে তোমার পক্ষে খুব সুবিধাজনক হইবে না। রাবণ একথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া লঙ্কায় ফিরিয়া আসিল। আসলে রাবণ লোকটা মূলত খারাপ নয়—লজ্জা পাইবার মত কাজে তাহার লজ্জা হয়।

(ক্রমশ)

আত্মম্ভরী লোক সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা এই যে সে ক্রমাগত নিজের কথাই বলে—অন্যলোকের কথা কিছু বলে না।

—

স্বামী—কাল রাত্রে কিন্তু আমি নিঃশব্দে বাড়ি ফিরেছি—কিন্তু তুমি জেগে ছিলে কেন ?

স্ত্রী—বা—রে! তোমার আসার শব্দেই ত আমার ঘুম ভেঙেছে।

স্বামী—ওটা তোমার ভুল। আমাকে যে চার জন লোক ধরাধরি করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল, তারাই গোলমাল করেছিল!

—

—আপনার আফিসে কজন কেরানী কাজ করে ?

—প্রায় অর্দ্ধেক।

পলাতকার প্রতি

[দেশবড়ারী রাগাষ্টতালীতালাভ্যাং গীয়তে]

বলিতে যদি কিঞ্চিদপি মুচ্‌কি হেসে চাঁদমুখী
হৃদয় মম উঠিত নেচে আহ্লাদে
নয়না ঠেরে হানিলে বুকে চাহনি ফুল-কার্ম্মুকী
যেতাম চলে সটান ভ্যাল্‌হাল্লাতে ॥ ১ ॥

প্রিয়ে ! হারু শীলে (শেষে হারু শীলে !)
করিলে নাকি প্রেম-মণি-দানং ?
হায়রে এ কি ! পরাণ-সখি, হারুকে গিয়ে শেষকালে
করালে মুখকমল মধু পানং ! ॥ ২ ॥

সত্য যদি চটিয়াছিলে আমার 'পরে মানময়ী
দিলে না কেন বচন শর ঘাতং ?
শুনিলে গুটিকয়েক তব ধারালো বাণী শান্‌ময়ী
তখনি সখি হতাম আমি কাতং। ॥ ৩ ॥

অথবা যদি কণ্ঠে মম ঘটাতে ভুজ-বন্ধনং,
মশক সম দশন ক্ষত গণ্ডে গো—
অমিয়-হ্রদে পরাণ মম করিত শুধু সন্তরণ্‌
স্বর্গসুখ পেতাম তদ্দণ্ডে গো। ॥ ৪ ॥

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি লোহু চুসনং
ত্বমসি মম পিরিতি রতি সঙ্গিনী—
আমায় ছেড়ে করিলে শেষে হারুর ঘরে ঘুষণং
ছি ছি ছি ! তুমি এমন রস-রঙ্গিনী ! ॥ ৫ ॥

হারুটা অতি বেয়াড়া ছোঁড়া ফচ্‌কে পাজি চ্যাংড়া গো
তাহার 'পরে দারুণ দারু-খোরং
দু'দিন পরে খেদায়ে দিবে মারিয়ে পিঠে খ্যাংরা গো
তখন হবে বিপদ অতি ঘোরং। ॥ ৬ ॥

এখনো বলি, ফিরিয়া এসো আমার কাছে মান্‌ময়ী
হারুর মুখে মারিয়া পদ-পল্লবং—
দুপুর রাতে শোনাব নিতি গজলগীতি তান্‌ময়ী
আবার হব তোমার হৃদি-বল্লভং। ॥ ৭ ॥

প্রফেসর—ভারি অন্যায়—'কি ক'রে স্মৃতিশক্তি বাড়ে', আমার লেখা এই বইখানার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড লোকটাকে দিলাম—অথচ সে তার দাম দিতে ভুলে গেছে, আমিও লোকটার নাম মনে করতে পারছি না।

কালীঘাটের পথে*

(সমালোচনা)

ডবলক্রাউন ষোল পেজী এই নিতান্ত সাধারণ চেহারার কেতাব-খানি ভ্রমণকাহিনী জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। সচিত্র। মোটা আইভরি ফিনিশ কাগজে ছাপা, কাপড়ে বাঁধাই, তার উপরে আবার আলোয়ান—বইয়ের বাজারেও তো শীত গ্রীষ্ম আছে! আলোয়ানের উপরে চৌকো জেলখানার মধ্যে উপন্যাস সম্রাট শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতে লিখিতে লেখেন নাই—

> মাইরি টাট্টু, তুমি যে কচু, ধর্ম্ম করতেই শুধু যাওনি, ধর্ম্মের সঙ্গে কম্ম করেছ, কালীঘাটের মা কালীকে ছেড়ে যে যাত্রীদের পোঁট্‌লা পুঁটলির দিকেও নজর রাখতে পেরেছ এতে ভারী খুসী হয়েছি। বয়স হয়েছে বেশী, আর একটু পষ্ট করে লিখলে আনন্দ বেশী পেতাম। বুঝলে?

উল্টোপিঠে Amrita Bazar Patrikaই কোন্ না লিখিয়া পারিবে—

---

* এই পুস্তকখানি এখনও লিখিত হয় নাই, তবে তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমান টাট্টু স্যাণ্ডেল (পৈতৃক নাম নয়, পিতামাতা নাম রাখিয়াছিলেন গদাধর সান্যাল; কৈশোরে বালেশ্বরে অবস্থান কালে একবার কাবুলী স্যাণ্ডেল পায়ে টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া

> ...clear insight into all the recesses of...... articulate...inaudible...pathos...Mr. Sandel has got a microphone...as a megaphone...

আবার শেষের দিকের আলোয়ানের উল্টাপিঠে ঠাট্টু স্যাণ্ডেলের বিশ্ববিশ্রুত উপন্যাস 'হৈ হৈ' সম্বন্ধে 'অপচয়' পত্রিকার অলিখিত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যই বা থাকিবে না কেন—

> "...এতগুলো মেয়ে পুরুষকে স্পষ্ট করে...সে ক্ষমতা আছে লেখকের।"

এবং আলোয়ানের শেষ ভাঁজে টাট্টু স্যাণ্ডেলের নূতন উপন্যাস 'মাইরি প্রাণ' সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন। মোটের উপর, 'কালীঘাটের পথে' ভ্রমণকাহিনী—সাহিত্যমহাসাগরে একটি 'ভীম-ভাসমান মাইন'এর মত হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতা প্রবাসী, নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ নন্, শ্রীযুক্ত চট্‌পটি মুখোপাধ্যায় 'দুত্তোর' সম্পাদক ধাপ্পা চক্রবর্ত্তীকে একটি পত্রে লিখিয়াছেন—পত্রটি 'দুত্তোরে' প্রকাশিত হইয়াছে—

> ভায়া হে, হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের সেই লেখাটা তো তোমার মনে আছে যেখানে হেগেল কাণ্ট আর কোঁৎকে নিয়ে তিনি

একটি বালিয়াড়ির চূড়ায় উঠিবার পর হইতেই পাড়ার বন্ধুরা গদাধরকে টাট্টু স্যাণ্ডেল বলিয়া ডাকিতে থাকে। (পৈতৃক নাম লোপ পাইয়া এই নামটাই শেষাশেষি বহাল থাকে) শাসাইয়াছেন যে তিনি অচিরাৎ এই অপূর্ব্বলিখিত ভ্রমণকাহিনী খানি প্রকাশ করিবেন। ছবিও নাকি থাকিবে, মায় টাট্টুর নিজের সেই 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' প্যাটার্ণের ছবিটা। ছোটবাবু বিলিয়ার্ড চাটুজ্জে নাকি মাসে মাসে উহা ছাপিবেন বলিয়াছেন; অনার্য্য পাবলিশিংএর তরফ হইতে টাক চৌধুরী বহিখানি প্রকাশ করিবার জন্ম ওৎ পাতিয়া আছেন। দাম হইবে দুই আনা।

ব্যাড্‌মিণ্টন খেলেছেন ; মোড় ফেরাতে গিয়ে এক জায়গায় বলে ফেলেছেন L' Infedelta abbattuta অর্থাৎ পথেই পথের শেষ। বার্গস কিন্তু বলেন অন্য কথা—Amor vuol sofferenze অর্থাৎ ultimate goal is reality. আসলে Aldousএর কথা মেনে নিতে হলে দুজনকেই অবিশ্বাস করতে হয় ; Johannes Lascoর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে হয় 'কালীঘাটের পথে' একটা সুর—টাট্টু স্যাণ্ডেল তাল দিতে দিতে চলেছেন—তাল কেটেছে সেই জায়গাটায় যেখানে—যাক্, বইখানা তুমি পড়ে দেখো। পৃথিবীর Travels সাহিত্যে 'কালীঘাটের পথে' থার্ড ক্লাসের সেভেন্‌থ প্লেস পাবে। এ নিয়ে জোলাপ রায়ের সঙ্গে আমার একটু মনকষাকষি হয়ে গেল। প্রথমা মিত্র আর নন্দিনী মুখোপাধ্যায়ের শেষ বই দুখানা পড়েছ তো ?

শ্রীযুক্ত ডিকেণ্টার চৌধুরী নেশা ছাড়িয়া দিলেও লেখা ছাড়েন নাই। 'কালীঘাটের পথে' সম্বন্ধে তিনিও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

রবীন্দ্রনাথের মতো যৌবন সবাই পায় না। ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছেন তিনি আর এই আমি। আমার লেখার মধ্যে রসটাই ছিল বেশী তাই সেটা গেল গড়িয়ে। আসলে বাংলাদেশে পড়ে ক'জন—শেয়ার মার্কেটের দর আর অ্যামুজমেণ্ট-কলম ছাড়া! তাই বলছি লেখা না লেখা একই কথা। শ্রীমান টাট্টু যাই লিখুক, আমার চাইতে যে তাঁর হাত কাঁচা তা তিনিও জানেন, যারা পড়ে না তারাও জানে। অতএব 'কালীঘাটের পথে' নেহাৎ মাঠে মারা যাবে কারণ

আমার লেখার কদর যে দেশে হ'ল না সেখানে হুইস্কি ছেড়ে মোদক খাওয়া বোকামি। মোদ্দা কথাটা এই যে পলিটিকেল টিক্ টিক্ করা ছাড়া অন্য পথ নেই।

পরম্পরায় খবর পাইলাম, 'কালীঘাটের পথে' সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাকি ছ' পৃষ্ঠাব্যাপী এক চিঠি টাট্টু স্যাণ্ডেলকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি সেটা ব্লক করিয়া ছাপাইবার জন্য ছুটাছুটি সুরু করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই লিখিয়াছেন—

> মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার কাঁচা সংকোচে বার্দ্ধক্যের শেষ ধাপে এসেও আমার হচ্চে লজ্জা। লোলুপতার গ্লানিই যখন হ'ল গায়ে মাখা ভোগটাকে ভাগিয়ে দেওয়া সেখানে অপৌরুষ। চোখ চেয়ে তুমি দেখেচ, চোখ মেরে তুমি নিতে পারনি কেন? মোটের ওপর, পৌরুষ আর অপৌরুষ এই দুইয়ে মিলে······

বইখানি 'ছোটবাবু'কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। 'উপক্রমণিকায়' আছে—

> পটল যখন মেলে না বাজারে, আলু নিয়েই তখন করতে হয় আমাদের কারবার। আসলে আলু-পটল কিছু নয় বাজারটাই হচ্ছে সত্য। সেই সত্যের সন্ধান পেলেম বাগ-বাজারে যেখানে থান ইঁটের ওপর মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন। সে মিলন নেহাৎ আপন খেয়ালে, বন্ধুত্বের প্রয়োজনে নয়, প্রেমের প্রয়োজনে নয়—স্বার্থের প্রয়োজনেও নয়।
>
> সঙ্গে আলুও ছিল না, পটলও ছিল না, একাই করেছিলাম যাত্রা। এক প্যাকেট 'গোল্ড-ফ্লেক' সিগারেট

আর ছোটবাবুর দেওয়া ফাউণ্টেন পেনটি ছিল সম্বল ; সিল্কের চাদরটি ক্যালকাটা ডাইং ক্লীনিংএ দিয়ে এসেছিলাম। কারো উপর অভিমান করিনি কারণ অভিমান করবার মতো পয়সা সঙ্গে ছিল না।

বৈশাখ মাস, খাঁ খাঁ রৌদ্র, দ্বিপ্রহর। সম্মুখেই কল-নাদিনী গঙ্গা। গঙ্গার ধারে সারি সারি পাতা থান ইট—তারই একটাতে গিয়ে বসলাম।

বসেই আছি·········

সেই কবে মহাতপস্বী ভগীরথ গিরিকন্যা গঙ্গাকে আকর্ষণ করে নিয়ে এলেন মর্ত্ত্যে, মান্‌লেন না শিবের জটার বাঁধন, ঐরাবতের কোপ—জাহ্নুমুনির জঙ্ঘা। গোমুখী থেকে টেনে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত······

হঠাৎ কাঁধে কার কড়া হাতের শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম। চমকিয়ে চেয়ে দেখি লুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জী পরিহিত এক সন্ন্যাসী—মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেন, চড়াব ?

অভ্যাস ছিল। 'হাঁ না' কিছুই বললাম না।

দুটো টান মেরে ফিরিয়ে দিতেই মনে হল, "আমরা স্থাণু, সীমাবদ্ধ, গৃহগত-প্রাণ, শহর-সভ্যতার জোয়াল কাঁধে নিয়ে চোখে ঠুলি বেঁধে ঘুরি, তখন বুঝিনে এর বাইরে আছে বৃহত্তর জগৎ, উদার জীবন ; প্রতিদিনের লাভ-ক্ষতি, চূর্ণ-ভগ্ন জীবনের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতার পিছনে আছে যে একটি পরম আহ্বান······"

বল্‌লাম, তীর্থে যাবে ? কালীঘাট ?

সন্ন্যাসীপ্রবর ট্যাঁকে হাত দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়লেন। আমার মগজে তখন স্বয়ং মহাদেব আর রবীন্দ্রনাথ ভর করেছেন, বললাম, কুছ পরোয়া নেই······

ভাবলাম—ওরে ভয় নাই নাই স্নেহ মোহ বন্ধন,
ওরে আশা নাই আশা শুধু মিছে ছলনা ;
ওরে ভাষা নাই নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলসেজ রচনা।
আছে শুধু পাখা আছে মহা নভো অঙ্গন······

(ক্রমশ)

রোগীর জন্য যত ডাক্তারই আসে কেউ রোগনির্ণয়ে একমত হয় না। কেউ বলেন হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল, কেউ বলেন যকৃৎ খারাপ, কেউ বলেন গলষ্টোন। রোগীর অবস্থা ভাল ছিল, তিনি ক্রমাগত ডাক্তার ডাকিতে লাগিলেন। একজন দুইজন হইতে নয় জন ডাক্তার একত্র হইল—কিন্তু কাহারও সঙ্গে কাহারও মতের মিল হইল না। ডাক্তারদের মধ্যে তর্ক ক্রমে ঝগড়ায় পরিণত হইল। ইহার পরে আসিলেন আরো একজন। পূরা দশজন ডাক্তার একসঙ্গে রোগী দেখিলেন—কিন্তু কি আশ্চর্য্য এখন সকলেরই মত মিলিয়া গেল—সকলেই সমস্বরে বলিলেন, রোগী মরিয়া গিয়াছে !

—

সাপ ও ব্যাং

সাপের মাথায় লাথি মেরে গেল ব্যাং
অবাক হইয়া দেখিলাম চেয়ে চেয়ে
পঞ্চীচারীর কর্ত্তাভজার গ্যাং
শোধ তুলে নিল কর্ত্তার নাম গেয়ে।
মুচকি হাসিয়া কহিল বিনয়-বাণী—
'বৈষ্ণব মোরা সুনীচ নিরভিমানী ;
প্রভুরে সুমুখে রাখি
মোরা পশ্চাতে থাকি
আর ঢিল ছুঁড়ি—তাদের লক্ষ্য করে,
যাদের নিকটে যাইতে পারিনা ডরে।

কার্ত্তিকেয়-কাহিনী

একদিন দেবরাজ ইন্দ্র মানসশৈলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। মন মোটে ভালো নাই। দৈত্যদের নিকট বারবার হারিয়া গিয়া তাঁহার মানসিক অবস্থাটা 'মোহন-বাগান'এর ক্যাপ্টেনের মনের অবস্থার মত হইয়াছে। কি করিয়া এই দানবদের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়! নানাবিধ চিন্তায় যখন তিনি আকুল তখন সহসা তাঁহার কর্ণে এক রমণীর আর্ত্তনাদ প্রবেশ করিল—

"কোনো পুরুষ আসিয়া আমাকে রক্ষা করুন। তিনি আমাকে পতিপ্রদান করুন বা স্বয়ং পতি হউন!"

ইন্দ্র ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন যে গদাপাণি কিরীটধারী কেশীদানব নারীধর্ষণে উদ্যত! ইন্দ্র বাধা দিতেই দুইজনে মারামারি বাধিয়া গেল। ইন্দ্র ছুঁড়িলেন বজ্র—কেশী ছুঁড়িলেন পর্ব্বত। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর ইন্দ্রই জয়ী হইলেন—কেশী পলাইল।

তখন ইন্দ্র মেয়েটিকে বলিলেন—কার মেয়ে বাপু তুমি? আজকাল দিনসময় খারাপ। এমন সময় এখানে আসিলে কেন? ভাল কাজ কর নাই।"

মেয়েটিও সাধুভাষায় উত্তর দিল—"হে দেবরাজ, আমার নাম দেব সেনা। প্রজাপতির কন্যা আমি। আমার এক বোন ছিল, দৈত্যসেনা। দৈত্যেরা আগেই তাহাকে হরণ করিয়াছে। আমরা দুই বোনই পিতার সম্মতিক্রমে এই মানসশৈলে হাওয়া খাইতে আসিতাম। এই দানবটা প্রায়ই আমাদের পিছু লইত। দৈত্যসেনা হতভাগী প্রেমে পড়িয়া ইহার সহিত আগেই উধাও হইয়াছে। আমি কিন্তু উহাকে অবজ্ঞা করি। তাই ধরিতে আসিলে চীৎকার করিয়াছি।"

ইন্দ্র বলিলেন—"ও, তুমিত আমার মাস্‌তুতো বোন্ দেখিতেছি। এখন কি করিতে চাও বল।"

দেবসেনা বলিলেন—"হে মহাবাহো. আমি অবলা কিন্তু পিতৃবর প্রভাবে অসামান্য বলবীর্য্য সম্পন্ন সুরাসুর নমস্কৃত এক ব্যক্তি আমার পতি হইবেন। সেই আশায় আছি। আপনি তাঁহাকে খুঁজিয়া দিন।"

ইন্দ্র কহিলেন—তোমার সখ ত প্রচণ্ড দেখিতেছি। কিন্তু ভদ্রে আজকাল বড় বেগতিক! সুরাসুরের যুদ্ধে এত ব্যস্ত আছি যে তোমার পাত্র খোঁজার সময় নাই! যাই হোক পিতামহের কাছে চল।"

ইন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—ইনি যে ধরণের পতি-কামিনী তাহাতে মনে হয় সে সর্ব্বগুণসম্পন্ন অগ্নি যাঁহাকে উৎপন্ন করিবেন তিনিই ইহার পতি হইবেন।

ব্রহ্মারও দেখা গেল সেই মত।

২

এদিকে বশিষ্ঠ প্রমুখ দেবর্ষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন। ইন্দ্র সেখানে গেলেন। সোমরসের লোভে আরও অনেক দেবতা সেখানে জুটিয়াছিলেন। ভগবান হুতাশনও ঋষিগণ কর্তৃক আহূত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি যথাবিধি হব্যগ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়িল—'বাঃ, ঋষিপত্নীগুলি খাসা ত!' দাঁড়াইয়া গেলেন। ঋষিপত্নীরা কেহ রুক্ম দেবীর ন্যায়, কেহ চন্দ্রলেখার ন্যায়—কেহ···। বাস্ কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত! আর কথা আছে? কিন্তু জর্জ্জরিত হইলে কি হইবে? এ বড় কঠিন ঠাঁই! ঋষি পত্নী, ইয়ার্কি নয়! এদিকে ওদিকে ঘুরঘুর করিয়া নিরুপায় অগ্নি শেষে গার্হপত্যে (১) প্রবেশ করিলেন। আহ্লাদও হইল! তাঁহার শিখাসমুদায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শিখাদ্বারা তিনি মহর্ষিভার্য্যাগণকে স্পর্শ করিতেছেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ 'আল্‌গোছে' প্রেম করায় তাঁহার তৃপ্তি হইল না এবং যখন তিনি স্থির নিশ্চয় হইলেন যে এখানে 'কল্‌কে' পাওয়া সত্যই শক্ত তখন নিতান্ত সন্তপ্ত চিত্তে মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া বনে গমন করিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মরিতে পারিলেন না।

---

(১) গার্হপত্য=সাগ্নিক গৃহীর যজ্ঞাগ্নি।

৩

দক্ষদুহিতা স্বাহা বহুদিন যাবৎ হুতাশনের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বাগাইতে পারেন নাই। এইবার তিনি সুযোগ পাইয়া গেলেন। তিনি ঋষিপত্নীগণের রূপ ধারণ করিয়া অগ্নির নিকট গেলেন ও নিজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। এইরূপ ছয় ছয় বার। অরুন্ধতী (বশিষ্ঠের পত্নী) অত্যন্ত বেশী পতিব্রতা ছিলেন। স্বাহা তাঁহার রূপটা আর ধারণ করিতে পারেন নাই। তা না-ই পারুন ছয় বারই যথেষ্ট। ছয় বারই হুতাশন সহর্ষে প্রীতি প্রফুল্ল মূর্ত্তি স্বাহার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং স্বাহা দেবীও পরম প্রীতি সহকারে পাণিকমলে (?) আগ্নেয় তেজ গ্রহণ করিলেন। পাছে ধরা পড়িয়া একটা কেলেঙ্কারি হয় এই ভয়ে স্বাহা ছয় বারই গরুড়ীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাটিয়া পড়িলেন। সাপও মরিল, লাঠিও ভাঙিল না !

৪

গরুড়ী-রূপিনী স্বাহা উড়িয়া গেলেন শ্বেত ভূধরে। ভীষণ স্থান সে। সর্প, রাক্ষস, পিশাচ—সব সেখানে আছে। সেই শ্বেত ভূধরে এক কাঞ্চনকুণ্ড ছিল। গরুড়ী সেই কাঞ্চনকুণ্ডে অগ্নিরেতঃ নিক্ষেপ করিল। ছয় ছয় বারই ! অদ্ভুত এই আচরণ।

ফলও হইল অদ্ভুত ! প্রথম ফল ভোগ করিলেন ঋষিপত্নীগণ যাঁহাদের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বাহা দেবী মজা লুটিয়াছিলেন।

স্বাহা-হুতাশন-ঘটিত কাণ্ড অতি সঙ্গোপনে বনের মধ্যে ঘটিয়াছিল ত ? কেলেঙ্কারি বাঁচাইবার জন্য স্বাহা চেষ্টারও কিছু ত্রুটি করে নাই। বেচারি গরুড়ী পর্য্যন্ত হইয়াছিল ! কিন্তু হইলে কি হয় ? লোকেরা টিক টের পাইয়া গেল ! ক্রমশঃ ঋষিগণেরও কর্ণগোচর হইল।

ঋষিগণ ত শুনিয়া প্রথমে 'থ' ও পরে 'টং' হইয়া গেলেন। তাঁহাদের পত্নীগণ এই! ম্লেচ্ছভাষায় যাহাকে বলে—sin king sinking water drinking! বশিষ্ঠ চটিলেন না—কারণ তাঁহার পত্নী অরুন্ধতীর মূর্ত্তি স্বাহা ধারণ করিতে পারে নাই। কিন্তু মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ক্রতু এবং অঙ্গিরা তাঁহাদের পত্নীগণের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন—সেকালেও Divorce ছিল! বিশ্বামিত্র—হাজার হোক মিত্তির! সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া হইতেই লক্ষ্য করিতেছিলেন—তিনি বলিলেন যে মুনিপত্নীগণ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—আসল ব্যাপার এই—

কিন্তু উক্ত মুনিগণ সকলেই প্রাজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা আর এবম্বিধ গোলমালের মধ্যে থাকিতে রাজী হইলেন না। মুনিপত্নীগণ পরিত্যক্তা হইয়া কৃত্তিকাগণ (১) হইলেন। লোকমাতা বলিয়াও ইঁহারা কীর্ত্তিতা।

ইহার দ্বিতীয় ফল যাহা হইল তাহা এই। কাঞ্চনকুণ্ডে ছয়বার নিক্ষিপ্ত তেজোময় রেতঃ হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। যেহেতু এই রেতঃ একস্থান হইতে অন্য স্থানে স্কন্দন অর্থাৎ গমন করিয়াছিল সেই হেতু এই পুত্রের নাম হইল স্কন্দ।

ইঁহার ছয় মস্তক, দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ কর্ণ, দ্বাদশ হস্ত এক গ্রীবা ও এক জঠর। লোহিত মেঘমালায় আচ্ছাদিত গগনমণ্ডলে নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় এই সুকুমার কুমার অতীব দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

এই মহাবাহু ও মহাপরাক্রান্ত স্কন্দ তাঁহার বলপ্রভাবে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া তুলিলেন। তিনি হাতী আছড়াইলেন, পাহাড় কাড়িলেন এবং ভুজদ্বয় দ্বারা আকাশ আঁচড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রভাবে

(১) ঋষিগণ ইঁহাদের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ইঁহাদের নাম কৃত্তিকা হইয়াছে। কারণ কৃত্তিকা শব্দটি কৃত্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। কৃত মানে ছেদন করা।

ও প্রতাপে স্ত্রী-পুরুষের বৈর-ভাব, শীত-গ্রীষ্মের একান্ত প্রাদুর্ভাব ঘটিল। দিঙ্মণ্ডল, নভঃস্থল এবং গ্রহ সকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পৃথিবী ভীষণভাবে শব্দায়মান হইতে লাগিল।

সকলের চক্ষু স্থির! স্বর্গে দেবতারা একে দৈত্যদের জ্বালায় অস্থির। ক্রমাগত মহাদেব, ব্রহ্মা প্রভৃতির খোসামোদ করিয়া কোন রকমে এই দানবদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টায় আছেন এমন সময় এ আবার কোথা হইতে এক 'উট্‌কো' উৎপাত আসিয়া জুটিল! ইহার যে রকম বিক্রম এ ত দেব দানব ব্রহ্মা সকলকেই ঠেঙাইয়া ছাতু করিয়া দিবে! ভীতচিত্তে দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন—"একটা উপায় কর হে, অন্ততঃ তোমার সেই মামুলি বজ্রটা একবার ছাড়!"

ইন্দ্র বলিলেন "পাগল হইয়াছ! বজ্র ত উহার কাছে নস্য! আমি উহাকে ঘাঁটাইতে চাই না। সাফ্ কথা!" এই সাফ কথা শুনিয়া দেবতারা তখন অন্য উপায় চিন্তা করিলেন। সেই পরিত্যক্তা ঋষি-পত্নীগণ (যাঁহারা লোকমাতা নামে পরিচিতা ছিলেন) স্কন্দের উদ্ভবকেই নিজেদের দুর্দ্দশার কারণ মনে করিয়া স্কন্দের উপর চটিয়াছিলেন। তাঁহারা খুব শক্তিশালিনীও ছিলেন। দেবতারা এই লোকমাতাদের লেলাইয়া দিলেন। লোকমাতৃগণ প্রথমটা খুব চটিয়া স্কন্দের কাছে গেলেন। কিন্তু সেই অতুলবল বালককে দেখিয়া তাঁহাদের রাগ জল হইয়া গেল। তাঁহাকে মারা দূরে থাকুক তাঁহাকে বেষ্টন করতঃ রক্ষা করিতে লাগিলেন! অগ্নিও আসিয়া হাজির হইলেন এবং স্কন্দের রক্ষাকার্য্য করিতে লাগিলেন। লোকমাতৃগণ ক্রোধপ্রভাবে এক নারী উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধ স্কন্দের 'বডি গার্ড' হইলেন!

বেগতিক দেখিয়া দেবতারা আবার ইন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন 'বজ্রটা ছাড় ঠাকুর। দেখই না কি হয়।" অগত্যা ইন্দ্রকে বজ্র

ছাড়িতেই হইল। সেই বজ্রাঘাতে স্কন্দের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হইয়া গেল ও সেই বিদীর্ণ পার্শ্বদেশ হইতে তৎক্ষণাৎ দিব্য সুবর্ণ কুণ্ডল ও ও শক্তিধারী এক যুবাপুরুষ নির্গত হইয়া ইন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। চরম ঘাবড়াইয়া ইন্দ্র তখন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—"হে মহাবাহো, তুমি আজ ইন্দ্রত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া আমাদের সুখ সৌভাগ্য বিধান কর।" ইন্দ্রের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছ ভাব দেখিয়া স্কন্দ হাসিয়া কহিলেন, "অনাকুলিত চিত্তে তুমি ত্রৈলোক্য শাসন কর; আমি তোমার কিঙ্কর হইয়া থাকিব; ইন্দ্রত্ব পদ আমার অভীপ্সিত নহে।"

সুতরাং স্কন্দ দেব সেনাপতি হইলেন। সুযোগ বুঝিয়া ইন্দ্র তখন সেই জিয়ান পাত্রীটিকে আনিয়া হাজির করিলেন। কহিলেন—"ইনি প্রজাপতিদুহিতা দেবসেনা; ভগবান ব্রহ্মা বহুপূর্ব্ব হইতেই ইঁহাকে তোমার পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অতএব—"

স্কন্দ রাজী হইয়া গেলেন।

ইহার পর অনেক কাণ্ড হইল। লোকমাতাগণ কৃত্তিকা নক্ষত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কৃত্তিকাগণ দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া স্কন্দের নাম কার্ত্তিকেয় হইল। স্বাহা আসিয়া তখন কার্ত্তিকেয়কে বলিলেন—"সকলেরই ত একটা একটা ব্যবস্থা করিলে। আমার যাহাতে অনল-সহবাস ঘটে তাহার একটা ব্যবস্থা কর বাবা। তোমাকে এত করিয়া সৃষ্টি করিলাম!"

স্কন্দ কহিলেন—দেবি! অদ্যাবধি সৎপথস্থিত ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপূত হব্য কব্য প্রভৃতি দ্রব্যজাত 'স্বাহা' বলিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন, তাহা হইলেই আপনার সর্ব্বদাই অনল-সহবাস হইবে। মিটিয়া গেল।

শেষে ভগবান প্রজাপতি সব ফাঁস করিয়া দিলেন। তিনি স্কন্দকে বলিলেন—"কীর্ত্তি মহাদেবের। মহাদেবই অগ্নিতে ও উমা স্বাহাতে সমাবিষ্ট হইয়া লোক হিতার্থে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। সুতরাং মহাদেব তোমার পিতা এবং উমা তোমার মাতা!..."

সব দিক রক্ষা হইল!

* * *

উপরোক্ত গল্পটি মহাভারত হইতে টুকিয়াছি। কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষাও স্থানে স্থানে বজায় আছে। আজকাল দেখিতেছি অশ্লীল ও 'থ্রিল'-পূর্ণ গল্প অনেকে ভালোবাসেন এবং তাঁহাদেরই প্রীত্যর্থে বাংলা সাহিত্যে একদল লেখক-লেখিকাও উদ্ভূত হইয়াছেন। এই সব পাঠক পাঠিকাদের মহাভারতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। অবৈধ প্রণয় মূলক গল্পও পড়া চলিবে অথচ ধর্ম্মও বজায় থাকিবে যদি মহাভারতটা একবার খুলিয়া বসেন। মহাভারতের কথা অমৃত সমান—সার্থক এই উক্তি। তরুণ গল্প লেখক লেখিকাগণও এই মহাভারতে নানারূপ অশ্লীল প্লট খুঁজিয়া পাইবেন। তাঁহারা আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিবেন। এই সব গল্পে শুধু অশ্লীলতাই নাই—বিরাট কল্পনাও আছে, অপরূপ কবিত্ব আছে, চিন্তার সার্ব্বজনীনতা আছে। এ সব শেষোক্ত পদার্থগুলি অবশ্য অতি-আধুনিক লেখকবর্গের নিকট অবান্তর বস্তু।

আর একদল পাঠক-পাঠিকা ও সমালোচক আছেন তাঁহাদের মতে মাইকেলের পরবর্ত্তী সাহিত্য মাত্রেই অশ্লীল ও বাজে। অনেকেই পড়েন নাই কিন্তু তাঁহাদের মনটা সততই রামায়ণ মহাভারত মুখী। উপরোক্ত গল্পে তাঁহারা মহাভারতের নমুনা (অবশ্য সামান্যই) পাইবেন।

এই গল্পটির নাম দিয়াছিলাম "হুতোর কেচ্ছা" এবং একটি অতি-আধুনিক পত্রিকায় পাঠাইতেছিলাম। হুতো অর্থে হুতাশন, কবি হুতাশ হালদার নন। কিন্তু গৃহিণী বলিলেন যে যেহেতু এই গল্পে ইন্দ্র তাহার মাসতুতো বোনকে হাতের কাছে পাইয়াও অক্ষত ছাড়িয়া দিয়াছে সেই হেতু এই গল্প কোন অতি-আধুনিক কাগজে চলিবে না।

—শ্রীবলভদ্র কথক

বিরহের সাথী

গভীর জ্যোছনা রাতে,
আমারো নয়ন-পাতে,
স্বপন ঘনায় আজো,—কলিকাতা সহরেও !
বরণে ও ধরণেতে,
ঠিক্ সুরে মরমেতে,
রঙীন রাগিনী তোলে, ছোট নয় বহরেও !

২

সেদিন শারদী নিশি,
টাঙাইয়া 'নেট' দিশি,
একা একা শুয়েছিনু খোলা-ছাদে দোতালায় ;
আকাশের তারা আর
মশারির কারাগার,
মনটারে ফেলেছিল অপরূপ দোটানায় !

৩

রিক্সার ঠুন্ঠুন্,
মশকের গুন্ গুন্,
মোটরের হর্ণের নিখাদ বা গান্ধার ;
ক্বচিৎ বা শোনা যায়
(এত কম গোণা যায়)
পাশের বাড়ীর মেয়ে থামায়েছে গান তার ।

৪

পুরাতন মরতের
পুরাতন শরতের
পুরাতন সেই হাসি পুরাতন চাঁদিমার,
পুরাতন মোর হিয়া,
দিল বেশ দোলাইয়া,
জাগে পুরাতন সাধ সাধিবার, কাঁদিবার।

৫

সেই ভালো বাসিবার,
অকারণে হাসিবার,
হাসিয়াও বার বার হারাবার অভিযান,
পুরাতন সেই স্মৃতি
সেই ব্যথা, সেই প্রীতি,
বিরহ-মিলন-ময় সেই মান অভিমান!

৬

এমন জ্যোছনা রাতে,
একা শুয়ে বিছানাতে,
কতখণ জাগি' আর একলার চেষ্টায়!
ক্রমাগত ওঠে হাই,
পাশের বালিশটাই
সম্বল হল হায়, আজ রাতে শেষটায়!

৭

চাদরে আবরি' দেহ,
ঢালিয়া সকল স্নেহ,
বালিশই নিলাম টেনে,—ঠিক হেন কালে হায়—
হঠাৎ পড়িল চোখে
ছাদের কোণেতে ও কে
আমারি পানেতে যেন চাহিয়া রয়েছে ঠায় !

৮

এমন চাঁদিনী রাতে,
এ কি মহা উৎপাত এ,
ভূত এসে শেষকালে করিল না কি রে ভর ?
পা এবং মাথা জুড়ি'
চাদরটি দিয়া মুড়ি
রাম-নাম করিলাম ক্রমাগত পর-পর !

৯

সহসা হইল মনে,
সে যেন কানের কোণে,
অতি ধীরে চাপা-স্বরে কথা কয় ফিস্-ফাস্ !
ভয় আরো হল গাঢ়,
চাদরটি মুড়ে আরো,
চুপ করে রহিলাম রোধ করি' নিশ্বাস !

১০

বলিতে লাগিল ভূত
"এ ত ভারি অদ্ভুত
এ যুগের হে রমণি, হেন রাতে নিদ যাও !
খোল গো মশারি খোল,
চাদরের ঢাকা তোল,
আমি যে এসেছি দেখ—হোয়ো নাক পিছ্‌পাও।

১১

শরতের এই শশী
একে ত মরমে পশি'
লালায়িত করে দেহ—মনেও দিয়েছে ঘা
তদুপরি তব লেখা !
—ঘরেতে গেলনা টেকা
উঠেছি 'পাইপ্‌' বেয়ে ছড়েও গিয়েছে গা !

১২

আজি নিশি মনোহরা,
স্বপন দেখিছে ধরা,
দেখ সখি চাঁদ আর চকোরেতে চুম খায়।
স্বামীটা ত নাই আজ,
তবে সখী কিবা লাজ ?
তিনি ত গ্যাছেন 'টুরে' জানি আমি ভূমকায়।"

১৩

চাদরের ফাঁকে ফাঁকে
দেখিলাম ভূতটাকে
গৃহিণীর Male friend সুতরুণ যদু সুর!
তখন মশারি তুলি
কহিনু তাঁহারে খুলি'
"তিনি ত বাড়ীতে নাই গিয়াছেন মধুপুর।

১৪

নানাকাজে আজ ভাই
'টুরে' যাওয়া ঘটে নাই,
ক্ষতি নাই—এস দোঁহে—হই আ ঃ মশগুল।
এসো ভাই খুলে প্রাণ,
দুজনেই গাই গান,
আমি গাই নিধু বাবু, তুমি গাও নজরুল!

১৫

লজ্জা পেওনা বাবু,
বিরহে আমিও কাবু,
তাঁর ত ফিরিতে দেরী অন্ততঃ দিন চার!
কোথায় লেগেছে দেখি,
আহা, আহা, ছি ছি এ কি!
নিয়ে আসি থামো আছে আইওডিন্ টিনচার!

*　　*　　*

সহসা পথের পরে
ভীষণ শব্দ করে'
ছুটন্ত মোটরের টায়ার ফাটিল কার!

— "বনফুল"

কঙ্কাল

"SIMIA LITERATURA"

"From 1836 onwards, Edonard Lartet explored and made famous the rich beds of Sansan which date from Mid Tertiary times. There he discovered, among other forms entirely new to science, remains of an anthropoid ape, an ancestor of the modern Gibbons and this he named Pleopethecus.

* * Eminent anthropologists, among them Virchow, regarded the Neanderthal skull as a pathological specimen of the skull of an idiot"—Marcelin Boule.

22.15 N. Latitude এবং 92.0 E. Longitudeএর সংযোগস্থলে, খৃষ্টাব্দ ১৯৩৩ এর ২২ জুলাই তারিখে অপরাহ্নে, Mammalologyর মহাধ্যাপক একটি কঙ্কাল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই আবিষ্কারের ফলে Palæontology ও বঙ্গসাহিত্য, উভয় বিষয়ই সাতিশয় সমৃদ্ধ হইবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে বলিয়াই আমরা অসংশয়মনে ঘোষণা করিতেছি, ২২শে জুলাই ১৯৩৩ মাত্র স্মরণীয় তারিখ বলিলে ভুল হইবে, উহা একেবারে diem mirabilis"।

ভূমিকা

মহাধ্যাপক যখন কঙ্কালটি মৃত্তিকা হইতে উদ্ধার করিলেন তখন সেখানে প্রায় পঞ্চশতাধিক নর-নারী উপস্থিত ছিলেন

ইঁহাদের অধিকাংশই নবীন-নবীনা ; সুতরাং যখন মহাধ্যাপক কঙ্কালটি পাইয়া আনন্দে "Eureka", "Eureka" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তখন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কঠোর সমালোচনা সহ্য করিতে হইল। উচ্চারণ-পটীয়সী মহিলাগণ, যাঁহারা phonetic pronunciationএর প্রতি অনুরক্তা এবং সেই সূত্রে বিদ্যায়তনে ventriloquismএর class খুলিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন, বলিলেন, "Eureka" বলিবার Latin উচ্চারণ হয় নাই ; বেশ-বিন্যাসে বিশেষজ্ঞ পুরুষগণ বলিলেন, "Eureka" বলিবার পোষাক হয় নাই, একজন শাসাইয়া গেলেন আর একখানি Sartor Resartus লিখিবেন।

"মহচ্ছব্দো ন দীয়তে" যে সমস্ত কথার সঙ্গে, তাহার তালিকায় "অধ্যাপক" কথাটি নাই বটে ; কিন্তু "মহাযাত্রা" "মহাব্রাহ্মণ", "মহানিদ্রা" প্রভৃতি কথার মত, "মহাধ্যাপক" কথাটিও যে এ ক্ষেত্রে সত্যার্থপ্রকাশক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কারণ, Borneo বা Formosa দ্বীপে না জন্মিয়াও ইনি head-hunter, অর্থাৎ প্রতি বৎসর শতাধিক ছাত্রের মুণ্ড সংগ্রহ করিয়া থাকেন Walter Bagehot মানুষের বর্ণনা দিয়াছেন, "soul masquerading as an animal", সেইরূপ ইনিও "head-hunter masquerading as a professor"। Mammaloloy সম্বন্ধে তাঁহার অধ্যাপনা করিবার উপযুক্ততা-প্রসঙ্গে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি স্বয়ং একজন বিখ্যাত mammal, Mammalia University হইতে তিনি pro honoris causa যে ডিগ্রী পাইয়াছেন, তাহা সর্ব্ব-mammal বিদিত, সুতরাং তিনি lay mammal নহেন, তিনি expert mammal। তিনি ডিম্ব প্রসব করিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার সার-(অর্থাৎ manure ?) পূর্ণ-গর্ভ বক্তৃতায় জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

কঙ্কালটির আবিষ্কারের অব্যবহিত পরক্ষণেই Santiago বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুধী Dr. Mare'snest মহোদয়ের নিকট হইতে cable-gram পাওয়া গেল। তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"Man or Ape or both ?"

যখন দেখিলাম তাঁহাকে এই নব আবিষ্কারের কথা না জানাইলেও তিনি অত্যল্পকালের মধ্যেই আবিষ্কারের কথা জানিতে পারিয়াছেন, তখন বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে Dr. Mare'snest Theosophist, শুধু তাহাই নহে, তিনি Adyarএর inner circleএর লোক। পরে জানিতে পারিয়াছি, তিনি spook-chasing এবং spook-spearingএ বহুল ব্যবহৃত astral বা n-dimensional harpoonএর আবিষ্কর্ত্তা এবং তিনি সে যন্ত্রটি নিজ নামে patented করিয়া পৃথিবীর moron ও defectiveদের অপরিসীম market capture করিয়াছেন। যন্ত্রটির registered trade mark, একটি lunatic asylumএর ফোটো।

Cablegramএর ভাষা হইতে আরও বুঝিলাম যে Dr. Mare'snest বাংলা জানেন এবং সুদূর Santiagoতে থাকিয়াও তিনি বাংলার প্রগতি-সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া থাকেন ; নতুবা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন যে man এবং ape, mutually exclusive animals নহে (Man or ape or both ?) এবং বহিরঙ্গে man হইলেও অন্তরঙ্গে ape হইতে পারে ?

অর্থাতঃ কঙ্কাল জিজ্ঞাসা

Geologist Palœontologistগণ ভূমির স্তরবিভেদ বিচার করিয়া, যে ভূস্তরে কঙ্কালটি পাওয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে বিবেচনার পর

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কঙ্কালটি Pleistocene যুগের অর্থাৎ প্রায় ১২ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের। ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি এই মতবাদের সহিত একমত; তাঁহারা বলিতেছেন, ঠিক ১২ লক্ষ বৎসর না হইলেও কঙ্কালের বয়স ১২ বৎসর অনায়াসেই হইতে পারে। ঐতিহাসিক বলেন, কঙ্কাল খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ দশকের। তিনি বহু দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটিয়া নিম্নলিখিত কাহিনীটি উদ্ধার করিয়াছেন।

ইতিবৃত্ত-কথা

খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ অর্দ্ধ।

তখন সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ জরার অত্যাচারে জর্জ্জরিত, বৌদ্ধ বিদ্রোহীদের অকরুণ আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত-দেহ; জীবনব্যাপী সাহিত্য এবং বিশ্বভারতী-সাধনায় নিবেদিত, অপূর্ব্ব দেদীপ্যমান্ তাঁহার প্রতিভা-রবি ক্লান্ত হইয়া উত্তরায়নে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

Sancho Panza স্বর্গারোহণ করিয়াছেন এবং Don Quixote প্রতিশ্রুত Barataria রাজত্বের সিংহাসন উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন, "শ্রীকান্ত"-হন্তা শরৎচন্দ্র। তিনি সেখানেই প্রবাস-যাপন ও অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেছেন।

সমগ্রদেশে ত্রস্ত শান্তি বিরাজ করিতেছে, এমন সময় সহসা গুপ্তচরমুখে সংবাদ আসিল, "সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা" নিরূপণ করিবার নিমিত্ত প্রেরিত টোডরমল্ল-প্রতিম প্রাজ্ঞ, অর্থসচিব নরেশচন্দ্র সুদূর কান্দাহারের পথে দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচি কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। রাজধানীতে এই দুঃসংবাদ গোপন রাখিবার জন্য উৎকোচ-প্রদান প্রভৃতি নানারূপ পন্থা অবলম্বিত হইল; কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ঐ সংবাদ

মহানগরীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, বিশেষ করিয়া "চাঁদনী চ'কে" বহুধাবিস্তৃত অসন্তোষ ও চাঞ্চল্যের আবর্ত্ত সৃষ্টি করিল।

এই আকস্মিকতার সুযোগ লইয়া বিদ্রোহীগণ পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, বারুদের ধূম ও সাহিত্য-শ্বাপদগণের হিংস্র গর্জ্জনে বঙ্গদেশ পরিপূরিত, উচ্চকিত হইয়া উঠিল।

"তা'র পরে শূন্য হ'ল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লী-রাজ-শালা,—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোক-মালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগল-মহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা,—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হ'ল তা'র সীমা।"

রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকিতেই যে চা'র জন অমিতবিক্রম সাহিত্যিক সাম্রাজ্য-ভার গ্রহণ করিবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে, লীলাময় সুজা সাগরপারে গান শুনিতেছিলেন; ব্রহ্মচারী মুরাদ, অর্থাৎ কাজি সাহেব ছিলেন সর্ব্বত্র; আওরাংজেব ছিলেন প্রাচ্যদেশে এবং অচিন্ত্যকুমার, All Quiet on the Western Frontএ বর্ণিত "বু'ট"-লোভী সৈনিকের মত নিয়তই সম্রাটের সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

সম্রাট্, যুবরাজ অচিন্ত্যকুমারকে Norwegian বলিয়া পরিহাস করিলেও তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বাদসাহী মসনদের জন্য যে কালান্তক যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে লাগিল, তাহাতে "বিচিত্রা"-বৈঠকের যুদ্ধে অচিন্ত্যকুমার প্রথমেই পরাজিত

হইলেন, পরে আর বিজয়ী হইতে পারিলেন না। বৃদ্ধ সম্রাটের পাঞ্জার অমোঘত্ব এবং অপরাজেয়তা নষ্ট হইল, সম্রাট্ স্বয়ং দুর্গাবরুদ্ধ হইলেন। পরিশেষে, সম্রাট্ পঞ্চম চার্লস্ যেমন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সাম্রাজ্য-শাসনের দায়িত্ব হইতে অবসর লইয়া ফিলিপ্-এর হস্তে তাহা তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং San Yusteর monasteryতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেইরূপ সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথও বুদ্ধদেবকে সম্রাট্রূপে নির্ব্বাচিত করিয়া অবসর লইলেন এবং শান্তিরসাস্পদ, আশ্রমপদের মহুয়া-পলাশ-কুঞ্জে নিভৃত সাধনা-পীঠ রচনা করিয়া নিশিতনিপাত অস্ত্রশস্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পর বুদ্ধদেব, যেমন "বলবন্"এর পর "কাইকোবাদ"।

বুদ্ধদেবের বিজয়ের কারণ, দ্বিবিধ। (১) "রমণী-রমণ-রণে" পরাজয় ভিক্ষা করিবার অপ্রমেয় শক্তি (২) তাঁহার মিত্রবল; সুদূর Vienna হইতে তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিলেন প্রবীন চিকিৎসা-দার্শনিক Sigmund Freud স্বয়ং—"সাড়া" নামক গ্রন্থে উভয়ের মধ্যে সন্ধি-পত্র সাক্ষরিত হইল।

কাজি সাহেব চেষ্টা করিলে Marx Lenin প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট-দিগকে স্বপক্ষে যুদ্ধে নামাইতে হয়ত পারিতেন, কিন্তু তিনি নিজে নিরক্ষর হওয়ায় তাঁহাদিগকে পাইয়াও সুবিধা করিতে পারিতেন না, ইহা একরূপ নিশ্চিত। নিরক্ষরতাই তাঁহার পরাজয়ের প্রধান কারণ।

চিরনবীন Dionysus বৌদ্ধ কলেবর ধারণ করিয়া সাহিত্য-রাজ্যে মহীপালত্ব আরম্ভ করিলেন। তৎক্ষণাৎ, "নবে তস্মিন্ মহীপালে সর্ব্বং নবমিবাভবৎ"। সমস্তই নবরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, decanter ধৃত পাণ্ডুর ale সহসা cherry-brandyতে রূপান্তরিত হইল,

teetotallerদেরও delirium tremens দেখা দিল। এমন কি, অতরুণ কবি কালিদাসও যুগধর্ম্ম মানিয়া লইলেন, publisherদিগের নিকট সুপারিশ করিয়া সহসা "গীতগোবিন্দের" unexpurgated ও illustrated সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া একদিকে দেবলাঞ্ছিত "ওমর-কালিদাসের" পশার মাটি করিতে বসিলেন, অন্যদিকে পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি নানা সংস্কার-বিধির অনুষ্ঠানে উপহারের বাজার একচেটিয়া করিয়া লইলেন এবং অশ্লীলতানিবারক সরকারী আইন-কানুন-গুলিকে পরাস্ত করিয়া বিদ্রূপ করিলেন। "গীতগোবিন্দে"র actionএর slow-motion-picture লইবার জন্য সম্পাদক ফিল্ম কম্পানি খুলিয়া বসিলেন।

"মদোদগ্রাঃ ককুদ্মন্তঃ সরিতাং কূলমুদ্রুজাঃ।
লীলাখেলমনুপ্রাপুর্মহোক্ষাস্তস্য বিক্রমম্॥"

নব মহীপালের মোসাহেবত্ব ও অন্ধ অনুকরণ-প্রচেষ্টাই যাহাদের একমাত্র উপজীব্য ও পার্থিব পরিচয়, সেই উন্নত ককুদ্-বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনড্বান্গণ মদোদ্ধত পরাক্রমে সাহিত্য-ক্ষেত্রের প্রাচীন landmark গুলি শৃঙ্গাঘাতে ও গাত্র-ঘর্ষণে বিচূর্ণিত করিতে লাগিল।...

কিছুকাল প্রাচ্যদেশে রাজত্ব করিয়া বুদ্ধদেব দিগ্বিজয়ের কল্পনা করিলেন। রঘুর মত তিনিও "ষড়্বিধং বলমাদায় প্রতস্থে দিগ্-জিগীষয়া।" বুদ্ধদেবের ষড়্বিধ বল এইরূপ :—

(১) বিশ্ব-সাহিত্য-বাহী অনুচরগণ; "যথাখরশ্চন্দনভারবাহী, ভারস্য বেত্তা, ন তু চন্দনস্য"।

(২) মুদ্রাযন্ত্রের আনুকূল্য। ইহাই বুদ্ধদেবের artillery।

[Acheron, the stream of sorrow—তাহার তটদেশে, ব্যাকুল ক্রন্দনে আকাশ, বাতাস, এমন কি Cerberusকেও কাঁদাইয়া, নিরালম্ব,

নিরাশ্রয় অবস্থায় ঘুরিতেছে সেই আদি-পাপী, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তাদ্বয়, Gutenberg এবং Fust.]

(৩) সাহিত্য-ভাণ্ডারী booksellerগণ ও সাহিত্য-পরিবেশক publisherগণের আনুকূল্য। Bank-balanceএ নিবদ্ধদৃষ্টি এই ত্যাগী মহাপুরুষগণ সাহিত্যের দুঃশাসন অর্থাৎ বস্ত্রহরণকারী প্রকৃত প্রেমিক!

(৪) Compulsory Primary Education Act; ইহার ফলে বঙ্গদেশীয় পাঠকগণের সাহিত্যানুভূতি গভীর ও রুচি মার্জ্জিত হইয়াছে।

(৫) Stanford Binet Intelligence Testএর ব্যবস্থা বঙ্গদেশের পাঠকসম্প্রদায়ে না থাকা। ইহা negative হইলেও, বৌদ্ধ সাহিত্যের সহায়করূপে অত্যন্ত positive।

(৬) দোয়াত-পূর্ণ কালি, virgin কাগজক্ষেত্র ও লেখনীখনিত্র।

...রঘু-Dionysusএর বংশধর সাগরাভিমূখে চলিলেন। ইহাই দিগ্বিজয়ের প্রথম অধ্যায়।

"স সেনাং মহতীং কর্ষণ্ পূর্ব্ব-সাগর-গামিনীম্।
বভৌ হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ॥"

[সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক ভুল করিবেন না, এ গঙ্গা "বুড়ীগঙ্গা" নহে।]

নব-Dionysusএর রথ টানিতে লাগিল, সুন্দরবনের pantherগণ, বাঙ্গালী সাহিত্য-সমালোচকের ছদ্মবেশে। তাঁহার রথ ঘিরিয়া নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতে লাগিল, অর্দ্ধ-নর, অর্দ্ধ-পশু (মোট, নরপশু) Satyr গণ বাঁশী বাজাইয়া। অজাতশ্মশ্রু, অপরিপুষ্ট সাহিত্য-পশুগণ জয়যাত্রায় যোগ দিল, পূর্ব্বসূরিদিগের ছিন্নমুণ্ড লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিতে করিতে। Titian-অঙ্কিত চিত্রের সহিত যথাযথতা রক্ষা

করিবার জন্য প্রাক্তন-জন্ম-লব্ধ বিদ্যার দর্পে দর্পিত সাহিত্যিক শুক-দেবগণ পরিধেয় বসন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পরস্পর, পরস্পরের মুণ্ড রাজপথ ধূলিতে বিলুণ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

স্খলিতবসনা তরুণীগণ করতাল বাজাইয়া জয়যাত্রার পুরোভাগে এবং ইতস্ততঃ চলিতে লাগিলেন, Priapus-চিহ্ন সগর্ব্বে ধারণ করিয়া, অবশ্য, ভৃগুপদচিহ্নের মত বক্ষে নয়। অন্তঃপুরিকাগণ Ariadneর ন্যায় চকিত হইয়া পলায়নপর হইলেন বটে, কিন্তু রক্ষা পাইলেন না, কারণ, মাসিকপত্রিকার মোড়কে বোঝাই হইয়া বুদ্ধদেব-সেবিত "সাহিত্য" প্রতিমাসে নিয়মিত ভাবে শুদ্ধান্তরালে পৌছিতে লাগিল।

তরুণীগণ, সম্রাটের ললাটে দ্রাক্ষা-লতার বেষ্টনী পরাইয়া দিল, সম্রাট্ রাজস্ব-রূপে তাহা গ্রহণ করিলেন।

পুরাকালে যাঁহারা Dionysusএর উৎসবে, পুরস্কারস্বরূপ একটি ছাগ পাইতেন, তাঁহারা বর্ত্তমান যুগে যাজ্ঞা করেন, chop, cutletএ রূপান্তরিত ছাগ। তাঁহারা এই জয়যাত্রায় যোগ দিতে বিস্মৃত হইলেন না এবং এই Latin Quarter বিহারী সাহিত্যিকগণ নানারূপ নূতনত্ব সৃষ্টি করিয়া পাঠকদিগকে উচাটন করিয়া তুলিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে Insanity Specificএর কাটতি বাড়াইয়া দিলেন।

"The tragic bard, a goat his humble prize
Bade satyrs naked and uncouth arise ;
His muse severe, secure and undismay'd,
The rustic joke in solemn strain convey'd ;
For novelty alone, he knew, could charm
A lawless crowd, with wine and feasting warm".

—Horace.

Bacchanaliaর শেষ অংশে চলিতেছিল, muleএর দল, Camp-followerদের luggage বহন করিয়া।

ইহারা এইরূপে আ-পূর্ণীয়া-চট্টগ্রাম, সমগ্র বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করে।...

কঙ্কালের পরিচয়

ঐতিহাসিক বলিতেছেন, যে কঙ্কালটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নব-Dionysusএর জয়যাত্রার luggage-বাহী একটি মরা muleএর কঙ্কাল। ইহাকে "homo" মনে করা চলে না, সুতরাং Sinanthr-opus Pekinensisএর সঙ্গে এই নবাবিষ্কৃত পদার্থের কোনও ঐক্য-সম্বন্ধ নাই। তিনি আরও বলিতেছেন যে খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে এই জাতীয় জীব বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সেকালের Municipal Health Officerদের Diary ঘাঁটিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে Municipality হইতে arsenic-stick খাওয়াইয়া এই জীবগুলিকে একবার মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু এই চেষ্টা সফল হয় নাই, কারণ ইহারা hermaphrodite এবং দর্দ্দুর-ছত্রের মত স্বয়ম্ভূ।

জীবটি homo নয়, ইহা কিন্তু নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করা যায় নাই। পণ্ডিতসমাজে ইহা লইয়া বিতর্ক চলিতেছে। এ অবস্থায় এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে ইহা featherless biped।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর, সুতরাং উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটিয়াছে এই যে মহাধ্যাপক কঙ্কালটির মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া কয়েকটি সযত্নে লুক্কাইত গল্পের খাতা পাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক অনুমান করিতেছেন যে করোটিকাভ্যন্তর absolute vacuum বলিয়া গল্পের খাতাগুলি চমৎকার

টিঁকিয়া আছে। মহাধ্যাপক এই উপায়ে প্রমাণ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন যে এ কঙ্কালটি যে জীবের তাহার মস্তক—শোভার জন্য, ব্যবহারের জন্য নহে এবং complete, absolute vacuum, যাহা বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, অসম্ভব, তাহা যদি কুত্রাপি থাকে ত এই জাতীয় জীবের মুণ্ডে।

…গল্পের খাতা হইলেও সব লেখা গল্প নয়। খাতার গোড়ার দিকে একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে। সমস্ত খাতাটি এক হস্তাক্ষরে, এক কালিতে লিখিত। শুধু ভূমিকাংশে কয়েক স্থলে অন্য হাতের লেখা, সেগুলি পড়িয়া জানিতে পারা যায়, সেগুলি মূল রচনার উপর অন্য কোনও ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত টিপ্পনী-সমালোচনা। এই সমালোচকের সমালোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সমালোচক অত্যন্ত রূঢ়ভাষী ব্যক্তি এবং অভদ্র। তাঁহার সমালোচনা প্রকাশিত করাও ভদ্রতা-বিগর্হিত, কিন্তু শুদ্ধ বিজ্ঞানের খাতিরে Palœontologyর দিক দিয়া ইহার মূল্য আছে বলিয়াই এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে সমস্তই তুলিয়া দিতেছি।

খাতার প্রথম লাইন এইরূপ :—

"আল্লা, কালী, যীশুর দিব্য, আমাকে কেহ মারিবেন না"। বলা বাহুল্য, ইহা "কঙ্কালের" লেখা। ঐতিহাসিক বলিলেন, খৃষ্টাব্দ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রাদুর্ভূত, "পরশুরাম" নামক একজন অতি শক্তিশালী লেখকের "লম্বকর্ণ" নামক গল্প হইতে এই লাইনটি উদ্ধৃত হইয়াছে। "লম্বকর্ণে"র পরিত্রাণের জন্য বংশলোচন ঐ কথা কাগজে লিখিয়া কাগজখানি তাহার গলদেশে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন ; জীবটিও আত্মরক্ষার জন্য সেই বাণীই গ্রহণ করিয়াছে।

তাহার পর জীবটি অর্থাৎ "কঙ্কাল" লিখিয়াছে :—"আমি নিছক

সাহিত্য-সেবী। আমি কিছুই জানি না, সেইজন্য আমি গল্প লিখি। গল্পরচনাতে বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নাই, literacy না থাকিলেও চলে। আর, গল্পরচনাতে বিপদের সম্ভাবনা আদৌ নাই। আমি গল্পে যাহা খুসী লিখিব, কেহই গল্প notice করিতে পারিবেন না, কারণ, আমি অবধ্য অর্থাৎ তরুণ সাহিত্যসেবী।"

তাহার ঠিক নীচেই অন্য হাতের লেখা ; ইহা সমালোচকের। [পূর্ব্বে বলিয়াছি, সমালোচক অত্যন্ত vulgar, এখন তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া সুকুমার-মতি তরুণ সাহিত্যিকদিগের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি এবং জানাইতেছি যে বিজ্ঞানের দিক দিয়া মূল্য না থাকিলে, আমরা সমালোচকের কটূক্তিগুলি কখনই প্রকাশিত করিতাম না।]

"গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হণ্যাদেবাবিচারয়ন্।"—মনু
"গর্জ্জ, গর্জ্জ, ক্ষণং মূঢ়, মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিয়ন্ত্যাশু দেবতাঃ॥"—চণ্ডী

কঙ্কাল লিখিয়াছে :—

"আমরা সাহিত্য-স্রষ্টা, সুতরাং সৌন্দর্য্যস্রষ্টা এবং রূপস্রষ্টা। Creation বা সৃষ্টি বলিতে আমরা বুঝি, আমরা যাহা রচনা করিতেছি তাহাই।"

এই কথাগুলির ঠিক নীচেই অন্য হাতের, অর্থাৎ সমালোচক মহাশয়ের লেখা :—

"টাকী, টুকী, টকমক শব্দে।
আটী, টীয়ে সরোবর-নিকটে॥
রে রে বর্ব্বর, চটমটি-সার।
অক্ষর না চি'নে ব্রহ্মবিচার?॥"

[এই নিষ্ঠুর কথাগুলির জন্য আমি সমালোচকের পক্ষ হইতে মাফ চাহিতেছি। Palœontologyর মুখ চাহিয়া মার্জ্জনা করিবেন।]

"কঙ্কাল" লিখিয়াছে :—

"Darwinএর 'Origin of Species'; Maineএর 'Ancient Law'; Marxএর 'Capital'; Mommsenএর 'History of Rome' এগুলি creation পদ-বাচ্য নয়, কারণ, এগুলি অধ্যয়নার্জ্জিত, পরিশ্রমলব্ধ বস্তু। আমরা creation বলিতে বুঝি inspiration সম্ভূত আমাদের গল্পাবলী"।

তাহার নীচে অভদ্র সমালোচক লিখিয়াছেন :—

"উত্তমে উত্তম মিলে, অধম অধমে।
আমি যদি কথা কহি, একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা ধার॥"—ভারতচন্দ্র

"বানরী রব দেই, কক্‌খটী নাদ।
গোবিন্দ দাস পহু শুনি পরমাদ॥"—গোবিন্দ দাস

"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জ্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্॥"

কঙ্কালটি লিখিয়াছে :—

"আমরা সন্দেহবাদী নই, আমরা সমন্বয়-বাদী"। তাহার পাশে ছোট ছোট অক্ষরে পেন্সিল দিয়া অন্য হাতের লেখা, ঐ অভদ্র সমালোচকের নিশ্চয়।

"Rather I prize the doubt
Low kinds exist without,
Finished and finite clods,
Untroubled by a spark."—Browning

কঙ্কাল লিখিয়াছে—"Analysis অপেক্ষা সৃষ্টির মূল্য ঢের বেশী। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য উপলব্ধি করার ক্ষমতার, কল্পনার প্রসারতার (sic), সমন্বয়-সৃষ্টির"।

নীচে অন্য হাতের লেখা :—

"কিসের উপলব্ধি? সাহিত্য-ভগবানের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপলব্ধি? আর, ভগীরথ-সৃষ্টির যা মূল্য, তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্য অষ্টাবক্রের অভিশাপের, ইহা ভুলিলে চলিবে না।"

কঙ্কাল লিখিয়াছে :—

"আমরা বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল কিছুই জানিতে চাহি না; কারণ, আমরা মৌলিক, রসবেত্তা, রসবোদ্ধা, রসপায়ী সাহিত্য-ভৃঙ্গ" ইত্যাদি।

কালিদাসে যেমন "সুভগ" শব্দের বাহুল্য, তেমনই এই জীবটির রচনাতে "রস" ও "উপলব্ধি" এ দুইটি কথা মাঝে মাঝেই দেখা দিয়াছে। দেখিলাম, vulgar সমালোচক তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন :—

"রাধামোহন দাস না বুঝয়ে ও রস
নিজ দোষ ভাবিয়া কান্দে।"

ঐতিহাসিকগণ সন্দেহ করিতেছেন, বৈষ্ণব-পদ-কর্ত্তা বিখ্যাত রাধামোহন দাস খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে জীবিত ছিলেন; কিন্তু ইহার অন্য কোনও প্রমাণ নাই।

কঙ্কালটি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বাস্তবিকই জীবটির রস-পানে অদ্ভুত নৈপুণ্য ছিল; কঙ্কালটির গঠন হইতে সুস্পষ্ট যে জীবটি পূর্ব্বে ষট্‌পদই ছিল, চা'রটি পা খসিয়া গিয়াছে, তাহা দিয়া আর একটি সাহিত্য-রথী সম্ভবতঃ সৃষ্ট হইয়াছে।

সম লোচকের হাতের লেখা রহিয়াছে :—

"কাকস্য চঞ্চু যদি স্বর্ণযুক্তা।
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা।
তথাপি কাকো ন তু রাজহংসঃ॥"

কঙ্কালটি লিখিয়াছে :—

"যাঁরা আমাদের দলভুক্ত নন, তাঁদেরই শিল্পজ্ঞানের অভাব আছে বুঝতে হবে; Arcadian Paradiseএ না এসে, Arcadian Nightingaleগণের উজ্জ্বল কল-নাদ না শু'নে যে ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানের Infernoতে প'ড়ে রইল, তাকে আমরা করুণা করি। চন্দ্রশেখরের মত তাকে একদিন বই পোড়াতে হবেই হবে। আহা, বেচারা! আর যদি সে না পোড়ায়, তা' হ'লে আমরা জোর ক'রে তার বই পুড়িয়ে দেব, যেমন আমরা পুড়িয়েছিলাম, রবীন্দ্রনাথের "সত্যের আহ্বান" নামক প্রবন্ধ, ১৯২০ সালে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে।

যাঁরা আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে concert রচনা করেন না, বুঝতে হবে, তাঁরা যা study করেন, তা assimilate করতে পারেন না। যদি assimilate করতে পারতেন, তা হ'লে বুঝতেন, আমরা যতটা খেলো ব'লে তাঁরা মনে করেন, আমরা তা নই।"

সমালোচক তাহার নীচে লিখিয়াছেন :—

"কিসের assimilation বৎস? গো-দুগ্ধের? সাহিত্য-লক্ষ্মীই তোমাদিগকে assimilate করিতে পারেন নাই, আমরা ত কোন ছার! তোমাদিগকে assimilate করিয়া ফেলিতে পারিলে, তোমরা আজ মারী-গুটিকার মত এইরূপে সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে পারিতে না, বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্য, উভয়ই রক্ষা পাইত।"

"By the conceited man—by him
I'm dangerous proclaimed ;
The wight uncouth who cannot swim,
By him the water's blamed.
That Berlin pack—priest-ridden lot,
Their ban I am not heeding ;
And he who understands me not
Ought to improve in reading." —Goethe.

"Idiot কথাটি in its original Greek form, 'idiotes', মানে ছিল—যে ব্যক্তি not a political animal, সেই। বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক যুগে সকলেই citizen, সুতরাং কথাটির বর্ত্তমান অর্থ, তরুণ সাহিত্য-সেবী"—সমালোচক।

সর্ব্বশেষে, সমালোচক একস্থলে লিখিয়াছেন :—

"সাহিত্য-সেবীর সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, সাহিত্য-সেবী যাঁহারা নহেন, তাঁহারা এখন minority। এই minorityর জন্য safeguard demand করিবার সময় আসিয়াছে। সাহিত্য-সেবা করিতে এখন আর effort এর প্রয়োজনীয়তা নাই ; কারণ, মুদ্রাযন্ত্র অসীম প্রভাববান্। সাহিত্য ত্যাগ করিতেই এখন effortএর প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে ধন্যবাদার্হ যাঁহারা সাহিত্য-সেবা করিতেছেন, সেই লক্ষাধিক নরনারী নহে, যাঁহারা সাহিত্য ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা, abstinenceরূপ effortএর পুরস্কারস্বরূপ। যাঁহার দক্ষিণ হস্তে পাঁচটি আঙ্গুল আছে এবং তাহাতে paralysis হয় নাই, তিনিই এখন সাহিত্য-সেবী ! ! !"

* * *

কঙ্কালটি দৈর্ঘ্যে ৫ ফীট ৬ ইঞ্চি। মিশরসম্রাট Ikhnatonএর mummy পরীক্ষা করিয়া মস্তিষ্কে Cretinism রোগের ছাপ পাওয়া গিয়াছে, এ সংবাদ Hall's Ancient History of the Near East গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু এই জীবের মস্তিষ্কেও Cretinismএর লক্ষণ বিদ্যমান। ইতিহাসের ছাত্রের মনে পড়িবে, সম্রাট Ikhnaton ধর্ম্ম-মূলক সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন।

কঙ্কালটি লইয়া বিদগ্ধ-জন-সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। বহু অদ্যাপি অমীমাংসিত সমস্যার উপর এই কঙ্কালটির আবিষ্কার আলোক-সম্পাত করিবে বলিয়া আশা থাকায়, পণ্ডিতগণ ইতিমধ্যেই কলহে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

কঙ্কালটির নাম, মহাধ্যাপক রাখিয়াছেন—

"Simia Literatura"।

স্কুলের ছেলে (দোকানদারকে)—এক পাউণ্ড চা ॥৵৹, আধসের চিনি ৵৹ একটিন জমান দুধ ।৹ একটা কেটলি ১।৹—আচ্ছা এইগুলো কিনলে তিনটাকার ভিতরে কত ফেরৎ পাব ?

দোকানদার।—(সাগ্রহে) বারো আনা।

ছেলে।—ধন্যবাদ এই আঁকটা বাড়িতে কিছুতেই করতে পারছিলাম না।

(প্রস্থান)

—

সোফা ও খোঁপা

I sing the Sofa,
তার সনে জড়িত যে খোঁপা।
চিরদিন রহিবে স্মরণে
ধরণে গড়নে আর নড়নে-চড়নে।

তোমারে প্রণমি তাই কবি কাউপার!
(বহু কাউ করিয়াছি পার
হোটেলে টেবিলে
শূন্য ট্যাঁকে ফিরিয়াছি শোধ করি বিলে
তুলিয়া ঢেকুর, কিন্তু) তবু
ওহে মহাকবি! কভু
ভাবিনি গাহিতে হবে সোফার গীতিকা,
কিম্বা হবে কথিকা-বীথিকা
গদ্য কাব্যে (মিল নাহি জুটে),
কাটিয়া কাব্যের 'রুট'এ
রচিব অসম ছন্দে
যথা—'মেঘদূতী' শ্রীনরেন্দ্রে
রচিয়াছে বিষম সে কাব্য 'বসুধারা'—
তেমতি এ অভিনব সোফাই-ফোয়ারা।

তুমি এসো এসো বাণী! আধুনিক বেশে,—
Medias resএ

যদিও হইবে সুরু সোফার এ গীতি,
—মহাকাব্য রীতি
আধুনিক হইলেও মানি ;
কিবা তাহে হানি ?
এসে এসো বাণী !

দক্ষিণের মত্ত সমীরণ
করি আহরণ
পথের পুঞ্জিত রজঃ বালিগঞ্জে
ক্ষ্যাপাইয়া অঙ্কে খঞ্জে
মায়াকুঞ্জে প্রবেশিয়া উড়াইছে ছলে
দুয়ারের চেলাঞ্চলে
ব্যারিষ্টার 'ভাসোর' ভবনে।
মধুর পবনে
আধা উড়া সাদা পর্দ্দার
(খবর্দ্দার ! নহে পরদার)
চতুর স্পর্দ্ধার
এই ফাঁক টুকু বুঝে নবীন তরুণ
'মিটার করুণ'
হেরিল—সহস্রতম বার
হেরিয়াও যার
পায় নাই রূপের সীমানা—
তনু-দেহখানা
বিছাইয়া আধ অযতনে

(তার মানে, অতি সযতনে)
হেলাইয়া বাঁকা গ্রীবা, এলাইয়া বাহুখানি,
আ-স্কন্ধ বিমুক্ত পাণি,
'প্যাস নে' শোভিত আঁখি
ডান-হাতে-খোলা-গ্রন্থে রাখি,
নাকের সম্মুখে ধরা
একবারও-নাহি-পড়া
'ফেভরিট' লেখা মাঝে নিমজ্জিতা
পুনর্ব্বার। অযত্ন-সজ্জিতা
তার আয়াসের গড়া সেই অযতন বেশে,
সুপুষ্ট খোঁপার কেশে,
উড়ু উড়ু চূর্ণ চুলে,
গ্রীবা মূলে
কি যেন নবীন স্বপ্ন প্রেরণা নবীন
মিটারের প্রাণ বীণ
ঝঙ্কারিয়া
ধনু সম তনু তার টঙ্কারিয়া,
আধ-উড়া পর্দ্দার পারে
জ্যা-বিমুক্ত তীর সম তারে

উড়াইয়া আনিল ফেলিয়া, যেথা তার বিয়াত্রিস্—
—বর্ষ ত্রিশ
বসন্তের মণ দুই লতাখানি সম
ভারসহ মনোরম
সহকার অপেক্ষায়—রহিয়াছে বসি'

আঁটিয়া জাঁকিয়া ধ্বসি'
ভাসো-ভবনের সেই পরিচিত সোফা—
মাথা-জোড়া খোঁপা
ভাসোর দুহিতা গোপা !

তারপর ? উর দেবী ! উর ইউরেনিয়া
এ যুগের, প্রাণ-উড়নিয়া
ছন্দ লয়ে এসো অয়ি ! ডিকেণ্টার্ সাহিত্যের নার্স
অয়ি বাণী ! ড্রয়িংরুম্ foreign waters
এই বাঙালের আগে
চিত্তে তায় দ্বিধা জাগে
কি কহিতে কিবা কহি,
আইস্ক্রীম কই 'দহি'
লজ্জা পাই লজ্জাতীত ইঙ্গ-বঙ্গ মাঝে
অথবা আপ্-টু-ডেট্ সাহিত্য সমাজে ।
আধুনিকী উরেনিয়া !
কাজ নাই risk নিয়া,
সপ্তম সেই স্বর্গে ওড়া-দুরাশায়
কেন ডানা মেলি ? যে ভাষায়
কথা চলে তাহাদের মাঝে
জানি না যে,
জানিনা সে 'এটিকেট্' 'ইডিয়ম্' ।
তাই ভাবি, করি মীডিয়ম্
তোমাদের, চোস্ত
ড্রয়িংরুম্-বাণী যারা করেছ দোরস্ত,

রচি এই ভরসায়
তোমাদের গীতিকথা স্বকীয় ভাষায়
তোমাদের—ওহে সোফা!
ওগো খোঁপা!

সোফার আত্মকথা

পা'এর উপরে পা' খানি তুলিয়া
ডানা সম তার বাহুটি মেলিয়া
বসি'ছিলা যবে লীলায় হেলিয়া
ভাসোর দুহিতা গোপা,
চুপে চুপে চাহি করুণ মিটের
দাঁড়াল আসিয়া পিছনে পীঠের,
গোপা রয় হেলি' পাইয়াও টের—
পা'এর উপরে পা।
'প্যাসনেতে' আঁটা পাথর-মহলে
চোখ দুটি তার হাসে কুতূহলে,
পুঁথির পাতায় যদিও টহলে
ফিরিতেছিল বা তারা।
চোখ টিপে ধরে করুণের কর,
সমুখের পুঁথি কোলের উপর
ফেলি কহে বালা—'জ্বালালে যে বড়
ডে-জ্বি! বড় বেয়াড়া!'

চোখ ছাড়ি দিয়া হা হা করি হাসি
করুণ মিটার দাঁড়াইল আসি,
গোপার অধরে হাসি উঠে ভাসি
'Oh ! I see'—কহিল সে,
'তাই বটে তাই হইয়াছে ভুল,—
ডেজির এমন চাষাড়ে আঙুল ?'
'গাল পেড়ে তাই কত পাবে কূল ?'
মিটার কহিল হেসে।
'Truth !' সোজা হয়ে বসি গোপা কয়,
'গাল দেখ কোথা ? গাল এত নয়।'
'তাই নাকি ? তবে এবে গেল ভয়'
—সমুখে বসে মিটার।
ওঘরে—পাইয়া মিটারের সাড়া
মেম সাহেবের কান হয় খাড়া,—
Shilling Thriller এ সা'ব জ্ঞানহারা
—পলাইছে টু-সীটার !
গাল-ভরা হাসি ঢুকিলা মিসেস্
ভাবিয়া দেখিলা—একটু recess
না দিলে এ ঘন-আলাপন শেষ
হয়ত বিফল হবে।
সাদরে বসিয়া মিটারের পাশে
খুলিয়া দিলেন আলাপন রাশে
যে কথা ফোটে না, শুধু মনে আসে
তাহাই কহিলা নীরবে।

এক বাহু তার আমার উপরে ;
পরশে তাহার লইছিনু পড়ে
অকথিত কথা বহুদিন ধরে
জপেছে যা চুপে চুপে।
ভাবিছে তরুণ বসি তার পাশে—
"দুহিতার পিছে মাতা কেন আসে
Winding sheet কেবা ভালো বাসে
ঢাকিতে শাড়ীর রূপে ?
চালিশের পরে Society Pass
দেয় কেন আর ? Law বড়ই ass !
গোপার খোঁপার 'বিউটি' বিনাশ
করে মা'র মাথা টেকো।'
বুঝি মনে কহি'—'তাড়া কেন ? রোসো।'
শ্রীমিসেস ভাসো কহিলেন 'so so
'নাহি অবসর ; তুমি তবে বসো,
গোপা ! তুমি হেথা থেকো।'
একখানি হাত রাখি মোর কাঁধে
আর খানি তার নেক্‌লেসে বাঁধে,
হেলিয়া ঢলিয়া লীলায়িত ছাঁদে
বসিলা আবার গোপা।
চুপি চুপি হাত আমারে বুলায়ে
গলার হারটি ঈষৎ ঝুলায়ে
কি কহিলা মূক পা'খানি দুলায়ে
জানি তা আমিই সোফা।

কি ভাবিছে এবে করুণ মিটার ?
কেমনে জানিব নাহিক metre
থাকিলে জানিতে হিয়া, two seater
ছুটিতেছে লয়ে কারে।
'গোপার বাহুটি যেন ছোট পাখী
আমারি হাতের নীড় খোঁজে না কি ?'
শিকারীর মত হাতখানি রাখি
সেও কি খোঁজে শিকারে ?
কেবা ভীরু পাখী কেইবা শীকার
এর পরে আর বলা বড় ভার,
শুনিছিনু শুধু—করিছি স্বীকার,—
মিস্ গোপা কয়, 'naughty !'
—থ্রিলারের থ্রিল কাটিল নিমেষে
উঠিলা সাহেব, উঠিলা মিসেসে,
চোখে চোখে চাহি বুঝিলা বিশেষে
মিটার ! এবার caught ye !
বসি দু' আসনে দুয়ে মুখামুখি
প্যারাম্বুলেটারে দুটি খোকাখুকী
হাসিয়া দুলিয়া করে চোখাচোখি,
হাতে হাতে আন্‌চান।
দখিনা বাতাসে বহিতেছে balm,
'পারলার' যেন আরাম-হামাম,
গোপার খোঁপাটি ঢাকিছে তামাম
মিটারের মনপ্রাণ।

হাত ছাড়ি' হাত উঠাইতে মাথে
হাতখানি তার গোপা বাঁধে হাতে—
কঙ্কণের চোখে ধাঁধা লাগে রাতে
মাথার বিশাল খোঁপা ।
জলে কালো খোঁপা মাথা বিলসিয়া
ধরিল মিটার ধপাস্ বসিয়া—
দু'মণে-দু'মণে উঠিনু শ্বসিয়া
পুরাতন দেহী সোফা ॥

খোঁফার আত্মকথা

গুম্‌রিয়ে উঠেছিল সোফা,
চম্‌কিয়ে উঠেছিল গোপা,
মিটারের হাতখানি তবু নাহি বাধা মানি
খুঁজেছিল প্রিয়তম খোঁপা !

খপ্‌করে কর-বলে টেনে
শিরখানি নিজ বুকে এনে
কানে কানে কহে 'সখি ! ডিয়ারি ! নিয়েছ ওকি
প্রাণ মন খোঁপা-পাশে কিনে !'

ধপ্‌ধপে crease টানা স্যুটে
ঘুটু ঘুটে মোর রূপ লুটে,—
মিটারের মৃদুবাণী কানে মধু দিল আনি,
হাত খানি বাঁধে করপুটে ।

বাক্ নাহি—কথা কভু আসে ?
মূক হ'য়ে, তবু হ'য়ে ভাষে—
কথা তার বুঝা দায় ধ্বনি ছাড়া বাণী ধায়,
দপ দপি দোলে হিয়া শ্বাসে।

চোখ দু'টি বুজি আছে বালা
—চোখ বুজে দেখিবারি পালা—
মিটারের চোখ দুটি করিতেছে লুটোপুটি
বিজলীতে আমি যেথা আলা।

ঠোঁট দুটি পরশিতে খোঁপা
চম্‌কিয়া উঠে বসে গোপা—
'ছাড়ো ছাড়ো, শোনো শোনো ! উঁহু উঁহু, নোনো নোনো,'
দুম্ করে ভেঙে পড়ে সোফা !

তারপরে চারিদিকে সাড়া
দুপ্‌দাপে প্রবেশিছে কারা ?
মাতা আসে, আসে পিতা আসে ঝাল আসে তিতা
ভিড় করে আসে বুঝি পাড়া !

—ঠ্যাঙ-খসা সোফাটির পরে
চম্‌কিয়া দুজনায় ধরে'
দৃঢ় করি ভুজ পাশে আছে তারা এক পাশে
—দেখছিল সবে ঢুকে ঘরে।

মিটরের দাঁতে ঝোলে খোঁপা !
টাকমাথা আগ্‌লায় গোপা—
তবু এ সে ঠোঁটে রয় ! কালো মোজা খান কয়,
সীনটি জমিয়া ওঠে তোফা !

উপসংহার

মহাকবি পোপ !
বেণী-সংহারের ফলে যেই প্রেম কোপ
উঠেছিল জ্বলি,
গিয়েছ তা বলি
তোমার সুঠাম ডান-বামহীন ছন্দে।
অধম তোমারে বন্দে,
নাহি নিজে গাহিবার আশা
না জোগায় ভাষা,
তাই মীডিয়ম্-মুখে বলি
বেণী রূপে কিম্বা খোঁপা রূপে ছলি
কেমনে ধরিল একদিন
মোজা নামে হীন
পাদবস্ত্র প্রেমিকের প্রাণ—
ষ্টকিং রাখিল ব্লু-ষ্টকিংএর মান।
গাহিয়াছ এক অর্দ্ধ, পোপ
আমি গাহি অন্য অর্দ্ধ, করিয়োনা কোপ,
—প্রেমের সংহার হয় বেণীর সংহারে
বিয়ের বাজার খোলে খোপার বাহারে,
অতএব, জয় গাহি, বাঙলার বিদুষীর খোঁপা,
I sing the Sofa.

দিবাকর শর্ম্মার পাঁঠা

শ্রীযুক্ত 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক

বরাবরেষু,

মহাশয়,

বড় বিপদে পড়িয়া আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। শুনিলাম দিবাকর শর্ম্মা নামে এক ব্যক্তির সহিত আপনাদের পরিচয় আছে। তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা জানিতে না পারায় আপনাকে এই পত্র দিলাম। তাঁহার পাঁঠাটীর অচিরাৎ একটা ব্যবস্থা না করিলে আমার গৃহ-বিপ্লবের সম্ভাবনা। নিম্নের বিবৃতি হইতে সমস্ত জানিতে পারিবেন। পথ চাহিয়া রহিলাম। পত্রের ত্রুটী লইবেন না। অনুরূপ পত্র 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'র সম্পাদকের নিকট দিলাম কিন্তু দিবাকর বাবুর বন্ধু সজনী বাবুর পূরা নাম ও ঠিকানা জানিতে না পারায় তাঁহাকে আর পত্র দিতে পারিলাম না। নিবেদন ইতি ১৫ই পৌষ—

'দন্তালয়' ভবদীয়—
৬৪, কলাগাছি রোড, শ্রীধনঞ্জয় শর্ম্মা

ওরফে

D. Sarma—Dentist

Author (?) of Pyorrhœa Specific.

সেদিন রাত্রিটা ছিল গুমট। শেষ রাত্রির দিকে একটু ঠাণ্ডা পড়াতে সমস্ত রাত্রির ঘুম চোখে আসিয়া জমিয়াছিল। মৃদু কড়া নাড়ার গুঞ্জন কানে আসিতেছিল। সেই শব্দে ঘুম না ভাঙিয়া বরং যেন

চোখে জড়াইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় কানে আসিল দূরাগত বাঁশীর সুরের মত "আছেন কি আপনি?" সেই সঙ্গে কি যেন 'ম্যা'-'ম্যা' করিয়া উঠিল। ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ মুছিয়া দেখি ভোর হইতেছে। কড়া নাড়ার শব্দের বিরাম নাই। বিরক্তি বোধ করিলাম। আলস্য ভাঙ্গিয়া স্খলিত চরণে খোলা জানালার কাছে আসিয়া নীচের দিকে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না শুধু একটা সবুজ ওড়নার মত কী যেন সদর দরজার কাছে বাতাসে এদিক ওদিক নড়িতেছে। কড়া নাড়া পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিলাম "কে মশায় আপনি এত রাত্রে।" একটা কোমল মিহি স্বরে উত্তর আসিল "তা হলে আছেন আপনি। রাত ত আর নেই—উষার চুমে চোখ মেলেছে সে—একটু দয়া করে দেখা দেবেন কি?"—কথা শুনিয়া ভাবিলাম কোন পাগল,—ভাবপাগল হয়ত—দাঁতের ব্যথায় এই ভোরে ডাক্তারের কাছে আসিয়াছে। কিছু উপার্জ্জনের আশায় কোঁচার মুড়াটা গায়ে জড়াইয়া চটি পায়ে নীচে নামিয়া আসিলাম। দরজা খুলিয়া বলিলাম "আসুন"। ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির ভঙ্গিতে একটা নাতিক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া ঢুকিলেন একটি কিশোর, সঙ্গে—সবুজ ফিতা দিয়া বাঁধা একটা ছাগ-শিশু। তাহার গলায় একটা ছোট ঘুঙুর বাঁধা, টুং টুং করিতেছে। স্বল্পালোকে ছাগটির বর্ণ সবুজ বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমি অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার অবস্থা হয়ত বুঝিতে পারিয়া কিশোরটি কহিল "বিস্মিত হচ্ছেন আপনি: এইটি আমাদের সঙ্ঘের first fruit—আদি ফল। আমাদের চির শুভাকাঙ্ক্ষী আপনি। আজ সঙ্ঘের বাৎসরিক জন্ম-তিথিতে আমাদের উদ্যমের প্রথম সন্তান উপঢৌকন পাঠিয়েছেন সভাপতি মহাশয় আপনাকে।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ সঙ্ঘ

বুঝতে পারচিনে।” কিশোর কহিল, “নাম শোনেননি সবুজ সঙ্ঘের? আর শুনবেনই বা কেমন করে? কুমার নীল বললেন, সঙ্ঘের পত্রোদ্গম সময়ে কলকাতায় পাওয়া যায় নি আপনাকে! আপনার উপস্থিতির উৎসাহ হ’তে বঞ্চিত হওয়ার ব্যথা সইতে হয়েছে আমাদের। সে বেদনার স্মৃতি জলছে—” বাধা দিয়া বলিলাম—“কৈ কুমার নীল বলে তো কাউকে জানি না।” কিশোর বলিল, “জানবেন কি করে? এখনও বছর ঘুরে যায়নি—আমাদের মন্মহারাজ কুমার নীল ফিরেছেন “বাস্তবিকা”র সবুজ সঙ্ঘের উদ্‌যাপন করতে। আপনাদের “কুমার রায়” যে আজ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা কুমার নীল।” ‘বাস্তবিকা’, ‘কুমার রায়’ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ হইবার ভয়ে কোন কথা বলিলাম না। সংক্ষেপে প্রশ্ন করিলাম— “কুমার রায় নীল হ’লেন কেন?” কিশোরটি উত্তেজিত হইয়া বলিল,— “বুঝতে পারছেন না আপনি? বুঝবেনই বা কেমন ক’রে? নীল, সবুজিয়া সঙ্ঘের সদস্যগণের সংজ্ঞা, যেমন নামটি আমার কচি নীল। পৃথিবীকে সবুজ করতে চাই আমরা। প্রত্যেক নর-নারীর প্রাণ, মন, কায়া সবুজ করা, সবুজ রাখাই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। সবুজের প্রচার দিগ্বিদিকে করব আমরা। সাহিত্য, দর্শন, মিউনিসিপালিটি, কাউনসিল, ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিভারসিটি, স্কুল, কলেজ, টোল, মক্তব, মাদ্রাসা সবুজে ভ’রে দেব। নইলে দেশের উদ্ধার নেই, মানব জাতির উদ্ধার নেই।” আমি কিশোরটির এই উত্তেজনার কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“তোমার পিতৃদত্ত নাম?” উত্তর আসিল “নীলের নাম নেই—গোত্র নেই—পদবী নেই—সব সবুজ, সব সবুজ। [illegible] গোত্র, পদবী আমাদের মিলনের মহা অন্তরায়। হিন্দু, মুসলমান, [illegible]ষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মালী, ছুতর সব ধর্ম ও

বর্ণের নরনারীর সহজ মিলনের বাধা দূর করবে নীল। মানব প্রাণের চিরন্তন মিলনের বুভুক্ষা যে জাগছে—উঃ কি সে তিয়াস্! সেই মিলনের যোগ, সেই তৃষ্ণার বারি আন্‌বে সবুজিয়া। কুমার নীল মহারাজের এই শ্রেষ্ঠ দান আজ মাথা পেতে নিয়েছে যত দেশের তরুণ তরুণী। গল্পে, কবিতায়, গানে, নাটকে, সবুজের যে অভিযান চলেছে দেখেছেন কি? তারই সফলতা আন্‌বে সবুজিয়া। আমাদের G. C. D.-র প্রতিষ্ঠা তারই জন্য।"

"G. C. D?"

"হাঁ সবুজিয়ার Goat culture departmentএর কথা শোনেননি কি? যত বড় বড় সাহিত্যিক মানবেন্দ্রবাবু, চিন্তাহরণবাবু, শাক্যসিংহ বাবু, বাসনা দেবী প্রভৃতি আমাদের patron হয়েছেন। স্বয়ং কবি-ঋষি পাঠিয়েছেন আশীর্ব্বচন।"

"পাঁঠার সহিত সাহিত্যের—" আমার প্রশ্ন শেষ হইতে না দিয়া কিশোর বলিয়া উঠিল,—"পাঁঠাকে বড় ছোট ক'রে দেখছেন আপনি—শুধু মানুষের খাদ্য হিসাবে, কিন্তু ওর অন্তর্নিহিত বৃহত্তর রূপ চোখে পড়েছে কি আপনার? মানবেন্দ্রবাবু বলেন,—ছাগ সাম্যের প্রতীক। প্রাণ তার চির সবুজ, মিলন-ক্ষুধা চিরন্তনী। ছাগের মাতা নাই, ভগ্নী নাই, মাসী নাই, মামী নাই, শালী নাই, শালাজ নাই। গতি তার অবাধ, তার লীলা প্রাণবন্ত। মানুষের মত পরিবারের বন্ধন, ধর্ম্মের অনুশাসন, আচারের অত্যাচার, প্রতিপদে তাকে বাধা দেয় না তাই আজও দেহের যৌবন অতিক্রম ক'রে মনের যৌবন বেঁচে আছে তার। জগতের প্রেমের সত্যকার philosophy এই ছাগ হ'তে আমরা পেয়েছি। শিশু-ছাগ হ'তে অতি-বৃদ্ধ গন্ধ ছাগের লীলা-ভঙ্গি একই পথ নির্দ্দেশ করে না কি? আজ তাই বাস্তবিকা লোক-কল্যাণে ছাগের

আদর্শ দেশের সর্ব্বত্র ও সর্ব্ববিষয়ে—"। ছেলেটির ডেঁপোমি আমার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল; এদিকে প্রকৃতির তাড়না ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় আমি অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। ছেলেটির উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া বলিলাম, "বুঝেছি সব। এখন তবে—।" এমন সময় খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি—কী সর্ব্বনাশ! পাশের বাড়ীর পাঁচীর মার নিকট হইতে অবসর-ক্ষণ কাটাইবার জন্য গৃহিণী অধুনালুপ্ত সবুজ পত্রের এক সংখ্যা আনিয়াছিলেন, পাঁঠাটি তাহার মলাটটি অবলীলাক্রমে চর্ব্বণ করিতেছে। পাঁঠার মুখ হইতে পত্রিকাখানা কাড়িয়া লইতে গিয়া দেখি যে ইতিমধ্যে মলাট-পত্র মায় সম্পাদকের নাম তাহার উদরস্থ হইয়া গিয়াছে। আমার ভয়ঙ্কর রাগ হইল। পাঁঠার মুখে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলাম। সে ম্যা ম্যা করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কচি নীল "করেন কি? আহা করেন কি?—" বলিয়া আমার নিকট হইতে পাঁঠাটি একপ্রকার কাড়িয়া লইয়া সস্নেহে উহার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিয়া উঠিল, "ধন্য আমাদের সাধনা। সবুজের নাম সার্থক করেছে ও। কিছু বলবেন না ওকে। কী খুসী হতেন কুমার নীল উপস্থিত থাকলে আজ!" এমন সময় ঘড়িতে টং-টং করিয়া ছ'টা বাজিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া কিশোরটি বলিল—"আর না, অনেক ব্যথা দিয়েছি আপনাকে। ক্ষমা পাব কি? আর তো থাকতে পারছিনে। আমাদের গঙ্গাযাত্রার সময় হল আসি তবে—" এই বলিয়া পূর্ব্ববৎ নমস্কার করিয়া বাহির হইতে গিয়া ফিরিয়া আমার হাতে দুইটি খাম দিয়া বলিল,—"ক্ষমা করবেন। বড্ড ভুলেছিলাম আমি?" আমাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া বিদ্যুৎবেগে সে চলিয়া গেল। কচি নীলের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। হঠাৎ গৃহিণীর হুঙ্কারে আমার চমক ভাঙ্গিল। ঝাঁটা হস্তে গৃহিণী বেগে বাহিরের

ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"দূর করে দাও। আপদ বিদায় কর, নইলে আমি কুরুক্ষেত্র করব।"

"হয়েছে কি?"

"আর হয়েছে কি! হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু এই দেখনা আমার সবুজ রংএর সাড়ীর দশা।" দেখিলাম সাড়ীর অঞ্চলের খানিকটা কে যেন চিবাইয়া খাইয়াছে। সমস্তই বুঝিতে পারিলাম। এক্ষুনি ব্যবস্থা করিতেছি বলিয়া গৃহিণীকে বুঝাইয়া বিদায় করিয়া দিলাম। এতক্ষণে হস্তস্থিত দু'খানা খামের উপর দৃষ্টি পড়িল। প্রথম খামটি খুলিয়া দেখি তন্মধ্যে একখানা নিমন্ত্রণ লিপি। তাহার চতুর্থ পৃষ্ঠায় একটি প্রোগ্রাম। নিমন্ত্রণ পত্র সবুজ groundএর উপর সবুজ কালিতে ছাপা। পত্রের শিরোদেশে দুইটি ডাব, একটি বৃক্ষ-শাখা, দুইটি ছাগ-শিশুর ছবি। নিম্নে লেখা—

আমন্ত্রণ মিনতি—

বন্ধু, বাস্তবিকার সবুজের জন্মতিথি ফিরে এসেছে—আজ আপনাকে সাথীরূপে পাওয়ার জন্যে। এই মিলন যাগের হোতা হবেন সবুজ বাংলার কথা-রসের সেরা রসিক আপনাদের প্রিয়তম ভারতচন্দ্র। আপনার সাহচর্য্যের উৎসাহ দিয়ে এই মিলনকে ফুটন্ত করে তুলতে হবে যে বন্ধু। ইতি—

৫৫ নং পাউণ্ড প্রেস
সবুজ সহর
১৫ পৌষ।

ভবদীয়—
কুমার নীল (রায়)

স্মারক—

বেলা ৬টা—সবুজের মঙ্গল আরতি ও উষা কীর্ত্তন।

৬॥০ হইতে ৭॥০টা—সবুজের জল অভিযান—স্থান সুরধনী নীর।

৮ টা হইতে ১০ টা—সঙ্ঘের সদস্যা ও সদস্যগণের প্রীতিসম্মিলন।

১০—১১ টা—মিলন ভোজ।

১১টা হইতে অপরাহ্ন ৫টা—বিরাম।

অপরাহ্ন—

৫টা হইতে আরম্ভ—

G. C. Dর বাৎসরিক অধিবেশন

১। মাঙ্গলিক

২। সভাপতি নির্ব্বাচন

৩। বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ

৪। আলোচনা ও বক্তৃতা

বিষয় ও বক্তা—

(ক) ছাগ-দর্শন—অধ্যাপক শিবদাস মুখোটী

(খ) রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে ছাগের স্থান—ডাক্তার মানবেন্দ্র রায়

(গ) ছাগধর্ম্ম ও তাহার অনুশীলন—শ্রীশাক্যসিংহ সিংহ

(ঘ) Goat in Continental Literature (A Comparative Study)

—Prof. C. H. Gupta

রাত্রি—

৭—৮॥০—জলসা—

নীলানীল, নিশানীল, আশানীল, এষানীল, কাঁচানীল, কচিনীল, কুহুনীল, কেকানীল প্রভৃতি সবুজের সদস্যা ও সদস্যেরা যোগদান করিবেন।

৮॥০—৯॥০—মিলন ভোজ

[illegible]—'ছাগীর পূজা' নাটিকাভিনয়

স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্রী বাসনা দেবী অভিনয়ে যোগ দিবেন।

বিদায়—যবনিকা।

২য় পত্র খুলিয়া দেখি লেখা আছে—

সুহৃদ্বর দিবাকর শর্ম্মা

করকমলেষু,

চির হিতৈষী আপনি আমাদের, তাই প্রিয় রুচি নীলের হাতে সঙ্ঘের নবোদ্যমের প্রথম ফলটি পাঠালেম আপনাকে—বাস্তবিকার এই প্রীতি উপহার আপনার পরম প্রীতিকর হবার আশায়।

সবুজ সঙ্ঘ আপনার স্নেহপিয়াসী
১৫ পৌষ কুমার রায় (নীল)

পুনঃ আজকার উৎসবে দেখা কি পাবনা?

কুমার—

Address পড়িয়া দেখিলাম—দিবাকর শর্ম্মার নাম লেখা। পূর্ব্বে যাহা সন্দেহ মাত্র ছিল এখন তাহাতে নিঃসন্দেহ হইলাম। বাটীর প্রস্তর ফলকে D. Sarma, Dentist লেখা দেখিয়া গৃহকর্ত্তাকে দিবাকর শর্ম্মা বোধে রুচি নীল এই কাণ্ডটি করিয়াছে! আমার পক্ষে এই ঘটনা সম্পূর্ণ Tragedy of Errors হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৃহিণীকে সমস্ত খুলিয়া বলিলাম—এই দণ্ডে ঐ পাঁঠার সদ্গতি করিতেছি বলিয়া—দিবাকর শর্ম্মার খোঁজে পাশের বাড়ীতে যাইয়া অনুসন্ধান করায় জানা গেল যে বৎসরাধিক পূর্ব্বে দিবাকর শর্ম্মা নামে একজন সাহিত্যসেবী এই বাড়ীতে বাস করিতেন। শনিবারের চিঠি ও আনন্দ বাজার পত্রিকার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহার বেশী কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা কেহই জানে না। অনেক বেলায় গৃহে ঢুকিতেই শুনিলাম গৃহিণী গর্জ্জন করিতেছেন—"মিন্সের আক্কেল দেখ! সব খদ্দের ফিরে গেল—উনি পাঁঠার পিরীতে পাড়া চ'ষে বেড়াচ্ছেন। বাপু, পেটে দিলেই ত সব গোল মিটে যায়।" আমি নিঃশব্দে dispensary ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

স্বর্গীয় মামলা

স্বর্গে মহাচাঞ্চল্য সমুপস্থিত।

শ্রীরাধা কবি চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে মানহানির মকদ্দমা রুজু করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে স্বর্গলোকে এরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই। শ্রীরাধিকা স্বর্গীয় আদালতে যে কথা বলিয়াছেন তাহা এই—"হে দেবরাজ ইন্দ্র, হায় হায় আমার সতীত্ব, আত্মসম্মান, সমস্তই বিনষ্ট হইল। চণ্ডীদাস প্রমুখ কয়েকটি নিষ্কর্ম্মা লেখক আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া অশ্লীল কবিতা লিখিয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রচার করিয়া আসিয়াছে। আমি কৃষ্ণ নামক কোনও ব্যক্তিকে কখনও চিনিতাম না। আমার বিবাহিত স্বামী আয়ান ঘোষ আমার পরম গুরু। আমি অন্য কোন পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে কখনো আসি নাই। হে দেবরাজ, হে স্বর্গলোকের নিয়ামক, আমি অবলা অসহায়া রমণী—ক্ষোভে ও অপমানে আপনার ধর্ম্মাধিকরণে বিচার প্রার্থনা করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সদয় হউন—ইহার প্রতিবিধান করুন।"

ইন্দ্রদেব স্বভাবতঃই একটু 'শিভ্যল্‌রস্‌'—তাহার উপর সম্প্রতি তিনি স্বর্গে অধুনাপ্রতিষ্ঠিত 'নারী-রক্ষণ সমিতি'র সম্পাদক হইয়াছেন। তিনি শ্রীরাধার দরখাস্তে আঁখিজল প্রত্যক্ষ করিয়া বিগলিতচিত্তে এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

২

সমস্ত ব্যাপারটার মূলে কিন্তু বিড়ি!

পূর্ব্ব-ইতিহাস না জানিলে এই অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার হদিস

পাইবেন না। গোড়া হইতেই শুনুন। সম্প্রতি মর্ত্ত্যের—বিশেষতঃ বঙ্গ ও বেহারের—বহু বেকার উকীল স্বর্গে গিয়া আড্ডা গাড়িয়াছেন। তাঁহাদের রোগা রোগা ও কালো কালো আকৃতি দেখিয়া (দু একজন ফিরোজা রঙেরও আছেন !) স্বতঃই সন্দেহ হয় যে বোধ হয় বেচারারা অন্নাভাবেই অল্পবয়সে মৃত্যু-কবলিত হইয়াছেন। ইঁহারা নরকে না গিয়া স্বর্গে আসিলেন কেন তাহার প্রকৃষ্ট কারণ মর্ত্ত্যলোকে তাঁহাদের হাতে কোন কাজকর্ম্ম না থাকায় তাঁহারা গঙ্গাস্নানাদি ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন। প্রত্যেকেরই তিন চার জন করিয়া 'বাবা' অর্থাৎ গুরু ছিল শুনিতে পাই। আদালতের ছুটি হইলেই তাঁহারা অবস্থানুসারে কাছাকাছি তীর্থস্থানগুলি সারিয়া আসিতেন। সুতরাং মর্ত্ত্যে থাকিতে থাকিতেই তাঁহারা স্বর্গের 'সীট্ রিজার্ভ' করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পেশার খাতিরেও মানুষ মাঝে মাঝে দু একটা মিথ্যাকথা বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে অনেক সময় স্বর্গের পথে কাঁটা দিয়া ফেলেন। কিন্তু আগেই বলিয়াছি ইঁহারা ছিলেন 'বেকার'—পেশার বালাই ছিল না। সুতরাং মরার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নিষ্কণ্টক পথে সোজা ইঁহারা স্বর্গে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু স্বর্গে আসিয়া এই একপাল বেকার উকীল মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহারা যেন আরো বেকার হইয়া পড়িলেন। মর্ত্ত্যে যখন ছিলেন তখন তাঁহাদের কাজ ছিল সকাল-সন্ধ্যা ধর্ম্ম-চর্চ্চা করা, বার-লাইব্রেরিতে আড্ডা দেওয়া (অনেকে অবশ্য গাছতলায় এ কার্য্য করিতেন), সাধ্যমত বিড়ি খাওয়া ও বংশবৃদ্ধি করা।

এখানে ইঁহারা করিবেন কি ? ধর্ম্মকর্ম্ম করার আর প্রয়োজন নাই। উদ্দেশ্য ত সফল হইয়াছে—স্বর্গে ত আসিয়াই পড়িয়াছেন। সুতরাং সকালে ও সন্ধ্যায় অনেকটা সময় আর কাটিতে চায় না।

দ্বিতীয়তঃ এখানে তাঁহাদের গৃহিণীরা এখনও আসিয়া পৌছান নাই। তাঁহারা প্রায় সকলেই এখনও মর্ত্ত্যলোকে কাচ্চাবাচ্ছা লইয়া হয় পিত্রালয়ে না-হয় দেবর বা ভাসুর অথবা মামা-মেসোর আশ্রয়ে স্বামীর সুমহান স্মৃতি বক্ষে ধারণ করতঃ সুপবিত্র বৈধব্য যাপন করিতেছেন। কয়েকজন নাকি আত্মহত্যা করিয়া নরকেই গিয়াছেন শুনা যাইতেছে। স্বর্গীয় উকীলকুল গৃহিণী-বিহীন হইয়া ভারি বেকার হইয়া পড়িলেন। উপায় কি? কিন্তু এত শীঘ্র তাঁহারা বেকারত্বের চরম সীমায় উপনীত হইতেন না যদি স্বর্গে একটিও বিড়ি-ওলা থাকিত। অনেকের ত গাছতলায় আড্ডা দেওয়া অভ্যাসই ছিল—নন্দনকাননে আড্ডাটা বেশ জমিয়া উঠিত কিন্তু হায় বিড়ি নাই! বিড়ি না ফুঁকিলে আড্ডা জমে কি? তাঁহারা তখন বিড়ির জন্য নানারূপ 'এজিটেশন' সুরু করিলেন। কিন্তু সমস্তই বৃথা। অনেক খোঁজ খবর করিয়া জানা গেল যে কৈলাস পর্য্যন্ত ধাওয়া করিলে এক আধ ছিলিম গাঁজা জুটিতে পারে—কিন্তু বিড়ি মিলিবে না। এ অঞ্চলে কেহ বিড়ি খায় না। স্বর্গারূঢ় উকীলগণ মহা ফাঁপরে পড়িলেন। স্বর্গসুখ তাঁহাদের তিক্ত বলিয়া বোধ হইল, মন্দার পারিজাত কামধেনু সব 'বোগাস্' বলিয়া ঠেকিল—নৃত্যপরা অনন্তযৌবনা অপ্সরীবৃন্দ তাঁহাদের উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা যখন আর একটা 'রেপ্রেজেণ্টেশন' করিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন এমন সময় দেওঘরের এক বিড়িওলা হঠাৎ স্বর্গলাভ করিল। সে বিগত বিশ বৎসর ধরিয়া বাবা বৈদ্যনাথকে ক্রমাগত প্যাঁড়া ভোগ দিয়া এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। সে আসিয়াই চট্ করিয়া নন্দনকাননের নৈর্ঋত কোণে এক বিড়ির দোকান খুলিয়া বসিল। আকুল উকীলকুলের আনন আনন্দে উদ্ভাসিত ও নন্দন কানন ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

৩

একদিন চণ্ডীদাস প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

ভোর হইতে তিনি মনে মনে "বড়ারী"তে গুন গুন করিয়া যে নূতন "পদাবলী"র গানটি রচনা করিতেছেন তাহার প্রথম কয় ছত্র এইরূপ—

ওগো, আকুল হৈল প্রাণমন
উরবশী মুখ-শশী হায় মরমেতে পশি'
পরাণ করল উচাটন।

এখানে বলা আবশ্যক যে স্বর্গে আসিয়া চণ্ডীদাস উর্ব্বশীর প্রেমে পড়িয়াছেন। রামী ধোপানিকে আর তাঁহার মনে ধরিতেছে না। "কামগন্ধ নাহি তায়"—এ প্রেম কি চিরকাল চালান যায়! সুতরাং তাহা নিতান্তই theoretical হইয়া পড়িয়াছে! এখন উর্ব্বশীর পিছু পিছু "মুগ্ধ কবি ফেরে লুব্ধ চিতে!" অথচ উর্ব্বশী কিছুতেই ধরা দিতে চায় না। চণ্ডীদাস ঠিক করিয়াছেন কীর্ত্তন গাহিয়াই তিনি উর্ব্বশীর হৃদয় জয় করিবেন! আজ সায়ংকালে উর্ব্বশীর বাড়ীতে গান বাজনা হইবে। চণ্ডীদাসের নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে তিনি এই নূতন গানটি গাহিবেন বলিয়া তাহার পদ-রচনায় ব্যস্ত হইয়া আছেন। প্রথম কয় ছত্র ত বেশ হইয়াছে—কিন্তু পরের ছত্রগুলি কেমন যেন কিছুতেই ছন্দে ধরা দিতে চাহিতেছে না। যুৎ-সই মনোমত কথা কিছুতেই সময়মত মাথায় আসে না। বহুবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চেষ্টা করিলেন—কিন্তু কিছুতেই না। শেষে ঠিক করিলেন—"নন্দনকাননে পারিজাতকুঞ্জে যাই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া লাভ কি?"

কিন্তু পারিজাতকুঞ্জে আসিয়া চণ্ডীদাসের কবিত্ব উবিয়া গেল। দেখিলেন কুঞ্জের চারিপাশে বহু বিড়ির টুক্‌রা পড়িয়া আছে এবং

কুঞ্জের ভিতরেও বিশ্রী গন্ধ ও ধোঁয়া! উকীলরা খুব ভোরে আসিয়া প্রত্যেকেই একটি একটি বিড়ি ধরাইয়া বসিয়া আছেন।

চণ্ডীদাস চটিয়া গান ধরিয়া দিলেন—

বিড়ি খাঞা খাঞা পারিজাত বনে
একি এ করেছ বঁধু
পারিজাত হিয়া ধূমে জর জর
নাহি যে সুরভি মধু!
বিড়ির টুকুরা পারিজাত বনে
হেরি আঁখি-নীরে ভাসে
কহে চণ্ডীদাস অরসিক জনা
কেন বা হেথায় আসে।

শুনিয়া উকীলরা ত মহা খাপ্পা! একজন দাঁতে বিড়ি চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ভাগ্ ভাগ্ ভ্যাগাবণ্ড, কোথাকার। বেশী টানেড্রাই ম্যানডাই কর্লে—ডিফামেশন কেসে পড়ে যাবি। সরে পড়।"

ব্যাপার দেখিয়া চণ্ডীদাস সরিয়াই পড়িলেন!

* * *

ইহার দিন দুই পরে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও একদিন নন্দনকাননে পরিভ্রমণ মানসে আসিয়া দেখেন একদল বেকার উকীল বসিয়া সেখানে বিড়ি টানিতেছে। দেবরাজ ইন্দ্র মৌখিক বিনয় প্রকাশ করিয়া স-নমস্কার হাস্যে যদিও তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভদ্রগণ আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত?" কিন্তু মনে মনে তিনি বিরক্ত হইলেন এবং বাড়ী ফিরিয়াই 'নোটিস্' জারি করিলেন—

"দেবরাজ ইন্দ্রদেব সকলের মঙ্গলের জন্য স্বর্গের পুরবাসী অতিথিবৃন্দকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাইতেছেন যে তাঁহারা কেহ যেন

নন্দনকাননের মধ্যে বসিয়া বিড়ি না টানেন ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ না করেন। যদি নিতান্তই কেহ বিড়ি-সেবনেচ্ছু হয়েন—তবে তিনি বা তাঁহারা যেন মন্দাকিনীর ওপারে ওই বালুচরে বসিয়া সে কার্য্য করেন।”

উকীলরা এবার মর্ম্মান্তিক চটিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের উপর নয়—চণ্ডীদাসের উপর। তাঁহারা ভাবিলেন এ চণ্ডীদাসেরই কারসাজি। উকীল চটিলে—তা সে যত বেকারই হউক না কেন—মকদ্দমা হওয়া বিচিত্র নয়। সুযোগও মিলিয়া গেল।

রামী রজকিনী মনে মনে জ্বলিতেছিল—সে কোনরূপে চণ্ডীদাসকে জব্দ করিতে পারিলে বাঁচে। এদিকে রাধিকাও শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। ইদানীং কৃষ্ণ মর্ত্ত্যের কাতর আহ্বানে ও গীতার কথা স্মরণ করিয়া মর্ত্ত্যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন। করিলেও কি ভাবে কোথায় করিবেন—‘হরিজন’ হইবেন কি মুসলমান হইবেন তাহাও তাঁহার কাছে এক সমস্যা হইয়া উঠিতেছিল। মোটকথা তিনি রাধার প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারিতেছিলেন না। আরো কারণ ছিল। একে ত সেই দ্বাপর যুগের প্রেমে ভাঁটা পড়িয়াছে—তাহার উপর স্বর্গে আসিয়া আয়ান ঘোষ রাধিকাকে একেবারে চোখে চোখে রাখিয়াছেন! সুতরাং স্বর্গীয় ডিসিপ্লিন্ বজায় রাখার জন্যও শ্রীকৃষ্ণকে ঔদাসীন্যের [illegible]ন করিতেছ হইত। যাই হোক্—রাধার অন্তর পুড়িতেছিল।

ইন্ধন জোগাইলেন উকীলরা। তাঁহারা রামীর নিকট চণ্ডীদাসের হাঁড়ির খবর লইয়া ও রাধাকে উস্কাইয়া মকদ্দমা জুড়িয়া দিলেন। চতুরা রাধা রাজী হইয়া গেলেন এই ভাবিয়া যে এক ঢিলে দুই পাখী মরিবে। আয়ান ঘোষও খুসী হইবে এবং ‘বাঁকা ঠাকুর’ও একটু সোজা হইবেন।

অর্থাৎ এই মকদ্দমায় চণ্ডীদাস হইলেন রামীর লক্ষ্য ও রাধার উপলক্ষ! যাই হোক্ আয়ান ঘোষ স্ত্রীর ইজ্জৎ বাঁচাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। এমন কি তাঁহার সকাতর অনুরোধে রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার পক্ষে উকীল দাঁড়াইতে রাজী হইয়া গেলেন। সুতরাং বিপন্ন চণ্ডীদাসের 'ব্রিফ্'টা সি. আর. দাশ মহাশয়কেই লইতে হইল! দুই মহারথী দুইদিকে দাঁড়াইতেছেন দেখিয়া ইন্দ্র ঘাবড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন—"বঙ্গীয় সাহিত্যে আমি তাদৃশ পারদর্শী নহি। আমি দেবী সরস্বতীর উপর যোগ্য বিচারক নির্ব্বাচনের ভার দিলাম।" নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিচার কার্য্য শেষ হইল।

দেবী সরস্বতী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বিচারক মনোনীত করিয়াছিলেন। তিনি আর্জি পড়িয়াই বলিলেন "এ মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলাম। কৃষ্ণের সহিত রাধিকা যে অনেক লীলা করিয়াছেন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতি তাহার সাক্ষী। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব কবি শাস্ত্রোক্ত সেই কাহিনী কবিতায় অলঙ্কৃত করিয়াছেন মাত্র। 'কেস্' করিতে হইলে শাস্ত্রকারদেরই বিরুদ্ধে করিতে হয়। শ্রীরাধিকা বরং খোর্‌পোষের দাবী করিলে বিবেচনা করিতে পারিতাম।"

সভাভঙ্গ হইল। উকীলেরা তখন আসিয়া চণ্ডীদাসকে উস্কাইতে লাগিলেন—"এইবার তুমি ঠাকুর উল্টে 'কেস্' কর।"

চণ্ডীদাস কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাধিকার দিকে চাহিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

সখি কি মোর করমে লেখি
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি!

পরে রামীর দিকে চাহিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া গাহিলেন—

সই কেমনে ধরিব হিয়া

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়

আমারি আঙিনা দিয়া।

সর্ব্বশেষে উকীলদের প্রতি চাহিয়া গাহিলেন—

সখা হে—

আর, উপদেশ নাহি দিয়ো

কহে চণ্ডীদাস বাশুলি আদেশে

যত খুসী বিড়ি পিয়ো! *

* স্বর্গীয় হোমিওপ্যাথগণ স্বর্গে নাকি হোমিওপ্যাথির গুণ-কীর্ত্তন মাত্র করেন! অশ্বিনীকুমার যুগলের ভয়ে 'প্রাক্‌টিস্‌' করিতে সাহস পান না। সেজন্য মধ্যে মাঝে দেবদূতগণ আসিয়া আমার নিকট সিমটম্‌ বলিয়া লুকাইয়া ঔষধাদি লইয়া যান। বিশেষতঃ অপ্সরাগণের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ মোটেই বরদাস্ত হয় না! কে বলে স্বর্গে রোগ নাই মশাই? এক একটি দেবতার ইয়া ইয়া পিলে আছে শুনিতেছি। কলিকালে সবই হইবে।

সম্প্রতি সেখানে আমার চিকিৎসায় আছেন ঘৃতাচী। তাঁহার নাকি অবিরাম স্তনোচ্ছলতা ঘটিতেছে! আমি বরাবর সিমটম্‌ মিলাইয়া নানারকম ঔষধ দিতেছি—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। কোথাও কিছু নাই—স্তন-দ্বয় তড়াক্‌ তড়াক্‌ উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। হয়রান্‌ হইয়া শেষে আমি স্বর্গীয় আবহাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করাতে দেবদূতের মুখে উক্ত গল্পটি শুনিলাম। স্বর্গের আবহাওয়া বিড়ির ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন! কী সর্ব্বনাশ, এখন বুঝিলাম আমার ঔষধ কেন কাজ করিতেছে না। তাছাড়া আমার এক-একবার মনে হইতেছে ঘৃতাচীর এটি menopauseএর পূর্ব্বলক্ষণ নয় ত? অপ্সরাদের menopause হয় কি?

যাক্‌ সে কথা। 'হোমিওপ্যাথি হিতৈষী'র শশধর সাহা আমার এ লেখাটাও ছাপিল না। মজাটা দেখুন একবার। সাহিত্য-রস কিছু আছে বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় লেখাটা আপনাদের হাতেই দিলাম। তাছাড়া আপনাদের মধ্যে রস-বোধের সিম্‌টম্‌ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমার আগের লেখাটি ছাপিয়াছেন।

শ্রীবৃহন্নলা বসাক এম, ড়ি (হোমিও)

এক-কলম

স্নানের আগে

স্নানের আগে আমি খানিকটা সময় নিজের জন্য পাই—তার উপরে আর কারো দাবি-দাওয়া থাকে না ; এ যেন ঘরের পাশের পোড়ো জমিটা, যাতে না যায় বাঁধা নতুন ভিটা, না যায় করা চাষ ; অগোছালো মনের আগাছা জন্মানো সেই আমার স্নানের আগের সময়। বর্ষার নদীতে গাছের বীজ যে ভেসে যায় না, এমন নয়, কিন্তু সর্ব্বদা তা এরূপ একটা সচলতার উপর থাকে, যাতে শিকড় বসাবার সুযোগ নেই ; এই সময়টাতে অনেক মূল্যবান্ সব কথা মনে আসে, তা লিখে রাখতে পারলে হয়তো সৎ-সাহিত্য-গ্রন্থমালার সংস্করণে স্থান পেতো—মনে আসে, দু'একবার ইতস্তত করে, তারপরে সম্মুখে নদীর স্রোতে ভেসে-যাওয়া খড়-কুটোর মতই কোথায় যায় চলে ! তারাও থাকেনা, আমিও আটকাই না। যে ব্যাধ কখনো পাখী মারে না তার মতই এই আকাশ-নেশা ভাবের দল আমার কাছে আস্‌তে ভ। পায় না।

এই সময়টাতে মানুষের আমার কাছে কোনো আশা নেইয় এ সময়টা যেন সারাদিনের কাজের ফাও, এর স্বতন্ত্র কোনো দর নেই সারাদিনের ওজনেই এর দাম ; মানুষের দৈনিক-জীবনের এই সঙ্কীর্ণ সীমান্ত প্রদেশটিকে কোনো বড় কাজে লাগানো যেতে পারে একথা সচরাচর কেউ ভাবেনি—আমি বহুযুগের পতিত এই জমিটুকুর মালিক : যে জমি কারো চিন্তার লাঙলের ডগায় স্পর্শ করেনি—সেই চিরকুমারী জমির যে কত শক্তি কেবল আমিই জানি।

আমার কয়েকটি স্নানের সঙ্গী আছে ; তাদের সঙ্গে পরিচয় আমার এই সূত্রে ; তাদের বয়স অল্প, বিদ্যা বুদ্ধিও সেই মাপে অথচ তাদের সাথে আমার এমন একটি সহজ সখ্য আছে যার মূল এই পোড়ো জমির সরস মৃত্তিকায়। এ সময়টার যা কথাবার্ত্তা, আলাপ আলোচনা তাতে কোনো গভীর চিন্তাশীলতা বা দূরদর্শিতার ফলাকাঙ্ক্ষা নাই ; তুচ্ছ কথার পুষ্পগুচ্ছ যথেচ্ছা চয়ন করে' হাত থেকে হাতে নিয়ে দেখা শোনা, এবং স্নানশেষে স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে ফিরে আসা লোকালয়ে। প্রতিদিন নদীগর্ভে এই তুচ্ছ কথার বিসর্জ্জন!

আসল কথা আমরা অনেকটা পরিমানে ভব্য হয়েছি—তার মাপ-কাঠি অনেক কিছুই ; কিন্তু পোষাকটাই বোধ হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। আর সব সময় আমরা নানা বস্ত্রে দেহ, নানা অভ্যাসে বুদ্ধি এবং নানা বিদ্যায় মনটাকে আবৃত, জড় ও সংযত করে রাখি, কিন্তু স্নানের আগে খসে পড়ে আমাদের পোষাকের অনাবশ্যক আবরণ, অভ্যস্ত নাগপাশ এবং আয়ত্তবিদ্যার অনাবশ্যক ভারটা! সেই ভব্যতাবর্জ্জিত দেহমনের ভিত্তিতে আমাদের এই সহজজ্ঞানের সখ্য।

অনেক দিন নদীতে জল কম্‌তে সুরু করেছে, ওপারে একটা বড় চর, তারপরে আবার প্রকাণ্ড নদী ; তার জল এপার থেকে সব সময় দেখা যায় না—তবে যখন ভরাভাদ্র—ওপারের জলরেখা রৌদ্রে ঝলমল্ করে' ওঠে তখন দেখা দিতে থাকে। মাঝখানের চরে, জলের ধারে ভিজে খানিকটা বালু জমি, তার পরে এক থাক রবি-শস্যের চাষ; এদের পাকা কোনো ভিত্তি নেই, শরতকালে এদের আবির্ভাব, ভালো করে গরম পড়বার, জল বাড়বার আগেই এরা উদ্ভিদ লীলা সম্বরণ করে। তারপরে আবার একখণ্ড শাদা বালুর নিরর্থক জমি, এই পর্য্যন্ত খুব বর্ষা হলে জল ওঠে। এই বালুর জমিটাকে জল আর

স্থলের সীমানা বলা চলে, একদিকে এর জলের রেখা, উপরে এর চিরন্তন মাটির শ্যাম-অবতার, মাঝখানে এই উপেক্ষিত, বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো, লক্ষ্মীছাড়া অনুর্ব্বরতাটি—এ যেন আমার স্নানের আগের সময়টুকু, যার কাছে কারো কিছু আকাঙ্ক্ষার নেই। কেবল দুপুর বেলা দোতালা থেকে দেখতে পাই, নদীর স্রোত ঝিমিয়ে এসেছে, খেয়া-নৌকা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত, গুন টেনে নিয়ে যে মাল্লারা সম্মুখ দিকে একটু ঝুঁকে ভাঙা পার বেয়ে চল্‌তেই থাকে, তারা গুন গুটিয়ে নিচ্ছে; আর ওপারের গ্রামখানা রৌদ্রের নেশায় একেবারে মিলিয়ে এসেছে—এমন সময় মাঝখানকার ওই নিঃসম্বল উদাস জমিটার উপরে মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত হু হু শব্দে এক রাশ বালু উড়ে চলেছে।

শ্রীঅমিত রায়

চলচ্ছবি

(শ্রীঅক্রুব)

তিন—শ্যামলিমা

বিকেলবেলা সমীরণের আর বাড়ীতে বসে থাক্‌তে ভালো লাগ্‌লো না। বেরিয়ে পড়লো সে নদীর ধারে বেড়াতে। হাতে ব্রাউনিং, চোখে আধো আধো উদাস ভাব, মুখে গুনগুনানি, পায়ে স্লিপার্। নদীর দিকে যেতেই পথে পড়্‌লো (এরকম প্রায়ই পড়ে) শ্যামলিমার বাড়ী। সমীরণ প্রতিজ্ঞা করে ফেললো ওপরে দোতলার বারাণ্ডার দিকে

সে কিছুতেই তাকাবে না, কিন্তু চোখ দুটো হঠাৎ এক ফাঁকে ওপর দিকেই বারাণ্ডার পানে চেয়ে ফেল্‌লো। দাঁড়িয়ে ছিলো শ্যামলিমা। মুখে তার হাসি— হাসিটা তার একটা যেন বদ্‌ অভ্যাস, কিছুতেই সে ছাড়তে পারে না। হেসে বল্‌লো "এই যে সমীরণবাবু। আপনার জন্যেই এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম। আসুন ওপরে।" সমীরণ বল্‌তে চাইলো যে এখন সে যাচ্ছে নদীর ধারে বেড়াতে, কাজেই ওপরে সে যেতে পার্‌বে না—কিন্তু পা দুটো বিনা দ্বিধায় চল্‌লো তাকে ওপরের দিকেই নিয়ে, মনটাও বলে উঠলো "নদীর ধারে লোকের যা ভিড়, তার চেয়ে শ্যামলিমার এখানে থাকা ঢের ভালো।"

ওপরে উঠেই সমীরণ ঢুকে পড়লো ঘরে। শ্যামলিমার বাবা অসীমবাবু ছিলেন আরাম-কেদারায় আরামে গা হেলিয়ে—শ্যামলিমা ছিলো তারি পাশে দাঁড়িয়ে সমীরণের অপেক্ষায়। অসীমবাবুর নিমীলিত নেত্র দুটী সমীরণের পায়ের শব্দে খুলে যেতেই হঠাৎ অসীমবাবুর খেয়াল হল সাড়ে পাঁচটাতে তাঁর এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে অবশ্য যাওয়ার কথা আছে। হাতের রিষ্ট ওয়াচটা দেখেই চট্‌ করে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি রাগ করে বল্লেন "ঘুমিয়েই পড়েছিলুম আর কি! তুই তো আমায় মনে করিয়ে দিতে পার্‌তিস্‌, শ্যামলী, যে আমার একটা engagement আছে সাড়ে পাঁচটাতে?"

"বাঃ রে! আমি কি জানি নাকি? তুমি কি আমায় বলেছিলে?" হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লো শ্যামলিমা।

"তাই তো মা, তাইতো! তোকে তো বলিনি, তুই জান্‌বি কি করে! যাক্‌, সমীর বাবাজী ঠিক সময় এসে এলার্ম-ঘড়ির মতো আমার ভ্রান্তি ভেঙে দিয়েচো। কথাটা রাখতে পার্‌বো। কিন্তু তোমার সঙ্গে একটু কথা কইবার সময় আর পেলাম না বাবাজী।" বল্‌তে

বল্‌তে জুতো পায়ে দিয়ে অসীমবাবু নেমে গেলেন। সমীরণ বসে পড়লো একটা চেয়ারে, শ্যামলিমা বসে পড়লো আরাম-কেদারাটার ওপরে।

শ্যামলিমা বল্‌লো "কবিকে আজ একটা সার্‌প্রাইজ্‌ দেবো। তাতে কবির কোনো আপত্তি আছে?"

সমীরণ হেসে বল্‌লো "সার্‌প্রাইজ্‌টা কি রকমের হবে বলুন তো!"

"বা রে! তা যদি আগেই বলে দিলাম তা হ'লে আর সার্‌প্রাইজ্‌ হবে কি? খুব বুদ্ধি যা হোক্‌! সাধে কি আর কবি বলি?"

শ্যামলিমার হাসির স্রোত আর যেন থামতে চায় না।

সমীরণ প্রশ্ন করে "কেন, কবিদের বুদ্ধি নেই নাকি?"

শ্যামলিমা বল্‌লো "ও জিনিষটা কবিদের মাথায় একটু কম থাকে। এটা অবশ্য ঠাট্টার কোনো কারণ নয়—এটা স্বাভাবিক।...যাক্‌, আসল কথাটা এবারে বলি। তোমাকে আমার ভারী ভালো লাগে—বুঝেছো সমীর? তাই 'বাবু' আর 'আপনি' কথা দুটোকে আজ আন্দামানে পাঠিয়ে দিলুম। তুমিও আমায় আর 'আপনি' বল্‌তে পাবে না। শ্যামলী বলেই আমায় ডাক্‌বে। যাকে এত ভালো লাগে তাকে সম্মানের ধাক্কায় দূরে সরিয়ে দিতে আমার ভালো লাগে না।"

সমীরণ একটু চম্‌কে গেল। শ্যামলিমা তাকে বেশ সার্‌প্রাইজ্‌ই দিয়েছে বটে। খানিক বাদে সে একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লো "বেশ। তাই হবে শ্যামলী। আমিও এতদিন ধরে ভেবেছি এই কথাই। আমিও তাহলে বলি—তোমাকে আমার সবার চেয়ে ভালো লাগে, শ্যামলী।"

শ্যামলিমার চোখ দুটো একটু যেন ছলছলিয়ে উঠ্‌লো। তার

পরেই একটু হেসে বল্‌লো "কিন্তু এমন দিনও আস্‌তে পারে যেদিন আমাকেই সবার চেয়ে খারাপ লাগবে।"

সমীরণ জোর গলায় বল্‌লো "কখ্‌খনো না। এ হতেই পারে না শ্যামলী।"

"আমারো সেই বিশ্বাস।" শ্যামলিমা বল্লো।

তারপর খানিকক্ষণ দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল শান্ত নীরবতা।

সমীরণের মনে হতে লাগলো 'তুমি' কথাটার মতো মিষ্টি কথা আর দুনিয়াতে নেই।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর উপস্থিত হলেন এক মোটা ভদ্রলোক। গায়ের রং তাঁর কয়লার মতো অতো বেশী কালো নয়। গোঁফগুলো তাঁর বড় বড়—নাক দুটোকে নিঃশ্বাস নিতে তারা যেন প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। চেহারা দেখে হাসি চাপা একটু শক্ত। শ্যামলিমার প্রশ্ন হল "এই যে মেসো, এসো এসো। কি খবর আন্‌লে বলো তো?"

ওধারের তক্তপোষে বসে মেসো বল্‌লেন "খবর কিছুই আনি নি রে এখনো। তবে আন্‌বো যে নিশ্চয় সেটা ঠিক্। এঁকে তো চিন্‌তে পার্‌লুম না।"

"ইনি একজন বন্ধু। এঁর কাছে নিঃসঙ্কোচে তুমি যা কিছু সব বলতে পারো। ইনি শুনলেও—"

"ক্ষতি নেই? তা' বেশ বেশ। হ্যাঁ, কি বলছিলুম? তোর মেসো পাত্তর জোগাড় করবেই করবে। পাত্রকে আসতেই হবে—the pot must come! আমি একবার লাগলে—হুঁহুঁ! অপাত্রে তোকে আমি দিতে দেবো না রে, কিছুতেই না। শাস্তোরেই যে লিখেচে অপাত্রে দান করবে না কথনো।' কেমন মশাই?"

সমীরণ হাসি চেপে বলে "নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

"শাস্তোর যারা লিখেচে তারা অনেক ভেবে চিন্তে লিখেচে মশাই। শাস্তোর না মানলে কতো যে ভুগতে হয় তা অনেকে ঠেকেও যে শেখে না এই দুঃখু রয়ে গেল আমার মনে। আমি কিন্তু শাস্তোরের ইয়ে ছাড়া এক পাও—তুই হাস্‌ছিস্ কি শ্যামলী? এ হাস্‌বার কথা নয় রে পাগলী। আমাদের পাড়ায় থাকৃতো নটবর মিত্তির বুঝলেন মশাই—মোটেই সে শাস্তোর মানতো না। একদিন দিল্লী মেলে চাপলো কি একটা যাস্‌সেতাই দিনে, শাস্তোরের বারণ না মেনে। আর যাবি কোথা? তার মাস দুয়েক পরেই নেমুনিয়া, তাতেই—ব্যাস্!"

শ্যামলিমা হেসে বললো "মেসোর মুখে এ কাহিনী শুনলে লোকে ভয় পেয়ে শাস্তোর মানতে স্থরু করে দেবে।"

মেসোর মুখ খুসীর হাসিতে ভরে উঠলো। বল্লেন "তা আর করে কই রে? তা হলে আর এমন করে কি প্রাণ হারাতে হয়?······ অনেকে আবার শাস্তোরকে এক রকম ঠাট্টাই করে। এক কলেজের ছোক্‌রা একদিন আমায় বলে স্থপুরিষ্টিশাস্, বলে আমি নেহাৎ মুখ্‌খু ব'লেই অমন শাস্তোরের ভক্ত। আমার রাগ হয়ে গেল। ছোঁড়া চলে গেলে পর আচ্ছা করে কড়া কথা শুনিয়ে দিলুম, বললুম তুই আমার পায়ের একটা প্রচণ্ড লাথি খাবি—ইউ উইল্ ঈট্ এ বিগ্ কিক্ অব মাই লেগ।······"

শ্যামলিমা আর সমীরণ দুজনেই মৃদু হাসে।

মেসো বল্‌লেন "তোর বাবা নেই রে শ্যামলী বাড়ীতে? নেই? তা হলে আজ আর তার সঙ্গে কথা কওয়া হলো না। কাল্‌কে ভোরে বরং আসবো। ভালো কথা—এক কাপ চা খাওয়াবি শ্যামলী?

শাস্তোরে চা খেতে নিষেধ করে নি। তোর মাসী যে চা করে তার চিরেতার জল খাওয়া ভালো।"

"তাহলে এখানে চা খেয়ে যেয়ো এখন থেকে। কেমন? অবশ্য যদি এতদূরে শুধু চায়ের লোভে আসতে পারো।" শ্যামলিমা চলে গেল। তারপরে যখন সে ফিরে এলো তখন তার হাতে একটা বড় ট্রের ওপর তিন পেয়ালা চা, আর তার সঙ্গে প্লেটে যা ছিলো তা দেখে মেসোর এক একটা সেকেণ্ডকে এক এক ঘণ্টা বলে মনে হতে লাগলো। শ্যামলিমার ইসারামাত্রেই তিনি একটি কাপ আর একটি প্লেট নিয়ে খাওয়ায় মেতে গেলেন, এবং অন্য প্লেটটার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। শ্যামলিমা আর এক কাপ চা এবং খাবার দুটোই মেসোর দিকে ঠেলে দিয়ে বাকী কাপটা আর প্লেটটা সমীরণের পাশে রাখল।

"এসব কি আমার জন্যে নাকি?" সমীরণের প্রশ্ন।

শ্যামলিমার জবাব "তবে কি আমার জন্যে? তাহলে আর তোমার সামনে রাখবো কেন?

"আমি বিকেলে চা টা খেয়েই বেরিয়েছি—এখন আবার···"

"তাই বলে এসব খেলেই তুমি মারা পড়বে এত অপদার্থ তুমি নও সমীর।"

"আচ্ছা, বেশ তো আমি যাচ্ছি। তুমি?"

"আমার জন্যে ভেবে তোমার দরকার নেই। আমার হয়ে গ্যাছে।"

সমীরণের দেরী আর ইতস্ততঃ ভাব দেখে মেসো বল্লেন "আপনি খাবেন্ না নাকি?" তারপর সমীরণের কাপ আর প্লেটের দিকে চেয়ে "আপনি যদি না খান্ তাহলে বরং—না না, খান্ খান্, খাবেন না কেন? একবার খেয়ে বেরোলে পর আবার খেতে শাস্তোরের কোনো

নিষেধ নেই।” খাওয়ার পালা সাঙ্গ হলে মেসো বিদায় নিলেন—বলে গেলেন কাল ভোরে আস্‌বেন অসীমবাবুর সঙ্গে কথা কইবার জন্য।

সমীরণ কিছু বল্‌বার আগেই শ্যামলিমা হাসিমুখে বল্‌লো “আমার এই মেসোটী এক রকমের পাগল। আমার বিয়ের জন্য এঁর ভাবনা ধরে গেছে। বাবাকেও একরকম জ্বালাতন করে তুলেছেন। ইনি বলেন বাবাকে—ভায়া তো দুদিন বাদে মরবে, তখন মেয়েটার কি গতি হবে? তাই বলি বিয়েটা দিয়ে দাও। বাবা কি জবাব দিলেন জানো সমীর?”

“কি জবাব দিলেন?”

“সে ভারী মজার জবাব। বল্লেন—আগে মরেই নিই, তারপর দেখা যাবে এখন।”

সমীরণ আর শ্যামলিমা দুজনেই হাস্‌তে লাগলো—কিন্তু সমীরণের হাসিতে যেন কি একটা ব্যথা লুকিয়েছিলো শ্যামলিমা সেটা বেশ বুঝতে পার্‌লো।

“আচ্ছা শ্যামলী, তোমার বয়স কত হবে বল তো!” বলেই সমীরণের যেন একটু লজ্জা কর্‌তে লাগলো। তাদের মাঝখানে যে একটা ব্যবধান ছিল সেটা সবেমাত্র আজ ভেঙে দিয়েছে শ্যামলিমা। সমীরণের মনে হলো আজই শ্যামলিমাকে এরকম প্রশ্ন করা হয় তো ভালো হয় নি।

শ্যামলিমা জবাব দিলো “কুড়িতে পা দিয়েছি মাত্র। বয়স আর এমন কি বেশী হয়েছে? কি বলো?”

“বেশী আর কি? আমার তো চব্বিশ হয়ে গেছে, কিন্তু আমার বিয়ের কথাও এখনো ওঠে নি।”

শ্যামলিমা সমীরণের কথা শুনে হেসে ফেল্লো। মেয়েদের যে

ছেলেদের চাইতে অল্প বয়সে বিয়ে হওয়াই দস্তুর এ কথা বুঝি মশায়ের জানা নেই ?" সমীরণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লো "ওঃ, তাইতো !"

শ্যামলিমা বল্‌লো "তা মেসো কথাটা একরকম মন্দ বলে নি। কি বলো ?"

সমীরণ অনেক ভেবেও কি বলা উচিত বুঝতে না পেরে শেষকালে বলে ফেল্‌লো "হ্যাঁ। একরকম মন্দ নয়।...আচ্ছা, অসীমবাবুর কি ইচ্ছা ?"

"বাবার ইচ্ছা ? তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছু নেই। আমার বিয়ে হওয়া না হওয়া শুধু আমার খেয়ালের ওপর নির্ভর কর্‌ছে। আমি কিন্তু এবিষয়ে ভালো করে ভাবিও নি কোনো কালে। আমার মত এই যে বিয়ে যে সব মেয়েকেই কর্‌তে হবে, না কর্‌লেই নয়—তা নয়। এবিষয়ে তোমার কি মত সমীর ?"

শ্যামলিমার কথা সম্পূর্ণ সরল, সহজ—কোথাও একটু জড়তা বা কুণ্ঠার লেশমাত্র নেই। সমীরণ চেষ্টা কর্‌লো তার নিজের মনেও তেম্নি সহজ ভাব এনে সহজ কুণ্ঠাহীন ভাবে কথা কইতে। কিন্তু তবু যেন তার মনের আধ-সলজ্জভাবটা গেল না ! অনেক কষ্টে সে বল্‌লো "বিয়ে যে সবাইকেই কর্‌তে হবে এ কথা আমিও অবশ্য মানি না। কিন্তু কথটা একটু অপ্রিয় হলেও বলি—তোমার বাবা তো আর অমর নন। তাঁর মৃত্যুর পর তুমি কি নিয়ে থাক্‌বে সেটা ভাবো নি কি তুমি ? অবশ্য ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্ গোছের কিছু-একটা হতে চাও তো আলাদা কথা। কিন্তু বিয়ে কর্‌লেও অন্ততঃ তিন-পোয়া বা আধ নাইটিঙ্গেল্ হওয়া যায় এও ঠিক।"

শ্যামলিমা সমীরণের দিকে চেয়ে শুধু মৃদু হাস্‌তে লাগলো। সমীরণ

বুঝতে পার্‌লো না এ হাসি অম্‌নি হাসি না কোনোরকম অর্থপূর্ণ হাসি। সে শুধু তার ব্রাউনিংকে নাড়তে লাগলো।

নীচে আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল—এবার এলেন অসীমবাবু। বল্‌তে বল্‌তে এলেন "মস্ত ভুল হয়ে গেছে রে শ্যাম্‌লী। আমার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্‌ ছিল বুধবার, আজ যে মঙ্গলবার সে খেয়ালই আমার ছিলো না। যাক্‌, ট্যাক্সীওয়ালাটা তবু কিছু পয়সা কামালো। দুদিন যাবৎ তো ঐখানটায় ঠায় দাঁড়িয়েই থাক্‌তো ভাড়া না পেয়ে।...হ্যাঁ, তোর মেসোর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো মা—আমায় দেখেই বলে—ভায়া, একটা পাত্র যোগাড় করেছি পাঁচ মিনিট আগে; এ পাত্র যদি হাতছাড়া হয়, if such a pot becomes handless, তাহলে আর আফ্‌শোষের সীমা থাক্‌বে না—এম্নি আধ-ইংরিজী আধ-বাংলায় কত কি। আমি বলে দিলুম পাত্রের যোগাড়ের জন্য তাকে ভাবতে হবে না—সে আমার ঠিকই আছে। তবু কি সে যেতে চায়? জ্বালাতন আর কি!...সমীরণ, বোসো বাবা, বোসো। আমি এই চেয়ারটাতে বস্‌ছি।" তারপর সমীরণের হাতের বইখানা দেখে "ব্রাউনিংকে বুঝি খুব পছন্দ করো, সমীর? বেশ—আমিও তাই। ওর Prospice কবিতাখানা আমার সব চেয়ে ভালো লাগে। সমীরণের কোন্‌টা ভালো লাগে?"

সমীরণ বল্‌লো "সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওঁর অনেক-গুলো কবিতাই এত চমৎকার যে—"

শ্যামলিমা বল্‌লো "Love Among the Ruins কবিতাটিই আমার সবার চাইতে ভালো লাগে। সত্যি, ভালোবাসার মতো এমন সুন্দর জিনিস আর নেই—কি বলো সমীর? বাবা, আজ থেকে

এঁকে আমি বাবু আর আপনি বলা ছেড়ে দিয়েছি ; ওরকম পর করে রাখতে আমার আর ভাল লাগলো না।"

অসীমবাবু শেষের অংশটা শুন্‌তে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। বল্‌লেন "ঠিক বলেছিস্ শ্যামলী। মানুষ ভালোবাসার অভাবে বাঁচতে পারে না। সে ভালোবাসাও চায়, ভালোবাস্‌তেও চায়। Man is a loving animal বল্‌লে মানুষের একটা ভালো ডেফিনিশান্ হয়"

শ্যামলিমার মার টাঙানো ছবিটার পানে তাকিয়ে তাঁর দুচোখ ছলছল করে উঠলো। অতীতের কত মধুর স্মৃতি ভেসে এলো তাঁর মনে। (ক্রমশঃ)

যুগ-নৃত্য

(১)

তাড়ি পানে মত্ত
অক্ষয় দত্ত,
পরনের বস্ত্রটি মস্তকে বান্ধি,
বলে, "ওগো ঠান্‌দি,—

"Come along চট্‌পট,
কিছুতেই delay not,
এস এস চলে এস, চাও যদি মোক্ষ
ছেড়ে এস কক্ষ।

"দেখ অকৃত্রিম
সব বস্তুর ক্রীম
আধুনিক বস্তুর রূপ কত শুদ্ধ
অবতার বুদ্ধ।

"'পূজ' কোন্ লিঙ্গে ?
হিমালয় শৃঙ্গে
কোন্ শিব মেতেছিল sexএর চর্চ্চায়
স্রেফ বিনি খর্চ্চায় !

"সেই শিব নাই আর,
নাই কোনো দাম তার,
আমি নব অবতার আধুনিক ভারতে,
চিৎপুরী আড়তে।

"দেখ মোর বস্তু
কর, জয় অস্তু
বল, মাৎ কর নাৎ শুধু এক বলেতে
কাজ নাই দলেতে।"

(২)

এই বলি অক্ষয়
করে শুধু "জয় জয়
জয় উন্মুক্তের জয় খোলো solidএর,
Life যা holidayর।

"চল্ চল্ ঠান্‌দি,
চল্ আজি প্রাণ দি,
Martyr হই আজ সত্যের বেদীতে,
মদ্দা ও মেদীতে।"

ভেজে বৃদ্ধার মন,
বলে, ভাই "ওরে শোন,
এখন কি আছে দিন,—পথেঘাটে বেরুতে
Follow করে ফেরুতে?"

গর্জ্জায় অক্ষয়—
"নাই ভয় নাই ভয়,
আমরা মানি না কিছু তরুণী কি বৃদ্ধা.
নিঃস্বা সমৃদ্ধা।

"Feminine শুধু চাই,
মানবী অথবা গাই,
কুকুরী বিড়ালী গাধী ব্যাঘ্রী বা সিংহী,
বাচ্ছা বা ধিঙ্গী।

"ভীড় ক'রে এস সব,
পথে কর কলরব,
এর বেশি আর কিছু হবে না কো করিতে,
পড়িতে বা মরিতে।

"কিস্তি কিস্তি
কর মুখ খিস্তি,

আমার মডেল্‌-এ সবে হও শুধু ন্যাংটা,
গ'ড়ে তোলো gang টা।

ভারতের উদ্ধার—
কিছু নাহি লাগে আর।
লাগে শুধু ছাগপনা সর্ব্বদা জোরসে—
শুধু brute force এ।"

(৩)

পথে আজ বড় ভীড়
হৈ হৈ অস্থির,
চারিদিকে ছুটিয়াছে শিশু যুবা বৃদ্ধ,
—লাগিল কি যুদ্ধ ?

একদিকে পুলিসে,
চালাইছে গুলি সে,
একদিকে হইতেছে পুষ্পের বৃষ্টি,
একি অনাসৃষ্টি !

গুলি খেয়ে দলে দলে,
যত লোক পড়ে ঢলে,
তার মাঝে দেখা যায় ঠান্‌দি ও অক্ষয়,
নাচিতেছে নির্ভয়।

উলঙ্গ-নৃত্য
যুগের কৃতিত্ব !

পণ্ডিতে বুঝে না যা বুঝিবে কি পুলিসে—
আইনের cooly সে !

(৪)

হল prosecution,
যাক প্রাণ, থাক মান !
বিচারেতে উভয়েই বাঁধা প'ল জেলেতে,
আইনের খেলেতে।

দুবছর ছয় মাস
দমদমে করি বাস,
মুক্ত হইল যবে অক্ষয়-ঠান্‌দি—
ঠোঁটে "জয় গান্ধী।"

অথচ কি বিস্ময় !
প্রচারিল অক্ষয়—
"যারা সব দেখেছিল উলঙ্গ নৃত্য
মনিব বা ভৃত্য,—

সব্বার নামেতে
Separate খামেতে
উকিলের চিঠি দিবে libel দাবীতে
No time ভাবিতে।

"কেন তারা নাচেতে,
বর্ব্বর ধাঁচেতে,

গড়াগড়ি দিয়েছিল হিহি হিহি হাসিয়া
দলে দলে আসিয়া ?”

এই বলি, দত্ত,
ষত্ব ণত্ব
জ্ঞানহারা ঐ ছোটে উকিলের বাড়িতে,
ভাঙা এক গাড়িতে।

(৫)

যুক্তিটি খুবি ঠিক,
ভাব যদি সব দিক,
তবু আজ গালে হাত বসে আছে অক্ষয়।
—মেনেছে সে পরাজয়।

ঠান্‌দি কোথায় আজ ?
ছেড়ে নাকি সব লাজ
বাড়িউলি হয়েছেন কোন্ এক গলিতে।
—ব্যথা পাই বলিতে।

শ্রীসার্ব্বিক শর্ম্মা বার-অ্যাট-ল (হেডপণ্ডিত)

চলচ্চিত্র

মেবার পাহাড় সিরীজ—এক
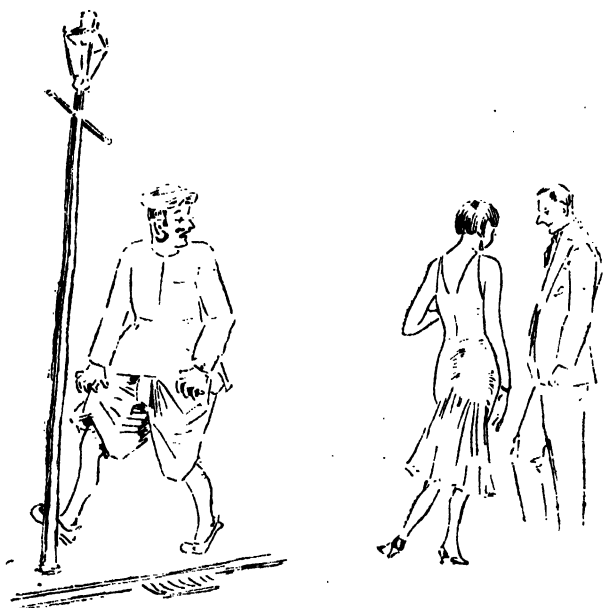
The Marwari in search of his—

মেবার পাহাড় সিরীজ—দুই
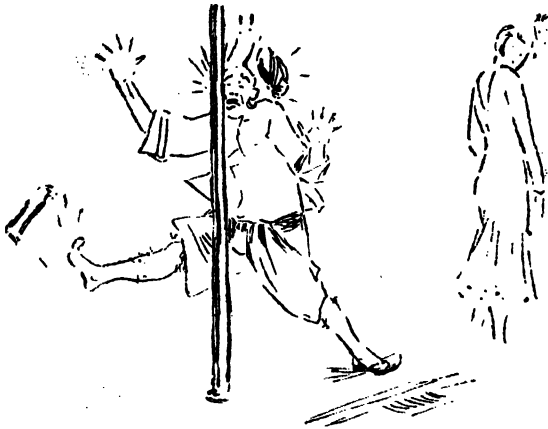
—whose mortal taste—

ব্যাঙের ব্যঙ্গ—ঈসপ

রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশরী'র প্রতিবাদ

শ্রীকান্ত—শেষ পর্ব্ব

"বাকী আমি রাখ্‌বনা কিছুই !"—

টাক-নাশক-টনিক কোম্পানি লিমিটেড

—ডিভিডেণ্ড মাত্র ২০০ পার সেণ্ট!

যশোমাল্য
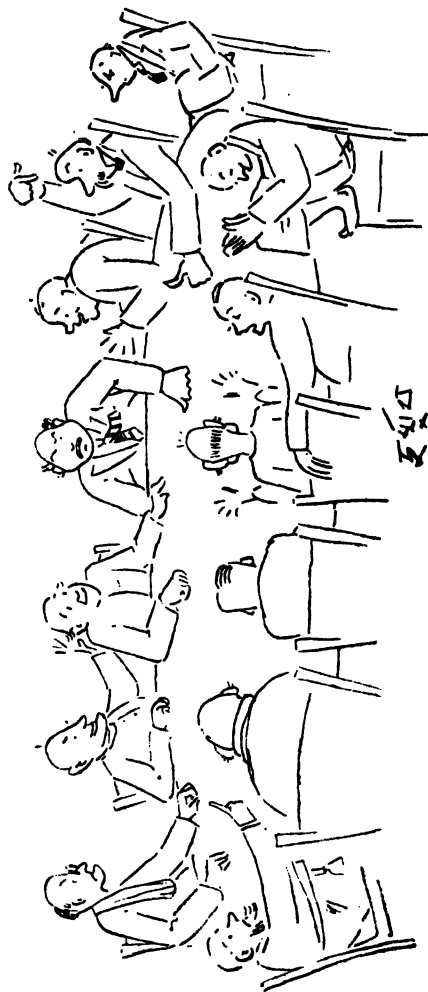
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অবোধের এই কথায় বেশ কাজ হল, মিইয়ে পড়া বন্ধু ক'জন, এই অব্যর্থ টনিক খেয়ে, দেখতে দেখতে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। আবার বুকভরা আশা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা সেই মহীয়সী মহিলার প্রতীক্ষা করতে লাগল। অবোধের কিন্তু ক'দিন কেন জানিনা দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই যে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিল তারপর পাঁচ ছ দিন হল তার কোন খোঁজ নেই। অবশেষে অধীর হয়ে উঠে বন্ধুর দল তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। অবোধ তখন বাইরের ঘরে বসে নিবিষ্টচিত্তে তার একখানা বইয়ের প্রুফ দেখছিল, এই বইখানিতে চরিত্রহীন নরনারী ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা মাথান সজীব চরিত্রগুলি তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রুফ দেখতে দেখতে বইখানার আজকালকার বাজারে কি রকম কাটতি হবে ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল। ঠিক এমনি সময়েই তার স্বপ্ন ভঙ্গ করে বন্ধুর দল ঝড়ের মত ঘরে এসে ঢুকল।

চিন্তাহরণ সজোরে তার হাত দুটো ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল,—"কিহে অমৃতের আশ্বাস দিয়ে এরই মধ্যে লুকিয়ে পড়লে কেন? বলি মতলব খানা কি বল দেখি?"

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে অবোধ বলে উঠল, "তারই তো জোগাড় করছিলাম, রোসো রোসো—একটা ঘরের মেয়ে বাইরে আনা কি সোজা কথা? যদিও তার হৃদয়টা খুবই উচ্চ, এই যা একটু আশার কথা—

কিন্তু তাঁর স্বামী ব্যাটা যে আবার উকীল কিনা—আইনের প্যাঁচে না পড়তে হয়! এই উপন্যাসখানা যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করে তাঁকে এক কপি উপহার দেব, তাঁর মন একেই নরম হয়ে আছে, আর তার উপর এর এক কপি উপহার দিলে আর ঘরে থাকতে হবে না! মনের প্রসার তাঁর আরো বেড়েই যাবে। কিন্তু তোমরা যে আর অপেক্ষাই করতে পারছ না!”—বলে নতমুখে সে আবার তার বইয়ের ভিতর গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে।

পরমেশ তার সরু গোঁফে তা দিতে দিতে বলে উঠল “সরি! কিন্তু কে আর জানে বল, যে তুমি আমাদের জন্যই এমন উঠে পড়ে লেগেছ!” বলে চোখ মিটকে মিটকে বিশ্রী ভাবে হাসতে লাগল।

চৈতন্য ম্লানভাবে বললে,—“কিন্তু যাই বল, সধবা মেয়ের সঙ্গে প্রেম জমেনা—কে বাবা যাবে সাপের গর্ত্তে খোঁচা দিয়ে ডুয়েল লড়তে?”

অবোধ ভীম গর্জ্জনে বলে উঠল, “সেটুকুও পারবে না? তাহলে প্রেম করবে কি করে? ভীরু দুর্ব্বল কখনও প্রেমিক হতে পারে না।”

চৈতন্য অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “না না—আমিও তাই বলছি বন্ধু। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন, আমারও ঐ মূলমন্ত্র!”

“রাইট!” বলে সজোরে তার পিঠ ঠুকে দিয়ে অবোধ আবার বললে “আচ্ছা একটু বোস তাহলে। আমি এখনই খাতাখানা রেখে আসছি।”

চিন্তাহরণ চীৎকার করে বলে উঠল,—“শীগ্‌গির চা আর চিনে বাদাম ভাজা পাঠিয়ে দাও ত হে, বড্ডই মিইয়ে গেছি।”

যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে অবোধ বলে গেল, “আচ্ছা।”

প্রেমবল্লভ একখানা হাতলভাঙ্গা চেয়ারে গুছিয়ে বসে বললে, "আঃ বাঁচালে চিন্তাহরণ, কিন্তু প্রেম চাঁড়ালটা আর আসে না কেন বলতে পার ?" এই সময়ে বলে রাখা ভাল, প্রেম চাঁড়াল, অর্থাৎ প্রেমচারা তাদেরই একজন বন্ধুরত্ন, প্রেমে পড়লে সে চণ্ডালের মতই দুর্দ্দমনীয় হয়ে ওঠে ব'লে, বন্ধু মহলে তার ঐ নামই রটেছিল।

চিন্তাহরণ বক্রভাবে হেসে বললে, "সে যে তার 'দুটোরাত' বইটার 'কপিরাইট' বিক্রী করতে কলকাতা গেছে, কিন্তু গেছেও ত অনেক দিন হে—আমিও তাই ভাবছি।"

বিশ্রী রকম হেসে উঠে চৈতন্য বললে "অভাব নেই বলেই দেখা নেই, তার উপন্যাস খানা পড়েছ তো ? ওটাতো ওরই জীবন-চরিত। শ্রীকান্ত-টাইপেরই লিখতে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুই ফোটেনি এই যা।" বলে গভীর অবজ্ঞাভরে হাসলে।

নীরজা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল "তা বলে তোমরা যেন ভেবনা, 'কনে-বরণ' গল্পটা আমার জীবন-চরিত ! ওটা আমার অভিজ্ঞতা প্রসূত হতে পারে, কিন্তু আমার জীবনী নয় !"

পরমেশ তার সরু গোঁফে তা দিয়ে বলে উঠল. "কিন্তু লোকে ত বিশ্বাস করে ! যাক্ লোকে আর কিনা বলে ? আমারই ছোটবড় গল্পটা বার হবামাত্রই লোকে সন্দেহ করে বসল যে, আমিই এক নীচ জাতীয়া দাসী নিয়ে ঘর কন্না করছি ! আমার আবার একটা মেয়ে পর্য্যন্ত আছে !" বলে সে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

নীরজা নির্জ্জীবের মত এলিয়ে পড়ে বললে, "লোকে তাই বলে নাকি ?"

"তা না ত, কি ? লোকে কি আমাদের শুকদেব বলে মনে করবে ?" বলে টেবিলের উপর চড়ে বসে দুখানা মোটা বই বাজাতে বাজাতে

পরমেশ আবার বললে "যাক্ তাতে নেতিয়ে পড়ছ কেন নীরজা, একি আর অসম্মান ? এযে আমাদের জয়মাল্য !"

চৈতন্য নাকিস্বরে সাজাহান 'কোট' করে বললে "এযে আমার জয়মাল্য পিয়ারা—"

প্রেমবল্লভ চুমকুড়ি দিয়ে বলে উঠল "আহা তাই বটে নাথ! প্রাণেশ্বর।"

ঘরখানা অট্টহাসির রোলে কেঁপে উঠল। ভিতরের দরজা ঠেলে অবোধ অপ্রসন্ন মুখে বেরিয়ে এল। তারপর বিরক্তস্বরে বললে— "আঃ তোমরা অত চেঁচিওনা হে, ঘরের ভিতর কাকীমা বড্ডই চটে উঠেছেন, হয়তো তোমাদের চা আর চিনেবাদাম ভাজা আসবেই না!"

"বল কিহে ? তুমি যে আমাদের বিশ বাঁও জলে ফেলে দিলে!" বলে চিন্তাহরণ করুণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

অবোধ ভ্রূকুটী করে বললে, "চুপ করো। একটু পরে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন, যদিও বলছিলেন দেবেন না। দিতে বাধ্য হবেন, আমি তোমাদের হয়ে অনেক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে এসেছি!"

"সাধু সাধু!" আবার ঘরখানা মুখর হয়ে উঠল। শুধু একপাশ থেকে সদ্য রোগমুক্ত নীরজা ক্ষীণস্বরে বলে উঠল "এটা কিন্তু উচিত হলনা অবোধ!"

গভীর অবজ্ঞাভরে অবোধ বললে,—"য্যাজ্ঞে গুরুজী! আপনার আদেশমাত্রই এইবার শিরোধার্য্য করব! কিন্তু চা টা এসে পড়েছে এইবার সদ্গতি করা যাক। কি বল ? এতে সম্ভব তোমার আপত্তি নেই!"

চায়ের নামে মধুলুব্ধ ভ্রমরের মতই সকলে টেবিলের ধারে এসে বসল।

পরমেশ হেসে এক মুঠো চীনেবাদাম মুখে ফেলে দিয়ে বললে—"যা হোক তোমার কাকীমা যে তোমার ভয়েই পাঠিয়ে দিলেন এও ঢের! মেয়েদের মধ্যে মধ্যে শাসন করা ভাল, তাতে তারা বশে থাকে।"

চৈতন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,—"কিন্তু সব মেয়েই সমান নয়।"

চিন্তাহরণ তার ঝিনুকের মত ঝক্ ঝকে দাঁত বের করে বললে "হ্যাঁ তা বটে, তোমার জীবনে যে একটা মস্ত বড় ট্র্যাজেডি আছে, তা আমারা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

চৈতন্য লজ্জিত ভাবে চায়ের বাটীতে চুমুক দিয়ে বললে,—"না—না আমার জীবনে ট্র্যাজেডি বিশেষ কিছুই নেই।"

অবোধের চা খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল, পকেট থেকে সিল্কের সুগন্ধযুক্ত রুমাল বার করে আলতোভাবে মুখ মুছে সে বললে "এইবার কমেডিই হবে! তাঁর স্বামীটা ঢাকায় একটা 'কেস্' নিয়ে এসেছে, তিনি এই খানেই আছেন বন্ধু!"

সকলে সমস্বরে আনন্দধ্বনি করে উঠল।

চিন্তাহরণ উৎসুক ভাবে বললে, "কিন্তু সেকথা এতক্ষণ জানাওনি কেন অবোধ?"

অবোধ মুচকে হেসে বললে,—"আনন্দের বেগ সহসা সম্বরণ করতে পারবে না, তাই জানাইনি, যাক্ এইবার সচক্ষেই তাঁকে দেখবে। কাল সকাল নটার সময় তোমরা এখানে এসো—আমি তোমাদের নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

পরমেশ তাল ঠুকে বললে—"বাহবা! কিন্তু তিনি কি রকম দেখতে বল দেখি?"

চৈতন্য মুচকে হেসে বললে—"খুবই সুন্দর! কিন্তু তোমার তো

কোন কালেই সৌন্দর্য্যের উপর পক্ষপাত ছিল বলে জানতাম না হে ?' এ অনাবশ্যক কৌতূহল কেন ?"

নীরজা ক্লান্ত স্বরে বললে—"মিছি মিছি একটা ফেসাদ বাধান বইতো নয়, তোমাদের এ জিনিষটার আমি কোন মতেই অনুমোদন করি না।"

পকেট থেকে ফ্লাস্ক্ বার করে চিন্তাহরণ বললে "সে জানি। আর তোমার রমণীষজ্ঞ গল্পটাও যে আমাদের 'খুড়ে'ই লেখা হয়েছে সেও জানতে আমার বাকি নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে তোমায় ভালবাসি, সে তোমার ঐ উদ্ভট্টী লেখার জন্যে। যাক্ অত মিইয়ে প'ড়ো না হে, একটু টনিক্ খাও যে টনক্ নড়ে উঠবে, রসালু হবে।" বলে সে ফ্লাস্ক্ থেকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি নিজের মুখে ঢেলে দিলে।

নীরজা মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল "এর তা বলে আমি কোন মতেই প্রতিবাদ না করে পারি না।"

অবোধ মুখ বিকৃত করে বললে "থাক্ থাক্ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ! আর লেকচার দিতে হবে না। দাওতো হে চিন্তাহরণ আমাকে খানিকটা, আমার আবার কালকে অনেক কাজ!" বলে সে ফ্লাস্ক্টা চিন্তাহরণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে বাকী টুকু খেয়ে ফেললে।

নীরজা বললে "আমাকে কেন আটকে রাখছ ? আমি বাড়ী যাই এইবার !" অন্যান্য সকলেই উঠে প'ড়ে "আমরা সকলেই এবার যাই" ব'লে পথে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে চৈতন্য অবোধকে বললে "আই কনগ্রাচুলেট্ ইউ অবোধ। যেহেতু তুমি আমাদের অমৃতের সন্ধান দিচ্ছ !"

৬

বুড়ীগঙ্গার কিছু দূরেই খানকয়েক বাড়ীর পরে একটা খোলা জায়গা, তারই উপর একটা ছোট সাইজের বাংলো বাড়ী। বাড়ীর সামনের বারান্দাতেই একটী সুন্দরী তরুণী পায়চারি করে করে তার কোঁকড়ান কাল চুলের রাশিকে আঁচড়াচ্ছিল। রাস্তায় বন্ধু ক'জনকে দেখবামাত্রই তার মুখ হাসিতে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি সে ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর যখন সে তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য উৎসুক মুখে বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন তার বেশবাসও একটু বদলান হয়ে গেছে, ঘাড়ের কাছে রাশীকৃত চুলের এলো খোঁপাটীকে শিথিল করে জড়ানো—গোলাপী রংএর পাতলা জ্যাকেট ভেদ করে তার সুপুষ্ট স্বর্ণাভ হাতদুটী দেখা যাচ্ছিল। অবোধকে এগিয়ে আসতে দেখে সে মদিরা বিহ্বল চোখে, শিথিল ভাবে বসনের একপ্রান্ত তার মাথার উপর তুলে দিলে। তারপর দুটী হাতের চম্পক অঙ্গুলী ক'টী জোড় করে ছোট্ট একটী নমস্কারের আভাস জানিয়ে বললে,—"একি অবোধবাবু যে—আজ আমার কি সৌভাগ্য!"

অবোধ এক লাফে সিঁড়ির উপর উঠে নমস্কার করে সহাস্যে বললে, "হ্যাঁ আমিই, কিন্তু সৌভাগ্যটা কি এক পক্ষের মিসেস্—" সহসা সে ভয়ানক রকম কাস্‌তে লাগল।

খিল খিল করে হেসে উঠে তরুণী বললে,—"মিসেস্ দে। কিন্তু আপনার ও কথা বলতে বড্ডই বাধে, না অবোধবাবু?"

অবোধ কাসি থামিয়ে তাড়াতাড়ি কি বলবার উপক্রম করতেই, সে গম্ভীর হ'য়ে উঠে আবার বলে উঠল, "তা ত বাধবেই। আমারই 'মিসেস্ দে' নামটা স্মরণ করলে সারা অন্তঃকরণটা বিষিয়ে ওঠে, তা আপনার ত হবেই!"

বিকৃত মুখে অবোধ বললে "সে ভ্যাগাবণ্ডটা কোথায়?"

তরুণী বললে "কেন তার সঙ্গে লাঠালাঠি করবেন নাকি? কিন্তু সেও এইমাত্র কি একটা কাজে বেরিয়ে গেল!" বলে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

অবোধ সহাস্যে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললে,—"থাক, থাক, অনর্থক আপনাকে বিব্রত হতে হবে না। আপনি বরং আমার বন্ধু ক'জনকে আসবার অনুমতি দিন, তাঁরা ঐ গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন!"

তরুণী ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে "তাই নাকি? আমি কিন্তু বড়ই দুঃখিত অবোধবাবু আপনি আপনার বন্ধুদের ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন বলে। যাক্ এগিয়ে নিয়ে আসুন। সাহিত্যিকদের পদ-ধূলিতে এ গরীবের কুঁড়েঘর পবিত্র হোক!"

"কি যে বলেন আপনি!" বলে সহাস্যে অবোধ উঠে দাঁড়াল। তারপর একে একে সকলকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। "এই প্রেমবল্লভবাবু এঁর লেখা 'কাদা' আর 'পাঁচবাণ' নিশ্চয়ই পড়েছেন! ইনি চিন্তাহরণবাবু এঁর কাব্যগ্রন্থ 'কালোরাত' আর উপন্যাস 'পয়লা ভালবাসা' আর 'শেষ' নিশ্চয়ই আপনি জানেন! এঁর লেখা আরও বিখ্যাত বই আছে। এই পরমেশবাবু, এঁর কথা আজ কাল সকলের মুখে মুখে। এঁর লেখা উপন্যাস 'ছোটবড়' খানা সাহিত্যে যুগান্তর এনেছে। আর চৈতন্যবাবু, এঁর কাব্য নিশ্চয়ই পড়েছেন।"

তরুণী স্মিতহাস্যে সকলকেই বার বার নমস্কার জানালে তারপর বললে,—"আমার আজ কি সৌভাগ্য! আজ এতগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হলাম। কি অপরিসীম সুখেই না আমার বুকখানা ভরে উঠেছে! কি বলে যে আপনাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব তা ভেবে পাচ্ছি না!"

চাপা হেসে অস্ফুট স্বরে অবোধ বললে, "আমাদেরও অসীম সৌভাগ্য যে আপনার মত একজন মহীয়সী মহিলার সাক্ষাৎ পেলাম মিসেস্—"

উজ্জ্বল হাসিভরা মুখে তরুণী বললে "আমাকে আপনারা স্বর্ণ বলেই ডাকবেন। আমার নাম স্বর্ণলতা!"

"বেশ ত বেশ ত!" বলে সকলে আনন্দ জানালে, এবং বসে পড়ে তাকে অভিবাদন করলে। চৈতন্য মাঝখান থেকে বলে উঠল, "কিন্তু আপনাকে আমরা যদি স্বর্ণা বলে ডাকি তাতে আপনার কোন আপত্তি নেই তো?"

তরুণীর মুখ রাঙা হয়ে উঠল, কিন্তু সে লজ্জায় নয় আনন্দে। মৃদু হেসে সে বললে "তা বেশ তো চৈতন্যবাবু আপনাদের যদি ঐ নামই ভাল লাগে, তাহলে তাই বলেই ডাকবেন, এতে আমি কিছুই মনে করবো না, অত বাজে প্রেজুডিশ্ আমার নেই।"

চৈতন্য গদগদ স্বরে বললে "আপনার মত মেয়ে যদি আজ বাঙালীর ঘরে ঘরে থাকত, তাহলে সোনার বাংলা আজ হীরের বাংলা হয়ে উঠত।"

স্বর্ণ সলজ্জ গ্রীবাভঙ্গি করে অপাঙ্গে চেয়ে বলে উঠল "যান্ কি যে বলেন আপনি!"

অবোধ সহাস্যে বললে "আপনি এত লজ্জাবোধ করছেন কেন স্বর্ণা দেবী? এ তো অতি সত্য কথা, কিন্তু কিছু মনে করবেন না, বাস্তবিকই আপনার লজ্জাটী বড় সুন্দর! চেয়ে চেয়ে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না!"

চিন্তাহরণ আর পরমেশ মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগল। দুজনেই ভাবতে লাগল, চৈতন্য আর অবোধের কি বরাত! এরি

মধ্যে কি পশারটাই না জমিয়ে ফেললে। কিন্তু সহসা মুখে কোন কথাই না আসাতে তারা চঞ্চলচিত্তে বসে রইল। স্থবর্ণ নৃত্যের ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"যান্! কিন্তু কিছু দিয়ে তো আপনাদের মুখ বন্ধ করতে হবে, না হলে তো কেবলই আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবেন!"

অবোধ হাঁ হাঁ করে বাধা দিয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই স্থবর্ণ তার শাড়ীর আঁচল ঘুরিয়ে ঘুর্ণি ঝড়ের মতই অন্দরে ঢুকে পড়েছে। তার বেশ-বাসের তীব্র সৌরভ বন্ধু কজনকে মুহ্যমান করে তুলল। তন্দ্রালস দৃষ্টি মেলে চিন্তাহরণ বললে—"বাস্তবিক যা দেখলাম তার তুলনা হতে পারে না।" পরমেশ স্থদীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে বললে "স্থন্দর! রোমাঞ্চকর!" অবোধ মৃত্বস্বরে বললে, "ঠিক্, ওঁর মুখে তো অনেক খুঁত আছে, কিন্তু এত রূপ আমি দেখিনি! এত উজ্জ্বল! ঠিক যেন বিদ্যুৎলেখা!"

সকলে সমস্বরে সায় দিলে। চৈতন্তর বোধ হয় একটু বেশী রকম ভাব লেগেছিল—মাথা নেড়ে গুন গুন স্বরে সে গান আরম্ভ করে দিলে—

অলকে কুস্থম না দিও
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিও
কাজল বিহীন সজল নয়নে
হৃদয় দুয়ারে ঘা দিও। (ক্রমশ)

শ্রীনীলিমা দেবী মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণকান্তের উইলে আইনের ভুল

সময়ে উকীলের সহিত পরামর্শ না করিলে কিরূপ অনর্থ ঘটে তাহা কৃষ্ণকান্তের উইলে বেশ দেখা যায়। কৃষ্ণকান্ত রায় ভুল করিয়া উকীল ডাকেন নাই বা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে ডাকিতে দেন নাই। দোষ যাঁহারই হউক, ফল ভাল হয় নাই। নিম্নে আমরা এইরূপ কতিপয় ভুল দেখাইবার চেষ্টা করিব, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর দুই একটা "বে-আইনী" ভুল যাহা চোখে পড়িয়াছে তাহাও উল্লেখ করিতে বিরত হইব না।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে "কৃষ্ণকান্তের উইল" সমধিক প্রসিদ্ধ। কাহারও কাহারও মতে ইহাই বঙ্কিমবাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখা। "কৃষ্ণকান্তের উইল" বাংলা ১২৮৪ সালে বঙ্গদর্শনে প্রথম ধারাবাহিক বাহির হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পর বঙ্কিমচন্দ্র স্থানে স্থানে সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমরা "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রথম প্রকাশের তারিখ বাংলা ১২৮৪ সাল ইং ১৮৭৭-৭৮ ধরিয়া লইয়া আমাদের বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশ করিব।

গোবিন্দলাল ভ্রমরের মৃত্যুর পর "এক রাত্রে তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসরের পর তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।" (দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)। ইংরেজী ১৮৭২ সালে প্রবর্ত্তিত সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ১০৮ ধারায় বিধান আছে যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি জীবিত বা মৃত এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে, আর প্রমাণিত হয় যে তিনি জীবিত

থাকিলে স্বভাবতঃ যাঁহারা তাঁহার সংবাদ পাইতেন তাঁহারা ৭ বৎসরের মধ্যে কোনও সংবাদ পান নাই, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া গণ্য করা হইবে, এবং তাঁহাকে জীবিত বলিয়া প্রমাণ করার ভার অপর পক্ষের উপর পড়িবে। সুতরাং সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ১০৮ ধারা মতে সাত বৎসর পরে গোবিন্দলালকে মৃত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৭-৭৮ সালে লিখিত কৃষ্ণকান্তের উইলে ১৮৭২ সালের আইনানুসারে গোবিন্দলালকে মৃত সাব্যস্ত করিলেন। কিন্তু ১৮৭২ হইতে ১৮৭৭-৭৮ পর্য্যন্ত সাত বৎসর হয় নাই ; এ অবস্থায় কি গোবিন্দলালকে মৃত সাব্যস্ত করা যায় ? ১৮৭২ সালের পূর্ব্বে হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্র অনুসারে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিরুদ্দেশের তারিখ হইতে দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে মৃত বলিয়া গণ্য করা হইত না ; এবং নিরুদ্দেশের সময় হইতে ১২ বৎসর অতিক্রান্ত না হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ সম্পত্তি পাইতেন না। এই বিষয়ে ইং ১৮৬৮ সালে জন্মেজয় মজুমদার বনাম কেশবলাল ঘোষের মামলা ও ইং ১৮৭০ সালে গুরুদাস নাগ বনাম মতিলাল নাগের মামলা নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা হাইকোর্টে হয়। ইহার কথা বঙ্কিমচন্দ্র যে কোন উকীলকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিতেন। কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চাননের ত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহার দুই কন্যা সারদাসুন্দরী দেবী ও ব্রজসুন্দরী দেবীর মধ্যে এই প্রশ্ন লইয়া মামলা হয়। কাঁটালপাড়ার সন্নিকটস্থ নারায়ণপুরনিবাসী অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী উকীল তাঁহারই সমসাময়িক। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত ব্যবস্থা জানিতে পারিতেন।

ইংরেজী আইনের খাতিরে না হয় গোবিন্দলালের বিষয় তাঁহার ভাগিনেয় শচীন্দ্র পাইলেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান আচারবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের

বংশে জন্মিয়া নিজে নিষ্ঠাবান আচারবান হিন্দু হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র কি করিয়া দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে গোবিন্দলালের শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা করাইলেন ?

বৃদ্ধ মনু ও বৃহস্পতির বচন অনুসারে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে। বঙ্গের অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের এবিষয়ে স্পষ্ট ব্যবস্থা আছে। তিনি তাঁহার তিথিতত্ত্বে ব্যবস্থা করিয়াছেন—

"গতস্য ন ভবেৎ বার্ত্তা যাবৎ দ্বাদশ বার্ষিকী
প্রেতাবধারণন্তস্য কর্ত্তব্যং সুত বান্ধবৈঃ।"

এই ভুল বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে মারাত্মক ভুল। পরে পরবর্ত্তী সংস্করণেও তিনি ইহা সংশোধন করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র কি এই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা জানিতেন না ?

"ভ্রমরের মৃত্যুর পর সাত বৎসর পরে সেই মন্দির-দ্বারে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। * * * * শচীকান্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু পরে বিস্ময় দূর হইল, তিনি গোবিন্দলালের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য যত্ন করিলেন। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন "আজ আমার দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাতবাস সমাপনপূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করা হইল। এখন ফিরিয়া যাইব।" পরিশিষ্ট)।

ভ্রমরের মৃত্যুর পর ৭ বৎসরের মধ্যে কিরূপে গোবিন্দলালের দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত হইল ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১৮৭৭-৭৮ সালে "কৃষ্ণকান্তের উইল"

লিখিত হইয়াছে। ইহার অন্ততঃ ৭ বৎসর পূর্ব্বে ভ্রমরের মৃত্যু হইয়াছে; ভ্রমরের মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দলাল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে ভ্রমর কৃষ্ণকান্তের উইল-মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি গোবিন্দলালকে দান করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)। এমতে দানের সময় ইং ১৮৬৩ সাল হয়। যখন গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন তখন ভ্রমরের বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। ভ্রমর বলিতেছেন "* * * আমার কি দোষে এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব দুর্দ্দশা ঘটিল; আমার পুত্র মরিয়াছে—আমার স্বামী ত্যাগ করিল—আমার সতের বৎসর মাত্র বয়স * * *" (প্রথম খণ্ড, একত্রিংশ পরিচ্ছেদ)। ইংরেজী ১৮৭৫ সালের ৯ নং আইন অনুসারে ১৮ বৎসর সাবালকত্বের বয়স বলিয়া ধার্য্য হয়। এমতে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বাচরিত পন্থানুসারে ১৭ বৎসরে ভ্রমর দান করিতে পারেন না। কিন্তু প্রকৃত হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রানুযায়ী ১৭ বৎসর বয়সে ভ্রমর সাবালিকা—এমতে ইং ১৮৬৩ সালে ১৭ বৎসরে দান করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আবার একটী ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হয়। ইং ১৮৬৪ সালের পূর্ব্বে রেজেষ্টারী করিয়া দলিলের সম্পূর্ণ নকল রাখিবার ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৬৩ সালে বা তাহার পূর্ব্বে লিখিত দান পত্রের সম্বন্ধে "সরকারীতে ইহার নকল আছে" বলা চলে না।

বইখানির নাম "কৃষ্ণকান্তের উইল"; উইলের ব্যাপার লইয়াই নভেলের নায়কনায়িকাগণের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। উইলের ব্যাপার বুঝিতে উইলকর্ত্তার পরিবারবর্গের পরিচয় লওয়া দরকার। নিম্নে আমরা কৃষ্ণকান্ত রায়ের বংশের কুরচিনামা দিলাম।
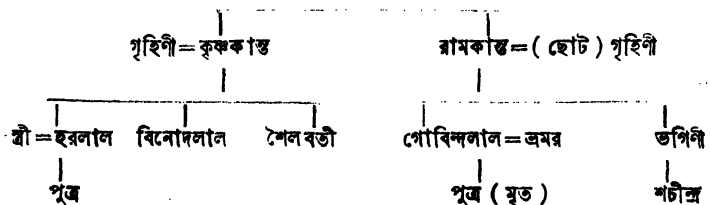
প্রথম উইলে কৃষ্ণকান্ত রায় গৃহিণীকে ৴০ এক আনা, হরলালকে ৶০ আনা, বিনোদলালকে ৶০ আনা, কন্যা শৈলবতীকে ৴০ এক আনা, আর গোবিন্দলালকে ৷০ আট আনা দিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে হরলাল আপত্তি করিল; আপত্তি করাতে কৃষ্ণকান্ত "স্বহস্তে উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন" (প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)। পুনরায় উইল করিলেন; দ্বিতীয় উইলে গৃহিণী ৴০ এক আনা, হরলাল ৴০ এক আনা, বিনোদলাল ।৴০ পাঁচ আনা, শৈলবতী ৴০ এক আনা, আর গোবিন্দলাল ৷০ আট আনা পাইবে ব্যবস্থা হইল। দ্বিতীয় উইল আবার "শীঘ্র রেজেষ্টারী করেন" (প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)। হরলালের দুর্ব্যবহারে "কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নূতন উইল করিবেন।" তৃতীয় উইলে ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ, কেবল হরলালের ৴০ এক আনা স্থলে শূন্য, আর হরলালের পুত্র পাইলেন "এক পাই।" বঙ্কিমবাবু "এক পাই"কে কি ইংরেজী পাই হিসাবে, যাহার তিনটায় এক পয়সা, সে হিসাবে ব্যবহার করেন নাই, পয়সা হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন? কারণ কৃষ্ণকান্ত রায় বলিতেছেন, "আমার আয় দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপর হয়।" এই পাই কথাটার ব্যবহার ঠিক হয় নাই। সে যাহাই হউক তৃতীয় উইলের ব্যবস্থা অনুসারে ষোল আনা সম্পত্তি সম্বন্ধে উইল হইল না। কৃষ্ণকান্ত রায় ষোল আনা সম্পত্তির মালিক স্বরূপে উইল করিতেছেন—গোবিন্দলাল ৷০, শৈলবতী ৴০, গৃহিণী ৴০, বিনোদলাল ।৴০, হরলালের পুত্র "এক পাই", এরূপে তিনি ৸৶১ পাই বা ৸৶৫ সম্পত্তির ব্যবস্থা করিলেন, বক্রী (residuary) অংশ ১১ পাই বা তিন পয়সা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিলেন না। যে হরলালকে বঞ্চিত করিবার জন্য এত আয়োজন ও বুড়ার এত রাগ, সেই হরলালই

বুড়া মরিলে এই ১১ পাই বা ৻১৫ পয়সার অর্দ্ধাংশ তিনি intestate বা বিনা উইলে মারা গিয়াছেন হিসাবে পাইবেন। কৃষ্ণকান্তের অগাধ সম্পত্তি; সেই সম্বন্ধে উইল হইতেছে; কোন উকীলের পরামর্শ লওয়া হইল না ইহা যেন আমাদের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকে। বিনা উকীলের পরামর্শে যাহা হয়, তাহাই হইল; বুড়া কৃষ্ণকান্ত রায়ের হিসাবে ভুল হইল। বঙ্কিমবাবুই এজন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

কৃষ্ণকান্ত রায় মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে চতুর্থ উইল করিলেন। তৃতীয় "উইল ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে;" চতুর্থ উইলে "যেমন আছে, সব সেইরূপ, কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্ত্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্দ্ধাংশ পাইবে লেখ।"

এই সামান্য পরিবর্ত্তনের জন্য তৃতীয় উইল ছিঁড়িয়া ফেলিবার দরকার কি? সামান্য উইলের codicil বা ক্রোড়পত্র সম্পাদন করিলেই ত কৃষ্ণকান্তের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত! মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সম্পাদিত উইল লইয়া হরলাল মামলা মোকর্দ্দমা করিবে না তাহার স্থিরতা কি? করিলে তাহার পক্ষে বলিবার অনেক কথা ছিল। গোবিন্দলাল না হয় চতুর্থ উইলে "আপনি উপযাচক হইয়া উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন।" উইলের ক্রোড়পত্রে গোবিন্দলালের স্বাক্ষর থাকিলে, গোবিন্দলালও কিছু করিতে পারিতেন না; হরলালও বহুপূর্ব্বে সম্পাদিত উইল সম্বন্ধে উইলকর্ত্তার মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রভৃতির (want of testamentary capacity) কথা আদৌ উত্থাপন করিতে পারিতেন না। বঙ্কিমবাবু নিজে হাকিম হইয়া এ সামান্য বুদ্ধিটুকুও খরচ করিলেন না! তিনি অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন "যে কৃষ্ণকান্ত মূমূর্ষ অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইয়া,

কতকটা ভ্রান্তচিত্ত লইয়াই" চতুর্থ উইলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। (প্রথম খণ্ড ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণকান্তের "শ্রাদ্ধের গোল থামিল। শেষ উইল পড়ার মন্ত্রণা আরম্ভ করিল। উইল পড়িয়া, হরলাল দেখিলেন, উইলে বিস্তর সাক্ষী, কোন গোল করিবার সম্ভাবনা নাই। হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, "উইলের কথা শুনিয়াছ?"

গোবিন্দলাল ত নিজে সাক্ষী; তাঁহার সম্মুখেই ত উইল লেখা হইল, তবে তিনি 'উইল পড়িয়া আসিয়া' ভ্রমরকে বলিলেন ইত্যাদি কথাটা যেন খাপছাড়া খাপছাড়া। ভ্রমরকে বলিবার প্রয়োজন হইলে ভ্রমরের পিত্রালয় হইতে আসিবার পরেই বলিতে পারিতেন।

ব্রহ্মানন্দই কৃষ্ণকান্ত রায়ের সকল উইল লিখিতেন। এজন্য জাল উইল করিবার জন্য হরলাল তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। কৃষ্ণকান্তের উইলগুলি খুব সম্ভবতঃ জেনারেল লেটারের কাগজে লেখা, সেইজন্য হরলাল জেনারেল লেটারের কাগজ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। হরলাল জালিয়াতের সাবধানতা লইয়া ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন "দুইটী কলম কাট। দুইটী যেন ঠিক সমান হয়। ইত্যাদি * * ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।" (প্রথম খণ্ড)। হরলাল খুব সাবধানী ও হুঁসিয়ার লোক বুঝা যাইতেছে, সব কাজ ভাবিয়া চিন্তিয়া করেন। কিন্তু এই হরলাল জাল "উইলে কৃষ্ণকান্ত রায়ের এবং চারিজন সাক্ষীর দস্তখত করিয়া দিলেন।" বঙ্কিমবাবু যেরূপ ঘটনার কথা বলিয়াছেন, তাহাতে এই উইল ইং ১৮৬৩ সালের পূর্ব্বের। উইল করিতে হইলে উইলকর্ত্তা ও মাত্র দুইজন সাক্ষীর স্বাক্ষর

দরকার। হরলাল কেন বৃথা চারিজন সাক্ষীর সহি জাল করিতে গেলেন ? যত বেশী লোকের সহি জাল করা যায় জাল ধরা পড়িবার সম্ভাবনা তত অধিক। এইরূপ ৪ জন সাক্ষীর সহি জাল করাতে হরলালের বুদ্ধির তারিফ করিতে পারা গেল না, অথচ বঙ্কিমবাবু হরলালকে চট্‌পটে কর্ম্মচতুর প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত। আমাদের বোধ হয় বঙ্কিমবাবুর উইল করিতে হইলে কয়জন সাক্ষীর দরকার সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা কিছু ছিল না।

ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিবার পঞ্চম বৎসরে গোবিন্দলাল রোহিণীকে খুন করার অপরাধে ধরা পড়িলেন। দায়রার বিচারে তিনি খালাস পাইলেন। "খালাস পাইয়াও তাঁহাকে আর একবার জেলে যাইতে হইল—সেখানে জেলার পরওয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন জেলে ফিরিয়া যান, তখন মাধবীনাথ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কানে কানে বলিলেন, "জেল হইতে খালাস পাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আমার বাসা অমুক স্থানে।"

কিন্তু গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইয়া মাধবীনাথের কাছে গেলেন না। কোথায় গেলেন কেহ জানিল না।" (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)।

সেশন জজের হুকুমে খালাস হইবার পর আবার জেলে যাইতে হয়, ইহা নূতন কথা। আইনে এরূপ আছে বলিয়া কেহ জানে না। তাহার পর মাধবীনাথ, জেলের দরওয়াজা অবধি নিজে যাইতে পারিতেন, না হয় পাহারাওয়ালা বা জেলের বাবুদের কিছু দক্ষিণান্ত করিতে পারিতেন। করিলে তাহারা গোবিন্দলালকে তাঁহার নিকট ধরিয়া আনিত। গল্পের প্লট ঠিক রাখিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু এরূপ কথা লিখিয়াছেন।

গোবিন্দলাল খালাস পাইবার পর প্রসাদপুরের কুঠীতে গেলেন। ইট্ কাঠ বেচিয়া "কিছু পাইলেন। তাহা লইয়া কলিকাতায় গেলেন। * * * প্রসাদপুর হইতে অল্প টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা এক বৎসরে ফুরাইয়া গেল।" গোবিন্দলাল ভ্রমরকে চিঠি লিখিলেন—লিখিলেন "আমি নিঃস্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিয়াছি। তীর্থস্থানে ছিলাম, তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত। এখানে ভিক্ষা মিলে না—সুতরাং অন্নাভাবে মারা যাইতেছি।" ইত্যাদি।

বঙ্কিমবাবু গোবিন্দলালকে দিয়া কেন কতকগুলি মিথ্যা উক্তি করাইলেন? কি করিয়া তিন বৎসর হইল? ইহাতে গোবিন্দলালের চরিত্রের কি বিকাশ দেখাইতে তিনি সক্ষম হইয়াছেন?

গোবিন্দলাল লিখিতেছেন "পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?" গোবিন্দলাল ভুলিয়া গিয়াছেন যে ভ্রমরের দানপত্রের ফলে তিনিই বিষয়ের মালিক। ভ্রমর কিন্তু সে কথা ভুলে নাই। পত্রের উত্তরে লিখিল "বিষয় আপনার। আমার হইলেও আমি উহা দান করিয়াছি। যাইবার সময় আপনি সে দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু রেজেষ্ট্রী আপিসে তাহার নকল আছে। আমি যে দান করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ। তাহা এখনও বলবৎ।"

এইরূপ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুল আছে, ইহাতে ঔপন্যাসিক চরিত্রের অঙ্গহানি হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু কি ইহা শুধরাইতে পারিতেন না, না ইচ্ছা করিয়াই এরূপ ভুল রাখিয়াছেন?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

সংবাদ-সাহিত্য

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকায় রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ একটি সারগর্ভ কথা বলিয়া আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দিয়াছেন। যখনি আমাদের জ্ঞানের গ্লানি এবং অজ্ঞানের অভ্যুত্থান ঘটে তখনি জ্ঞানী মহাত্মাগণ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন। বাংলা দেশে যে কারণেই হউক একটা অন্ধকারের যুগ চলিতেছিল কিন্তু সে অন্ধকার ঘুচিবার মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আচ্ছা, ভাদ্র মাস পর্য্যন্তও কি আপনারা জানিতেন যে মধ্যরাত্রির পর যখন ৭।৮ ঘণ্টা কাটিয়া যায় তখন যে সময়টা আসে তাহাকে দিন বলে? অথবা গঙ্গানদীতে যতরকম মাছ পাওয়া যায় তাহার ভিতর হইতে ইলিশ মাছের নাম বাদ দিয়া যদি আর সমস্ত মাছেরই নাম করা যায় তাহা হইলে যে মাছের নাম বাদ পড়িল সেটা ইলিশ মাছ? না, আপনারা নিশ্চয়ই একথা জানিতেন না।

তিনি বলিতেছেন—

> কেহ কেহ মনে করেন যে পুরাতনের অনুবর্ত্তন চর্ব্বিত চর্ব্বন মাত্র।

ঠিক যেন দৈববাণী। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে "চিত্রবিদ্যায়, কাব্যে, সঙ্গীতে—সর্ব্বত্র এই কথা খাটে।" আশা করি খগেন্দ্রবাবু কুশলে আছেন।

—

আমরা জানিতাম গল্পমাত্রেই গল্পের জন্য লেখা হইয়া থাকে। কিন্তু যদি এমন হইত—একটা গল্প, যাহাকে আমরা মনে করিতেছি

গল্প, সে আদৌ গল্প নয়—সে একটা ঘোড়ার আস্তাবল—অথবা গল্পের ছদ্মবেশে সে একটা সার্কাস পার্টি তাহা হইলে কি মজাটাই হইত! তরুণ সাহিত্যিকের লেখা গল্পগুলি যে আস্তাবল, হাসপাতাল বা সার্কাস-গর্ভ এক একটা ফ্রেম মাত্র ইহাই ত দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহার ভিতরকার মজাটুকু উপভোগ্য হইতেছে। আশ্বিনের পূর্ব্বাশায় 'দীপক' বসুর (মানে বুদ্ধদেব বসুর) হত্যার ভিতর একটা আস্ত চীপ থিয়েটার দেখা গেল। গল্পের ভিতর থিয়েটার ঢুকাইতে পারিলে রাজ্যের ন্যাকামি অবলীলাক্রমে তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া যায়—গল্প সাইজে বেশ বাড়ে—থিয়েটারভক্ত পাঠকেরা গদগদ হইয়া উঠে—পারিশ্রমিকও দুই চারি আনা বেশি পাওয়া যায়। আন্তরিকতা না থাকিলেই লোকে থিয়েটারী চালে চলে—এবং ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

—

কেহ কেহ বলেন, লেখক অশ্লীল লিখিলেও তাহার লিখিবার ক্ষমতা আছে। এই অশ্লীলতা এবং vulgar অংশগুলি বাদ দিলেই নাকি তাঁহার লেখা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের কোঠায় গিয়া পৌঁছায়। একথার কোনো অর্থ নাই। Cheap appeal যে লেখার লক্ষ্য এবং উপলক্ষ—তাহার ভিতর হইতে cheapnessটুকু বাদ দিলেই যে তাহা মহামূল্য হইয়া উঠিবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে না। শস্তা জাপানী খেলনা হইতে তাহার সস্তামিটুকু বাদ দেওয়া যায় না—হাতুড়িপেটা করিলে তাহার আকৃতি বদলায় কিন্তু প্রকৃতি বদলায় না—টিন টিনই থাকে।

—

থিয়েটারের ষ্টেজে কাঁদিয়া ককাইয়া যে সমস্ত অভিনেতা হাততালি পাইয়া থাকে—তাহাদের মধ্যেই এই অপরিহার্য্য ন্যাকামির ছড়াছড়ি।

ইহাই অভিনয়। কিন্তু একটা লেখকের লেখার জরুরিত্ব দেখাইবার জন্য বুদ্ধদেব কি কাণ্ডটাই না করিয়াছেন! পৌনঃপুনিক আবৃত্তি করিলেই যদি emotion প্রকাশ পাইত তাহা হইলে এঞ্জিনের পিস্‌টন্‌টা নিশ্চয়ই খুব emotional.

—

হত্যার প্রথমেই দেখিতেছি—

প্রাণপণে—প্রাণপণে লেখা। বাড়িতে একটা টাকা নেই। রুদ্ধশ্বাসে, ঊর্দ্ধশ্বাসে। বাড়িতে তার একটা টাকা নেই। প্রাণপণে—প্রাণপণে তাকে লিখতে হবে। পাগলের মত! ঊর্দ্ধশ্বাসে রুদ্ধশ্বাসে।…বাড়িতে আজ একটি টাকা নেই।…কিন্তু তাকে লিখতেই হবে যে। শেষ করতেই হবে চারটের মধ্যে।…কিছু হ'লো না, যা সে ভেবেছিল কিছুই হ'লো না। বাজে গল্প হ'লো, রাবিশ। বাজে, বাজে, রাবিশ, রাবিশ।…বাড়িতে একটা টাকা নেই।… প্রাণপণে, প্রাণপণে সে লিখবে। (দরজায় টোকা) টুক্— টুক্—টুক্।…টুক্-টুক-টুক, আবার শোনা গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর…টুক্-টুক্! টুক্-টুক্-টুক্। টুক্-টুক্।…টুক্-টুক্-টুক্।…ও যায় না কেন? ও চলে যায় না কেন?

হত্যার শেষে—

সে শেষ করবে, শেষ সে করবেই।…ভক্ত তার ভক্ত।… লিখতে যে তাকে হবেই। শেষ করতেই হবে গল্প।… দেয়ালে মাথা ঠুকে তার মরতে ইচ্ছে করছে, তার ম'রে যেতে ইচ্ছে করছে।…যেমন ক'রে হোক তাকে লিখতেই হবে। যত বাজে হোক তাকে লিখতেই হবে।…টাকার তার

দরকার। একটা টাকা নেই বাড়িতে।…সেগুলো নয়, এগুলো তার কথা নয়। এগুলো নকল, এগুলো বাজে। বাজে বাজে ওঃ অসম্ভব বাজে!…আ—এখনই কী, এখনই কী হয়েছে?…শেষ পৃষ্ঠা, এই শেষ পৃষ্ঠা।…না, হয় নি, হয় নি, হয় নি…আপনি যেতে পারেন না?—যেতে পারেন …বাড়িতে একটা টাকা নেই।

পৃষ্ঠা বাড়াইবার জন্য—শুধু পৃষ্ঠা বাড়াইবার জন্য—হায় শুধুই পৃষ্ঠা বাড়াইবার জন্য—কি, কি অমানুষিক ঝটপটি—কি আপ্রাণ! ওঃ কি আপ্রাণ চেষ্টা!

—

শনিবারের চিঠির লেখক সুকবি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দে মহাশয় জানাইয়াছেন যে তাঁহার "প্রবাসী" আফিস হইতে প্রকাশিত ব্যথার পরাগ নামক কবিতার বই হইতে, রামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা নামক এক ব্যক্তি অনেকগুলি ছত্র চুরি করিয়া "আগমনী" নামে, পূজা সংখ্যা "নায়কে" ছাপিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধনবাবুর ইহাতে দুঃখিত হইবার কারণ কি? বরঞ্চ আনন্দিত হইবারই ত কথা। কোনো লেখক শক্তিশালী হইলে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী লেখককে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকেন। এইরূপ বড় লেখকের প্রভাবে পড়িয়া ছোট লেখকেরা যাহা লেখে তাহা ভাবের দিক দিয়া অনেক খানিই মিলিয়া যায়—এবং প্রভাব বেশি হইলে শুধু ভাব নহে, উভয়ের লেখা শব্দে শব্দে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়। কৃষ্ণধনবাবু তাঁহার ভক্তকে এরূপ আশ্চর্য্যরূপে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন বলিয়া আনন্দ করুন।

—

৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁহার প্রভাবের manifestation দেখিয়া যাইতে পারেন নাই—কৃষ্ণধনবাবু ত জীবিত থাকিতেই দেখিয়া গেলেন। ইহার পরেও যদি বলেন উক্ত রামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা চুরিই করিয়াছেন তবুও দুঃখের কারণ নাই। গ্রন্থের রচনা চুরি যে গ্রন্থ চুরি হইতে ভাল সে কথা আমাদের লেখক শ্রীঅমিত রায়ের কৃপায় জানিতে পারা গিয়াছে। ধরুন উক্ত লেখক যদি একখানা "ব্যথার পরাগ" চুরি করিতেন তাহা হইলে আপনার কত লোকসান হইত; কিন্তু লেখা চুরিতে আপনার পকেট হইতে একপয়সাও খরচ হইল না! এই জাতীয় লেখকদের বিবেক বলিয়া পদার্থটি যে এখনও নষ্ট হয় নাই, সেটা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

—

বীরবলের 'লেখা' 'নেশা'-রূপে মুদ্রিত হওয়ার একমাত্র alter-native উদয়নের ছাপার প্রশংসা করা। অর্থাৎ "দেখেছ হে উত্তরা, উদয়ন 'লেখা'কে 'নেশা' করে না, উদয়ন বড় ভালো"। কিন্তু উত্তরার দোষ কি?

আমরা জানি লেখা মাত্রেই নেশা—এবং ইহার অপর নাম পেশা। উত্তরা খুব সম্ভব ইচ্ছা করিয়া 'লেখা'কে 'নেশা'রূপে খাড়া করিয়াছেন। এবং উত্তরার পাঠকবর্গ "লেখা ছেড়ে দিয়েছি" থেকে "নেশা ছেড়ে দিয়েছি" আরও ভাল বুঝিতে পারিবেন। কারণ লেখা যখন আপনি ছাড়েন নাই—অথচ লিখিতেছেন "লেখা ছেড়ে দিয়েছি"—ইহাতে পাঠকেরা স্বভাবতই মনে করিতেন যে 'নেশা' ছাপার ভুলে 'লেখা' হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে আরো একটা উপকার হইয়াছে। কোনো লেখক লেখা ছাড়িয়া দিয়াছি বলিলে লোকের মনে দুঃখ হয়, কিন্তু নেশা ছাড়িয়া দিয়াছি শুনিলে sober লোক মাত্রেই আনন্দ লাভ

করিয়া থাকেন। অবশ্য প্রকৃত নেশাখোর সম্বন্ধে এমন কথা রটাইলে নেশাখোরের নেশা ছুটিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী লিখিতেছেন—

> বাংলাদেশে নূতন পত্র নিত্যই প্রকাশিত হয়; কিন্তু এই সব নূতন পত্রের অঙ্গে চোখে পড়বার মত কোনো নূতনত্ব থাকে না। "উদয়ন" হচ্ছে একখানা নূতন পত্র, এবং প্রথমেই চোখে পড়ে—এ পত্রের ছাপা অতি চমৎকার।

স্তুতিচ্ছলে নিন্দা অনেক সময় নিরাপদ, কারণ সোজাসুজি নিন্দাকে প্রথমেই নিন্দা বলিয়া চিনিতে পারা যায়। প্রমথবাবু বলিয়াছেন, "প্রথমে চোখে পড়ে ছাপা অতি চমৎকার" এবং দ্বিতীয়ত "উদয়নের আর একটি মহাগুণ এই যে, তার ছাপা প্রায় নির্ভুল।" তৃতীয় এবং চতুর্থ গুণের উল্লেখ নাই। না থাকিয়া ভালই হইয়াছে।—মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

—

"ছাপা প্রায় নির্ভুল" ইহা একটি উচ্চশ্রেণীর বীরবলী রসিকতা। কেননা ইহাই যদি উদয়নের একমাত্র বিশেষত্ব হয় তাহা হইলে অন্যান্য পত্রিকাগুলি ত "ছাপা প্রায় ভ্রমপূর্ণ" নিবন্ধন উঠিয়া যাইবার মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সবুজপত্র বোধ হয় এই কারণেই আর নাই। কিন্তু ছাপা প্রায় নির্ভুল এরূপ পত্রিকা বাংলাদেশে আরো বাহির হয়—যেমন ত্রৈমাসিক Telephone Directory রেলোয়ে টাইমটেবল্ ইত্যাদি। ভ্রমক্রমে ইহাদের নাম করা হয় নাই।

—

বাংলাদেশে চিত্রশিল্পে রুচির এবং রস-বোধের অভাব আছে, ইহা ঢাক পিটাইয়া জানাইবার দরকার হয় না। কাজেই যখন কেহ লম্ফঝম্ফ করিয়া বিস্তর আড়ম্বর সহকারে নিজের রুচির দৈন্য এবং রস-বোধের অভাবকে পণ্যের মত ফেরি করিয়া বেড়ায় তখন তাহা রসিকজনের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে।

ভাবের দারিদ্র্য আছে, দারিদ্র্য ঘুচাইবার চেষ্টা কর—কিন্তু দারিদ্র্যবোধ হারাইয়া ফেলিলে তোমাদের উপায় কি?—সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, কি সৃষ্টি করিবে তাহার কল্পনা নাই—অথচ সখ আছে।

—

ক্যামেরার সাহায্যে আর্টের সৃষ্টি হওয়া তখনই সম্ভব যখন ক্যামেরা অধিকারীর মস্তিষ্কে আর্ট সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান থাকে। য়ুরোপ, আমেরিকায় ক্যামেরার সাহায্যে শিল্পক্ষেত্রে যে সব অদ্ভুত experiment হইতেছে—এবং তাহার ফলে আমরা আলো ছায়ার লীলায় মণ্ডিত যে সব অপরূপ সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিতেছি তাহাতে শিল্পীগণ স্রষ্টার আসনে বসিয়া আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু হায় হতভাগ্য বাংলাদেশ!—আমাদের ক্যামেরা-অধিকারীগণ জানে exposure-chart দেখিয়া শাটার টিপিলেই ছবি হয় এবং artএর শ্রাদ্ধ করিলেই মূর্খকে ঠকাইয়া শ্রদ্ধা আদায় করা যায়!

—

না হইলে এ কি দেখিতেছি! মাসের পর মাস উদয়নে অতি ন্যক্কারজনক কতকগুলি ফোটোকে প্রতিযোগিতার সম্মান দিয়া ছাপা হইতেছে। প্রতিযোগিতা আহ্বান করিলেই কতকগুলি ছবিকে পুরস্কার দিতেই হইবে ইহা হয় ত কৈফিয়ৎ হইতে পারে কিন্তু সম্পাদক অথবা বিচারকের যদি লেশমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকিত—তাহা হইলে এই

ফোটোগুলি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন এবং ভবিষ্যতে আর প্রতিযোগিতার নাম মুখে উচ্চারণ করিতেন না।

—

উদয়ন যে কোন্ শ্রেণীর কাগজ তাহা এই ফোটোগুলি দেখিলে বুঝিতে আর বাকী থাকে না। বীরবল খানিকটা বলিয়াছেন—এবং খুব বুদ্ধি করিয়া খানিকটা বলেন নাই। যেটুকু চাপিয়া গিয়াছেন সেটুকু বলিতে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িত, কাজেই বলেন নাই। এই ফোটো প্রতিযোগিতার বিচারকদের বুদ্ধির উপর ছুরি চালাইলে তবে কিছু কাজ হইত বলিয়া বিশ্বাস। লোক হাসাইবার ইচ্ছা থাকে ব্যক্তিগত ভাবে হাসাইলেই ভাল—সাহিত্য-শিল্পের নামে এ প্রবৃত্তি কেন?

—

চেয়ারের গদি, হার্মোনিয়ামের রীড, পুস্তকের পাতা, কলমের নিব প্রভৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিবার সহজ উপায় কি ইহা লইয়া আমাদের কোনো কঠিন দুর্ভাবনা ছিল না—কিন্তু আমরা গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত উপেক্ষা করিয়া কেবলি ভাবিতেছিলাম সেতারের তার কি করিয়া ছেঁড়া যায়।

এতদিন পরে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আপনারা সকলেই জানেন সেতার বাজাইতে খুব কড়া ছড় দরকার হয়—এই ছড় টানিতে টানিতেই যে সেতারের তার ছিঁড়িয়া যাইতে পারে ইহা কি আমরা কল্পনাও করিতে পারিতাম?

আশ্বিনের ভারতবর্ষে ৫৬২ পৃষ্ঠায় প্রথমেই লক্ষ্য করিবেন—

> "সেতারের উপরে ছড়্ টানতে টানতে সহসা তার ছিঁড়ে গেলে একটা করুণ কান্নায় ফেটে পড়ে তা'র সুর

যেমন থমকে দাঁড়ায়, নীহারের কণ্ঠস্বর হঠাৎ তেমনি ক'রে থেমে গেল।

একদা অচিন্ত্যবাবু তানপুরার সুরের খেলায় দিগদিগন্ত মুগ্ধ করিয়াছিলেন—এইবার ছড় দিয়া সেতারের তার ছিঁড়িবার কায়দা দেখিয়া বিশ্বজন বিমোহিত হইবেন।

—

গল্পে-উপন্যাসে বাদ্যযন্ত্র আমদানি করিবার সময় লেখকদের স্বদেশ-ভক্তি জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। সেই জন্যই আমরা অতি পরিচিত হার্মনিয়মের পরিবর্ত্তে দেশী তানপুরা অথবা সেতার পাইতেছি। ইহার তারগুলি ছাড়া আর সব অংশই স্বদেশী। হার্মনিয়মের যে যে অংশ বিদেশী তাহার মূল্য এই তারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক। সুতরাং "Buy Indian" নীতিতে লেখার ভিতর সেতার তানপুরা তবলা ইত্যাদি আমদানি করা খুব ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনো জিনিস ভাল হইলেই নিরাপদ হয় না। কেননা তানপুরা যদি রামকেলী, জয়জয়ন্তীর সুর ভাঁজিতে থাকে অথবা এস্‌রাজের ছড় সেতারের প্রেমে পড়িয়া যায় তাহা হইলে আর কিছুই না, লোকে একটু কৌতুক করে মাত্র। কাজেই আরো সরল গোপীযন্ত্র, একতারা—অথবা ইহার চেয়েও জটিলতাহীন জয়ঢাক আমদানি করিলেঃক্ষতি কি?

—

আই-সি-এস্ সাহিত্যিকদিগকে লইয়া বড বিপদে পড়া গিয়াছে। কনিষ্ঠ আই-সি-এস্ নবগোপাল দাস যে ভাবে প্যাচ খেলিতেছেন তাহাতে Minerva দেবীর অবস্থা কি হইবে তাহা জানিনা, কিন্তু বঙ্গ-সরস্বতী হাঁফাইয়া উঠিয়াছেন। এদিকে হাঁসটা প্যাক প্যাক করিয়া

প্রাণভয়ে পাখা ঝট্‌পট্ করিতেছে। এখন তাহাকেই সামলাইবেন না নিজেকে সামলাইবেন, ইহা লইয়া দেবী বড় বিব্রত হইয়াছেন।

—

কনিষ্ঠ আই-সি-এস বলিতেছেন—

মনুই সব চেয়ে বড় নন, তাঁর চেয়েও বড় হচ্চে মানব।

যে কোনো কৃতীপুত্রের পিতা সম্বন্ধেও এরূপ বলা চলে, যথা—অমুকের পিতাই সব চেয়ে বড় নয়—তাঁর চেয়েও বড় হচ্চে তাঁর কৃতী-সন্তান। মনু হইতে যদি মানব বড় হয় তাহা হইলে "মানব" হইতে নিশ্চয়ই "নব" বড়। স্বয়ং স্বায়ম্ভুব হইতে ইন্দ্রসাবর্ণি পর্য্যন্ত ইহার সাক্ষ্য দিবার জন্য উদ্যত হইয়া বসিয়া আছেন।

মনুতে যদি মনুসংহিতা বুঝিতে হয় তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কারণ একখানা আইনের বই হইতে মানুষ বড় ইহা গবেষণাও নহে, সংবাদও নহে। মানুষ চিরকাল মানুষের ভালর জন্যই আইন প্রস্তুত করিয়াছে—এবং মানুষের ভালর জন্যই সুযোগ বুঝিয়া তাহার পরিবর্ত্তন করিয়াছে। মানব জাতির ইতিহাসের এ সংবাদটি নবগোপাল দাসের গবেষণার পূর্ব্বেই জনসমাজে সুপরিচিত ছিল। তাহা না হইলে তাঁহার পক্ষে সমুদ্রযাত্রা করিয়া আই-সি-এস্ হইবার সৌভাগ্য হইত না।

—

"শাস্তি" নামক কাগজ ইংরেজ আই-সি-এস্-এর বঙ্গভাষার উপর নেকনজর দিতে দেখিয়া একেবারে নেতাইয়া পড়িয়াছেন। যে রচনাটিকে বাংলাদেশবাসী-ইংরেজের বাংলা রচনার একটি হাস্যকর নমুনা হিসাবে প্রচার করা উচিত ছিল তাহাকে এইরূপ অযোগ্য সম্মান দিয়া "শাস্তি" নিজের inferiority complexএর পরিচয় দিয়াছেন। যাহা বাংলা নহে, তাহাকে বাংলা বলিয়া মানিয়া লওয়ায় বাহাদুরি আছে বটে!

—

ম্যাজিষ্ট্রেটকে রাষ্ট্র আইনের ক্ষেত্রে মানিতে হয়, কিন্তু ভাষার আইনের ক্ষেত্র পৃথক। সেখানে আই-সি-এস্-এর কোনো পৃথক সম্মান নাই। তিনি যদি বাংলা লিখিতে কখনো শেখেন তাহা হইলে আদর করিয়া বাংলা মাসিকে তাঁহার জন্য স্থান করিয়া দিও। কিন্তু এই দেশে থাকিয়া, এদেশের ভাষা শিখিবেন না—অথচ অর্ব্বাচীন সাহিত্যব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে এইরূপে অন্যায় প্রশ্রয় পাইবেন, ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত নহে।

—

ভদ্রলোক হয়ত নূতন বাংলা শিখিতেছেন, কিংবা বাংলা ভাষা শিখিবার জন্য তাঁহার আদৌ কোনো গরজ নাই—কৌতুক করিয়া দুইচারি ছত্র রচনা করিয়াছেন মাত্র, অমনি "শান্তি মনে করিলেন বাংলাভাষা কৃতকৃতার্থ হইল। প্রথমটি সত্য হইলে ভদ্রলোককে জব্দ করিবার জন্য তাঁহার এই রচনাটিকে মাসিকের প্রথমেই বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য বাঙালী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয়টি সত্য হইলে বুঝিতে হইবে শান্তি সম্পাদক I. C, S. উপাধি দেখিয়াই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া এই কাণ্ড করিয়াছেন।

কোনটি সত্য কে জানে! কিন্তু ভাষার নমুনা এই—

"মা লক্ষ্মী ও সরস্বতী

মিঃ আর্থার হিউজেস্ আই, সি, এস্,

এ, ডি, এম্। ঢাকা

আমি আই, সি, এস্, পরিক্ষা পাস্ করার সংবাদ পাইয়া আমার Professor এর নিকট যাই। তাঁহাকে গুরুর মতন শ্রদ্ধা করিতাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'কি করিব' কোন্ পথ দিয়ে যাইব? এই দিকে

University Lecturer এর post খালী আছে, আর ওই দিকে বিদেশী চাকুরী। অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে তিনি শেষে বল্লেন "তুমি আই, সি, এস্ টা নিয়ো, কিন্তু যেন সঙ্গে সঙ্গে মা সরস্বতীর পূজা একটু করিয়া রাখো।" অথচ মা সরস্বতীর কথা তিনি জানেন না, তাঁহার মানে হইল এই। আজ শান্তির সম্পাদক মহাশয় আমাকে এই সুযোগ দিয়াছেন, যে আমি আমার Professor এর কথা মানিতে পারি। 'শান্তির পূজা সংখ্যার জন্য দুচারটী কথা লিখিতে এইতো আমার মা সরস্বতীর পূজা হইল, 'শান্তির দীর্ঘজীবন হোউক্ আশীর্ব্বাদ করি।"

—

Laugh Clown Laugh নামক একখানি ফিল্ম আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। লন চ্যানি উক্ত নাটকে clownএর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্লাউন নিজে দুঃখী, অথচ তাহাকে দিনের পর দিন লোক হাসাইতে হয়। একদিন তাহার এক মর্ম্মান্তিক দুঃখের মুহূর্ত্তেও ক্লাউনের ভূমিকায় নামিতে হয়—ম্যানেজারের আদেশ তাহাকে পালন করিতেই হইবে—সমস্ত মন তাহার বিদ্রোহী—কিন্তু তথাপি তাহার প্রতিবাদ করিবার উপায় ছিল না। ষ্টেজে তাহার অভিনয় কিছুতেই জমিতেছিল না—ম্যানেজার ক্রমাগত তাহাকে উৎসাহ দিতেছিলেন—Laugh clown laugh, even if your heart breaks.

এই গল্পটি আর্টিষ্ট হেমকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চুরি করিয়া 'শান্তি'তে নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন। চুরি আর্টেরই একটা অঙ্গ।

—

গণতান্ত্রিক যুগে লোকে ঠাকুর-দেবতার সঙ্গেও ইয়ার্কি করিতে ভয় পায় না। ভারতবর্ষের "লহ পূজা" নামক কবিতায়—

কহে বালা, 'হে ঠাকুর,
আছে কি হে দুনিয়ায়?

অর্থাৎ, 'ঠাকুর' বাড়ি আছ না কি হে ?' গোছের ভাবটা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও এখন বলা চলিবে—কি হে কবিতা-টবিতা আর আসছে না নাকি হে ?

—

শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবীর 'ভাব ও ভাষা' নামক চিত্রটিতে কেবল ভাব আছে—ভাষা নাই। কিন্তু ভাষা আমাদের জাগিতেছে। অনেক কথাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—কিন্তু থাক।

—

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অনেকদিন ছবি আঁকা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হইবার পর হইতে কেবল কবিতাই লিখিতেছেন। তাঁহাকে কোনো কলেজে লিটারেচারের প্রফেসর করিয়া দিলে হয়ত তাঁহার চিত্রে-শিল্পে মনোযোগ আসিতে পারে। এইরূপ একটা transition অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে। কার্ত্তিকের ভারতবর্ষে তাঁহার রচিত একটি গান একথার অনুমোদন করিবে।

> "মোর আঙিনায় আবার যখন
> আসবে ওরা খবর নিতে
> বনের পাখী করবে যখন
> কলগীতে।"

"করবে" সকর্ম্মক ক্রিয়া হইলে শুধু ক্রিয়াই আছে কর্ম্ম নাই। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "মশাই বনের পাখীরা যে করবে, কি করবে ?" উত্তর দেওয়া কঠিন। ভৈরবীতে গান করা যায়, রেলগাড়িতে ভ্রমণ করা যায়, কিন্তু কলগীতে কি করা যায় ? অবশ্য মত্ত হওয়া যায়। কিন্তু সেটা চিত্রকরের অভিপ্রেত নহে। ডি. এল. রায়কে একটু improve করিয়া বনবিহারীবাবু একদা বলিয়াছিলেন—"জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ।" সাহিত্য ক্ষেত্রে ইহাই শেষ কথা।

—

THE VEDANTA—Its Morphology and Ontology (A lecture delivered on the 27th August 1933 at the Saraswat Assembly Hall of Sree Gaudiya Math Calcutta) by Paramahansa Paribrajakacharyya (108) Sree Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, President, Shree Vishwa Vaishnava Raj Sabha.

এই মূল্যবান পুস্তকখানি আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বক্তা বলেন—

Dear Friends,

I stand before you as a teller. I am going to tell you now a few words more on the Vedanta and specially its ontological aspect, morphology being a former changeable part of the same. My telling craves a reciprocity of your listening to my sound through your aural reception.........

—

আর এক জায়গায় বলেন—

The mundane morphological march need not be considered identical with the transcendental morphology which cannot in any case show its transciency ar d altering phases.

—

কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে তাহা এই—

The mensuration of osculatory improprieties as reverberated in adumbrated auditoria by valetudinarian members of the maternal sex can be stupendously experienced by Locadaisical listeners in stupefying inaction; but cannot be retaliated upon by those impoverished mental caricatures. OM.

—

জনৈক বন্ধু সেদিন একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন—এবং বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার অর্থ কি ?

স্বপ্নটি এই—

তিনি কলিকাতার পথে চলিতে চলিতে দেখিলেন একটা দেওয়ালে লেখা আছে—

চ্যারিটি ! চ্যারিটি !!

কতিপয় বেকার যুবককে নৃত্য-গীত এবং কবিতা লেখা শিখাইবার জন্য চীন দেশে প্রেরণ করা হইবে—এই উপলক্ষ্যে বটানিক্যাল গার্ডেনে অপূর্ব্ব ক্রীড়া কৌশল দেখাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে—দর্শনী নাম মাত্র।

প্রোগ্রাম—

১। রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বসমক্ষে বারোটী লোহার পেরেক এবং দুইটি জীবন্ত কৈ মৎস্য ভক্ষণ করিবেন।

২। শরৎচন্দ্র রঙীন আলপাকা সাড়ী পরিয়া সাগর নৃত্য দেখাইবেন এবং রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে তবলায় সঙ্গত করিবেন।

৩। স্যার পি. সি. রায় ১০০ ফীট উচ্চে তারের উপর দুই হাত মুক্ত রাখিয়া বাইসাইকেল চালাইবেন।

—

বন্ধুবর স্বপ্নটির একটি অর্থও করিয়াছেন। তিনি বলেন—“পপুলার হইবার জন্য জাতিগত সাধনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ পি. সি. রায় প্রভৃতিকে এখন পপুলার হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে—স্বপ্নে এই কথাটাই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।”—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বন্ধুবর ফস্‌ করিয়া একখানা কাগজ বাহির করিয়া আমাদের সামনে ধরিলেন। আমরা বলিলাম, স্বপ্নের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই। বন্ধুবর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

—

তিনি উত্তেজিত হইয়াই বলিতে লাগিলেন—নুন তেল চাল ডাল বেচিতে বেচিতেও দোকানদার যাহাতে বই কিনিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে সেইটি হিসাব করিয়া বসুমতী বিজ্ঞাপন লেখেন। ইহাই ত পপুলার সাহিত্যের লক্ষণ। কিন্তু লজ্জা ত্যাগ না করিতে পারিলে পপুলার হওয়া যায় না—সেইজন্য আমাদের দেশের লেখকগণ পেটে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু হে বাংলার গ্রন্থকার গ্রন্থকর্ত্রীগণ—তোমরা এবিষয়ে শ্রীসীতা দেবীকে অনুসরণ কর। তাঁহার বিজ্ঞাপনটিতে মাত্র সাতটি আশ্চর্য্যবোধক চিহ্ন আছে—তোমরা সাতাশটি লাগাও, দেখিবে বই বিক্রি না হইয়া যায় কোথায়!

"স্বল্পশিক্ষিতা বালিকা গ্রাম্য-বধূর উপর শ্বশ্রূ, ননন্দা, স্বামীর অমানুষিক অত্যাচার—অসহায়া বালিকার পিতৃগৃহে পলায়ন—পিতার যত্নে সুশিক্ষা লাভ—পঞ্চশরের অলক্ষ্য শর-সন্ধান—নীরব, বুক ফাটা, ফোটে-ফোটে না প্রেম—অবাঞ্ছনীয় দাম্পত্যসম্বন্ধ হইতে নিষ্কৃতি লাভের আকুল প্রয়াস। অবশেষে ভগবানের নির্ম্মম নিষ্ঠুর-কুলীশ-কঠোর দান—বন্যার কল্যাণে মুক্তি!!! উত্তাল-তরঙ্গময় সমুদ্রবৎ নদীগর্ভে মুক্তি!!!

—

ইহার উত্তরে আমাদের কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়াই বন্ধুবর উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া গেলেন—দূর হইতে শুনিতে পাইলাম—রহস্যের পিরামিড্!! বিস্ময়ের লাভা প্রবাহ!!! ইত্যাদি ইত্যাদি।

—

অর্চ্চনার 'প্রশান্তের প্রেমে'র শেষের দিকে একটি খবর আছে ঃ—

তুমি কি যে বল সুধীর দা! দুঃখে আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে…তুমি আমার এ সবের কি জানবে? কারো সঙ্গে ত কোনদিন প্রেম করনি; এর যে কি যাতনা তা তুমি বুঝতে পারবে না। এর মর্ম্ম কিছু জানে অবতার বসু। পারি তো ওকে একদিন এখানে নিয়ে আসব—শুনবে, এই রকম হতাশ হ'য়ে ও আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করতে গেছলো!

আমরা একটি মহিলা সম্বন্ধে এইরকম একটি গুজব শুনিয়াছিলাম—

কিন্তু তিনি আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়াই আছেন। আধুনিক প্রেমিক প্রেমিকার পক্ষে বিস্তর আড়ম্বর করিয়া আত্মহত্যা করিতে যাওয়া, আত্মহত্যা না করা, এবং কোনো রকমে খবরটা পাঁচজনকে জানাইয়া দেওয়াই একমাত্র কাজ। ইহাতে নাকি কিছু সুবিধা করিয়া লওয়া যায়। কোনো তরুণ-প্রেমিক আড়াই পয়সার কবিরাজি মোদক, তাহার prospective প্রণয়িনীর সামনে খাইয়া যদি বলে আফিং খাইলাম তাহা হইলে নাকি অনেকখানি প্রাথমিক অনুরোধ-উপরোধ এবং ধন্না দেওয়া প্রভৃতি অধ্যবসায়মূলক অবস্থাগুলিকে এক লাফে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়।

—

সেদিন একটি গল্প পড়িতেছিলাম—

> একজন লোক ব্রিজের উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল। আর একটি লোক সেই পথে যাইতে তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল—দাদা, কাজটি গর্হিত হইতেছে—আপনি আমার কথা শুনুন, আমি আপনার মনের বোঝা নামাইয়া দিতেছি। তাহারা একটু দূরে বসিয়া নানারূপ আলাপ-আলোচনা করিল। আধঘণ্টা পরে দেখা গেল—দুই জনেই আত্মহত্যা করিবার জন্য ব্রিজের উপর হইতে লাফ দিতেছে।

—

ইহাতে দেখা যায়, যথারীতি উস্কাইয়া দিতে পারিলে প্রত্যেকের মনেই আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জাগিতে পারে। কিন্তু অবতার বসুর আত্মহত্যার চেষ্টা, নিতান্ত থিয়েটারি চেষ্টা—উহা বিজ্ঞাপন দিবার চেষ্টা—প্রেম করিতে গিয়া আবেদন-নিবেদনের পালাকে ফাঁকি দিয়া অতিক্রম করিয়া যাইবার চেষ্টা। ইহার কোনো বিশেষত্ব নাই—ইহা মেয়েদের আত্মহত্যার ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র—এবং ইহার শেষ ফল সাজ্ঘাতিক। কে জানে হয়ত এই অবতার বসু এখন তরুণ সাহিত্যিক সাজিয়া, যাহাদের জন্য আত্মহত্যার অভিনয় করিয়াছিল, সেই সব বাংলাদেশের মেয়েদের মান ইজ্জত নষ্ট করিতেছে।

"কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই প্রকৃতিদত্ত কামশক্তি (sex energy) মানবের মধ্যে এতই প্রভূত ও প্রচুর যে, বংশরক্ষা কার্য্যে ও সন্ততির সৌকর্য্যেই উহা নিঃশেষিত হয় না। উহার যে surplus বা অতিরেক থাকে, আমরা প্রায়শঃ তাহার অপব্যবহার করি।" শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ("পরিচয়")

"মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবন তোমার
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার,
আজি আর ফিরিবেনা শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে॥"

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত ("উত্তরা")

চিঠি

আশ্বিন সংখ্যা ভারতবর্ষের প্রথম প্রবন্ধ "তেনাহং কিং" ; লেখক (সম্ভবতঃ মেটালিস্কীয়) শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

৪৯৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিতেছেন, "আলো নিবিয়ে দিয়ে উত্তরের পুষ্পিত মাধবীলতা-ঘেরা বাতায়নের মাঝ দিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল আর ধ্রুব-লোকের দিকে চেয়ে রইলাম। * * * নিশ্চিন্ত হও সেজদা ও আমার কালকের মধ্য-রাতের কথা। আজ এই সূর্য্যালোকিত শরৎ-মধ্যাহ্নের সুনীল আকাশের পানে চেয়ে কালকের সেই অবস্থার কথা যেন স্বপ্নের মতই লাগছে।" উত্তম। কিন্তু লেখককে প্রশ্ন করিতে পারি কি শরৎকালের মধ্যরাত্রে তিনি আকাশলোকের কোন স্থানে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাক্ষাৎ পাইলেন? শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কয়েক মাস কাল সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major) কে ভারতবর্ষে থাকিয়া মধ্যরাত্রে কোন মতেই দেখা সম্ভবপর নহে। উত্তর নরওয়েতেও এখন চিরগ্রীষ্ম নয়ত বুঝিতাম সেখান হইতেই রায় মহাশয় তার বা বেতার যোগে এই প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ' আফিসে প্রেরণ করিয়াছেন। দেখিতেছি তিনি নক্ষত্রের অবস্থান সম্বন্ধে অতি সাধারণ তথ্যও অবগত নহেন। শ্রীসুব্রতকুমার চৌধুরী

প্রাপ্তি স্বীকার ও অভিমত

বাংলা দেশে চিনি—আলিপুর বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস হইতে মিঃ সি-আর ব্যাটার্সবি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বিনামূল্যে বিতরিত। ইক্ষুর ইতিহাস ও বাংলা দেশের চিনির উৎপাদনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে এই পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

ভদ্রলোকদিগকে জমী বিলি—প্রকাশক ঐ। বেকার সমস্যা সমাধানেচ্ছুগণ এই বইখানি পড়িবেন। বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

MR. BURGE MURDERED—প্রকাশক ঐ। মেদিনীপুরের নৃশংস ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা সম্বন্ধে দেশের সকল শ্রেণীর সাময়িকপত্র যে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই বইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। দেশের কল্যাণের জন্য ইহার বহুল প্রচার প্রয়োজন।

নারীহরণের প্রতিকার—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী প্রণীত (শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা সহ)। গ্রাম তুহালিয়া, পোঃ আঃ তুয়ার বাজার, জিলা শ্রীহট্ট, গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। মূল্য আট আনা।

বাংলাদেশের প্রত্যেক নরনারীর অবশ্যপাঠ্য। উদাসীন বাংলাদেশের যুবকগণ নারীহরণের প্রতিকার চিন্তা করুন। নারীদেরও কর্ত্তব্য এবিষয়ে অল্প নহে।

ফুলকলি—শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত শিশুপাঠ্য কবিতার বই। প্রকাশক ডাঃ শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কামালকাচনা,

নবাবগঞ্জ, রংপুর। মূল্য চারি আনা। কবির ছন্দ সম্বন্ধে সংযম থাকিলে কবিতাগুলি সুপাঠ্য হইত। অনেকগুলি কবিতা ভাল।

THE HINDU MISSION—উক্ত নামীয় একখানি প্যাম্ফলেট-এর প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। হিন্দুমিশনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বঙ্গ-বিহার আসামের সেন্সাস্ সুপারিটেণ্ডের অভিমত এই প্যাম্ফলেটে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা ইঁহাদের কার্য্যাবলীর পরিচয় লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৫-সি, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪র্থ সংখ্যা] মাঘ, ১৩৪১ [৭ম বর্ষ

কাজের স্বরূপ

আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দৈন্য ইহা নয় যে, অনেক বিষয়ে পৃথিবীর অনেক জাতি অপেক্ষা আমরা বহু পশ্চাদ্বর্ত্তী, অথবা ধন-সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—তুলনায় আমাদের নাই বলিলেই হয়। আমাদের মধ্যে যে পৌর-চেতনা আজও সম্যক জাগ্রত হয় নাই; সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা যে জাতি হিসাবে আজও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই, আমাদের সকল দৈন্যের মধ্যে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় দৈন্য। এবং আমাদের অন্য সকল দুঃখ দূর করিবার ফলে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হিতকর কার্য্য হইতেছে, বিভিন্ন উপায়ে আমাদের গতানুগতিক জীবন-যাত্রাকে আঘাত করিয়া, চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া আমাদের মধ্যে সার্ব্বজনীন ভাবকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করা। বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে অগ্রগতির যে

সকল লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে, উত্তেজনার মধ্য দিয়াই তাহা জন্মলাভ করিয়াছে, এবং তাহাই আবার অধিকতর ও ব্যাপকতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রসারিত করিতেছে।

এই কথাটা বিশেষভাবে সত্য হইলেও,—সাধারণতঃ এই সত্যটা আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় বলিয়া, কোন প্রকার উত্তেজনা বা 'হুজুগ'কে কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে এবং তাহার যতটুকু কাজের মধ্যে রূপ গ্রহণ করে, তুলনায় তাহাকে অনেক অধিক মূল্য দিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি,—যদিও ইহার প্রথম অংশটাই প্রধান এবং এই অংশ বর্জ্জিত হইলে দ্বিতীয় অংশ প্রাণ ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের স্বদেশী আন্দোলনকে গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার বিপুল উন্মাদনাকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের বুদ্ধিমান ও কাজের লোকেরা বরাবরই বলিয়াছেন, হুজুগ যথেষ্ট হইতেছে কিন্তু কাজের কাজ কই? অর্থাৎ কাজের কাজ বলিতে ইঁহারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, চরকা, তাঁত, মিল, কারখানা, কৃষিক্ষেত্র, জাতীয় বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা। এ সকল প্রতিষ্ঠার যে প্রয়োজন নাই, অথবা ইহাতে দেশের কোন উপকার হইবে না এমন কথা বলা লেখকের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু আপেক্ষিক মূল্যের কথা ভুলিলে চলিবে না। ইহার ফলে আর্থিক বা অন্যবিধ জাগতিক লাভ যতটা হয়, তদপেক্ষা ইহাকে অবলম্বন করিয়া যে সামাজিক জীবন গঠিত ও দৃঢ়ীভূত হয় তাহার মূল্য কম নহে। যাঁহারা এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁহারা যদি হুজুগের অংশটা বাদ দিয়া তাঁহাদের শক্তি ও উদ্যম দুই একটি মিল বা ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে, তাহাতে দেশের কতটা

উপকার হইত, এবং ইহাতে প্রস্তুত জিনিসের চাহিদাই বা কি পরিমাণ থকিত, তাহা ভাবিয়া দেখিবার।

এই আন্দোলন আমাদের মধ্যে যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের সকলেরই যে দেশের প্রতি কিছু কর্ত্তব্য আছে আমাদের অনেককে এই বুদ্ধি দিয়াছে। দেশের বহুলোকের এই মন ও বুদ্ধির ঐক্যই আমাদের জাতীয় জীবন। কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদিও এই জাতীয় জীবন সংঘবদ্ধ হইয়া উঠে না, তবুও এই বুদ্ধি ও মনের ঐক্য নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া নানা উদ্দেশ্যে লোককে ঐক্যবদ্ধ করে। এই সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার শক্তিই ইহার বড় দান। আমাদের বহুলোকের মধ্যে যে স্বদেশী জিনিস কিনিবার, দেশের অন্য নানা কার্য্য করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, দলবদ্ধ ও বিচ্ছিন্নভাবে নানা কাজ করিবার যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে ইহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় জীবনে শক্তি সঞ্চারের প্রমাণ দিতেছে।

সব সময়েই সকল নূতন কর্ম্ম ও প্রচেষ্টার পুরোবর্ত্তী থাকে নূতন চিন্তা ও নূতন ভাব। এইজন্য যখনই ব্যাপক ভাবে আমরা কোন কাজ করিতে চাই, তখনই তাহার জন্য প্রচার আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ গণজীবন দেশে না থাকিলে, এই প্রচার বিশেষ দুঃসাধ্য হইয়া উঠে এবং তাহার কর্ম্মে রূপ গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না বলিলেও চলে। অন্যদিকে, সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল গণজীবন থাকিলে ভাব প্রচার এবং তদনুযায়ী কর্ম্মের প্রসার অনেক সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশে গণজীবন নাই বলিয়া কোন চিন্তা ও ভাব দেশের মধ্যে সমাজের সর্ব্বস্তরে বিস্তার লাভ করিতে পারে না; নূতন ভাবকে

মুক্তি দিবার জন্যে নূতন কর্ম্মক্ষেত্র কদাচিৎ গড়িয়া উঠে। শুধু মাত্র যে সকল ভাব লোকের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে পারে, অর্থাৎ যাহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য গণজীবন কতকটা সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, সেই সকল ভাবই জনসাধারণের কতকাংশের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। নানা নূতন চিন্তা ও ভাব দেশের মধ্যে প্রচারিত হইয়া এবং তাহার ফলে দেশের প্রায় সর্ব্বত্র নানা কর্ম্ম-প্রচেষ্টার উদ্ভব হইতেছে বলিয়া আমাদের যতটা উপকার হইয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী উপকার হইয়াছে এই সকল ভাবের আঘাতে দেশের মধ্যে যে উন্মাদনার সঞ্চার হইয়াছে, এবং তাহাতে আমাদের গণজীবন যে অনেকটা দানা বাঁধিয়াছে, সেই দিক দিয়া। আমাদের রাজনীতিক আন্দোলনগুলি দেশকে অন্য কিছু সুফল দান যদি নাও করিয়া থাকে, তাহা হইলেও, একথা অস্বীকার করা যাইবে না যে দেশের বহুসংখ্যক লোকের মনে ইহা রাজনৈতিক চেতনা জাগাইয়াছে। কিন্তু এই রাজনীতিজ্ঞ-চেতনাকে একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকতর প্রসারিত ও সংহত গণ-জীবনকেই আমরা বর্দ্ধিত রাজনীতিক চেতনার আখ্যা দিতেছি। খুব বেশীর ভাগ লোকেরই, দেশ, দেশের ভবিষ্যৎ, কোন বিশেষ রাষ্ট্রিক আদর্শ, বিশেষ কোন কর্ম্ম বা কর্ম্মপদ্ধতি এবং তাহার ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। আদর্শের পরিবর্দ্ধন হইয়াছে, কর্ম্মপদ্ধতি বদলাইয়াছে কিন্তু তাহা আমাদের বিশেষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহা বিশেষ কোন চেতনাকে না জাগাইয়া যে আমাদের মধ্যে গণজীবনই গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রধান প্রমাণ ইহার ফলে সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের মনে এক প্রকার উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জন্মে নাই। কেহ চাহিয়াছে নিজেদের অসম্মানের অবস্থা দূর করিতে, কেহ চাহিয়াছে আর্থিক

উন্নতি, কেহ চাহিয়াছে রাষ্ট্র-পরিচালনায় বর্দ্ধিত অধিকার, কেহ চাহিয়াছে শিক্ষা, কেহ চাহিয়াছে ঋণমুক্তি, কেহ চাহিয়াছে শ্রমের হ্রাস ও বেতন বৃদ্ধি; এই সংখ্যাতীত দাবী। রাজনীতিক আন্দোলন ব্যতীত এ সকলের পশ্চাতে আরও বহুবিধ কারণের সমবায় রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সকলেরই প্রধান উপকার হইতেছে যে, ইহারা আমাদের মধ্যে গণজীবনের সাড়া আনিয়াছে। দেশের মধ্যে গণ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়াই, যাহাদের যে দুঃখ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার চেষ্টা দেখা দিয়াছে।

যে সকল স্বাধীন জাতির মধ্যে গণজীবন বিশেষ সুগঠিত ও সমুন্নত, তাহাদের পক্ষেও, যুদ্ধ প্রভৃতি কোন কাজের জন্য বিশেষ প্রকার ত্যাগ ও সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া গণজীবনকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া লইতে হয়। এই উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে না পারিলে দলে দলে লোক কখনই নানা প্রকার দুঃখ এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিতে কখনই অগ্রসর হয় না। অবশ্য যাহাদের সুগঠিত গণজীবন আছে, তাহাদের পক্ষে এই কাজ অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ।

আমাদের চক্ষের সম্মুখে কংগ্রেসের আন্দোলনের ন্যায় দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। ইহার গতি লক্ষ্য করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, এই আন্দোলন দেশকে যাহা দিয়াছে উত্তেজনার মধ্য দিয়াই মাত্র তাহা দিতে পারিয়াছে। সংঘর্ষের মধ্য দিয়া যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, কংগ্রেস কর্ম্মীরা হৈ হৈ করিয়া দেশের লোকের মনে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহাদের আপাত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন জটলা দ্বারা আমাদের নিরুপদ্রব পারিবারিক জীবনের প্রান্তে যে আঘাত লাগিয়াছিল, এই আন্দোলনের গঠনমূলক কাজ অপেক্ষা

আমাদের জাতীয় জীবনের উপর তাহার প্রভাব গভীরতর। এই আন্দোলনের ফলে আমাদের সাধারণের মধ্যে যে রাজনীতিক চেতনা জাগিয়াছে তাহা ব্যতীত, দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টিও করিয়াছে। চিনি এবং বস্ত্রের ব্যবসায়ে আমরা ইতি-মধ্যেই অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি। ছোট খাটো অন্য নানা প্রকার শিল্পেও হাত দিয়া আমরা আংশিক সফলতা লাভ করিতেছি। গত আন্দোল-নের উত্তেজনার মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে যে পৌর-চেতনা ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়াছে, তাহার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তকেরা উত্তেজনা সৃষ্টিকে অকাজ মনে করিয়া যদি আদর্শ স্থাপনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিতেন, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উদ্যম করিয়া দুই একটি কাপড়ের কল স্থাপন করিতেন, নিজেরা চরকা কাটিতেন, বা চিনি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেন এবং শুধুমাত্র এই সকল কথা শান্ত ভাবে প্রচার করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য সমাপন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের চেষ্টা সরকারি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হইত না। আরও বহুদিন ধরিয়া নানা উপায়ে সমাজের সর্ব্বস্তরে আঘাত পৌছাইয়া দিতে পারিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন মত ও চিন্তা সকলের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া সহজ হইবে এবং কর্ম্মে তাহারা রূপ পরিগ্রহ করিবে।

হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টার ফলে এই দুষ্ট প্রথার মূল অনেক শিথিল হইয়াছে। অস্পৃশ্যতার অনিষ্ট-কারিতার কথা, হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকেই বহুপূর্ব্বে বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের মত প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, অনুন্নতদের উন্নতির জন্যও অল্পবিস্তর চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু, কার্য্য তাহাতে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। এই উপলক্ষে মহাত্মাজীর

জন্য দেশব্যাপী যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহাতেই সুফল পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, (এবং সে অনুযায়ী কিছু কিছু কাজও হইয়াছে) অনুন্নতদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সদাচার শিক্ষা দিতে হইবে, এবং এইরূপে সামাজিক বৈষম্য দূর হইবে। শিক্ষাদান প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু, অস্পৃশ্যতা দূর করিবার সহিত তাহার সম্পর্ক কতটা তাহাই বিশেষভাবে বিবেচ্য। এই কথা বরং বলা যাইতে পারে, অস্পৃশ্যতা দূর হইলে শিক্ষাদান ও অন্যান্য উন্নতির ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজে করা যাইবে। সাফল্য লাভের জন্য আঘাতের পর আঘাতই দিতে হইবে ; অতীতেও মাত্র ইহার মধ্য দিয়াই সুফল পাওয়া গিয়াছে।

প্রাত্যহিক জীবনের সহজ মৃদু গতির মধ্যে যে অভ্যাস ও সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব হয় নাই, উত্তেজনার মুহূর্ত্তে সহজেই তাহা ডিঙাইয়া যাওয়া গিয়াছে এবং জাগ্রত গণ-জীবন জাতীয় মঙ্গলের কাছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও শ্রেণীগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এই আঘাতের ফলে অনুন্নতের মধ্যে যে সমষ্টির চেতনা জাগিয়াছে, অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে নিজেদের দুর্দ্দশার প্রতি লক্ষ্য পড়িয়াছে, তাহাই তাঁহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিবে এবং নিজেদের মর্য্যাদা ও অধিকার পূর্ণমাত্রায় আদায় করিয়া লইবার শক্তি দিবে। এই উৎসাহের ফলে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষালাভের অন্যবিধ উন্নতির ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে এবং অন্যদিকে আবার এই উৎসাহেরই ফলে, বহু আত্মত্যাগী এই শ্রেণীর লোকের সেবা ও মঙ্গল সাধনের জন্য আত্মনিয়োগ করিবেন এবং এই কার্য্যকে ক্রমেই অগ্রসর করিয়া দিবেন।

এইরূপ যে কোন আন্দোলনের দৃষ্টান্তই আমরা গ্রহণ করি না কেন,

সেখানেই দেখিতে পাইব, উত্তেজনা, চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়াই কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে। ইহারই আবর্ত্তে পড়িয়া যদিও নানা প্রতিষ্ঠান ও প্রচেষ্টার উৎপত্তি হয়, তবু তাহার স্থান জাতির সম্মুখে পদক্ষেপের পক্ষে নিতান্তই গৌণ। তাহারও আবার প্রধান কার্য্য হইতেছে গতানুগতিক জীবন যাত্রাকে আঘাত দান। কাজেই, যাঁহারা কার্য্যের নগদ ফলাফল পরিমাপ করিয়া, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন, এবং আপাত ফলপ্রসূ কার্য্যের নির্দ্দেশ দিবেন, তাঁহারা মূল নীতিতেই ভুল করিবেন। অন্যান্য দেশেরও যে কোন ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিলেও এই একই প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

শুধুমাত্র কাজের দৃষ্টান্তের দ্বারা যে লোককে কাজে উদ্বুদ্ধ করা যাইবে না, পক্ষান্তরে, উপযুক্ত মনোভাব সৃষ্টিদ্বারা যে লোককে কাজে প্রবৃত্ত করান যাইতে পারে ও সেই কাজ রক্ষা করিবার মত উৎসাহ ও শক্তি যে তাহারা তাহাতে লাভ করিতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য ছোট একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করা যাক। আমাদের পল্লীজীবনের পক্ষে ভাল রাস্তার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, শুধু যাতায়াতের সুবিধার জন্য, অথবা কিছু আরাম ভোগ করিবার জন্য নহে (যদিও সে কারণ দুর্ব্বল নহে) অন্যস্থানে উৎপন্ন দ্রব্য যাহাতে সহজে সকল পল্লীতে প্রবেশ করিতে পারে, পল্লীতে উৎপন্ন জিনিষ যাহাতে সহজে বাজারে উঠিতে পারে, বিভিন্ন পল্লীর মধ্যে যাহাতে যোগাযোগ কতকটা সহজ হয়, তাহার জন্যও ভাল এবং সুগম্য রাস্তা অপরিহার্য্য। কিন্তু, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, যদি কেহ কোন কোন পল্লীতে দুই চারিটা রাস্তা বাঁধাইয়া দেন এবং ইহার উপযোগিতার কথা প্রচার করিতে থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইবার সম্ভাবনা বিশেষ

কম থাকিবে। ইহাতে পল্লীবাসীদের মধ্যে নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য উদ্যম দেখা দিবে না, এমন কি প্রস্তুত রাস্তাগুলিও রক্ষা করিবার উদ্যম থাকিবে না। কারণ ইহার জন্য যে দলবদ্ধতার প্রয়োজন, তাহা না গড়িয়া উঠা পর্য্যন্ত ফললাভের আশা অনেকটা মিথ্যা। অপর পক্ষে যিনি রাস্তা বাঁধাইবার চেষ্টাকে লক্ষ্য স্বরূপ ব্যবহার না করিয়া পল্লীবাসীদের মধ্যে গণজীবন গড়িয়া তুলিবার উপলক্ষ্য হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করিবেন, তিনি যদি তাঁহার শেষোক্ত উদ্দেশ্যে সফল হন তবে, তাহার ফলে পল্লীবাসীদের মধ্যে যে শুধু রাস্তা বাঁধাইবার উদ্যম দেখা দিবে তাহা নহে, ইহারা নিজেদের অন্য সকল কষ্ট দূর করিবার জন্যও সচেষ্ট হইবে।

মানুষের যত প্রকার দুঃখ কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহার সবগুলিই আমাদের আছে। রাষ্ট্রে আমরা পরমুখাপেক্ষী, সমাজ আমাদের মৃত, অধিকাংশ লোক আমাদের নিরক্ষর; অকাল মৃত্যু, রোগ-প্রবণতা, স্বাস্থ্যহীনতা, প্রভৃতিতে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে আমরা সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী; আমাদের অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, অর্থ, এমন কি পানীয় জল পর্য্যন্ত নাই; বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও রোগের কবলে আমরা অসহায় ভাবে আত্মসমর্পন করি। কিন্তু, এ সকলের জন্য আমাদের চরিত্রের কোন্ বিশেষ দুর্ব্বলতাকে দায়ী করা যাইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়।

ভারতীয়দের মধ্যে কোনদিন বীরত্ব, শৌর্য্যবীর্য্য, ত্যাগ বা দেশ-প্রেমের অভাব ঘটে নাই। বিজয়ী দেশগুলির জনশক্তি ভারতের তুলনায় অতি সামান্যই ছিল। তবুও কিন্তু, আমরা পরাধীন হইয়াছি। ইহার প্রধান কারণ, দেশের গণশক্তি নিদ্রিত ছিল; রাজ্য হস্তান্তরিত হইয়াছে, দেশের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছে কিন্তু, দেশের জনসাধারণ সর্ব্বাবস্থাতেই নির্ব্বিকার রহিয়াছে। অবশ্য এরূপ ঘটনায় দেশের

লোক দুঃখ পায় নাই, অথবা তাহারা দুঃখ এবং নির্য্যাতন ভোগ করে নাই, এরূপ বলিলে হয়ত অন্যায় হইবে। কিন্তু, ইহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ইহাদের ছিল না এবং কোন প্রকার গণজীবন না থাকায়, বহু একের ইচ্ছা মিলিত হইয়া কার্য্যকরী হইবারও সুযোগ ছিল না। ঐতিহাসিক যুগে তদানীন্তন বৈদেশিক রাজশক্তির বিরুদ্ধে, যে সকল অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাহাতেও জনসাধারণের যোগ ছিল না, অথবা সে সকল জনসাধারণের ইচ্ছা বা চেষ্টাপ্রসূত ছিল না। এইজন্য এ সকল প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে এবং স্থায়ী হইতে পারে নাই। যে সকল লোক ও লোকসমষ্টির রাজ্য বা প্রভুত্বের লোভ-মিশ্রিত দেশপ্রেম অথবা হৃত বংশ-গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা ইহার পশ্চাতে ছিল, তাঁহাদের ভুল, পরাজয়, ক্ষমতালোপ বা তিরোভাবের সহিত এই সকল প্রচেষ্টারও শেষ হইয়াছে।

বর্ত্তমানেও আমরা দেখিতে পাই, পরাধীনতা—আমাদিগকে কি দুঃখ দিতেছে, ইহার অবসান হইলে আমাদের কি লাভ হইবে, কোন্ পন্থায় কি কার্য্য করিতে পারিলে আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া আসিতে পারে সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলেও, পরাধীনতা যে বাঞ্ছনীয় অবস্থা নয়, এ জ্ঞান দেশের অধিকাংশ লোকের আছে। কিন্তু গণ-জীবন না থাকায় এই ইচ্ছা শক্তি সঞ্চয় করিয়া আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে নাই। বিশেষ কর্ম্মপন্থা যখন নির্দ্দিষ্ট হইল, দেশের একাংশ যখন তাহা লইয়া ভাবের বন্যাস্রোতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল, দেশের উপর দিয়া নিষ্পেষণের চক্র চলিল, দেশের অধিকাংশ লোক তখন অপেক্ষাকৃত শান্তচিত্তে দূরে দাঁড়াইয়া এই বিক্ষোভ দর্শন করিল। দেশের জনসাধারণের মধ্যে তেজস্বিতা, মর্য্যাদাবোধ এবং

শৌর্য্যের অভাব যে নাই, ইহারা যে ত্যাগ করিতে, বিঘ্ন-বিপদের সম্মুখীন হইতে, মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে, মর্য্যাদা রক্ষার জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে, মৃত্যু বরণ করিতে, স্ত্রীপুত্র, অর্থের মায়া কাটাইতে পারে, তাহার প্রমাণ আমরা ইহাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের প্রাত্যহিক বহু দৃষ্টান্তের মধ্যেই পাইতে পারি। কিন্তু, তাহা হইলেও, স্বাধীনতা আন্দোলনে ইহারা যোগ দিতে পারিল না কেন, তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিবার।

স্বাধীনতা লাভে যে ইহাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ঘুচিতে পারে, দেশের প্রতি তাহাদের যে কর্ত্তব্য আছে, স্বাধীনতা লাভ না হইলে যে কোন প্রকার উন্নতি লাভ সম্ভব নহে, যাঁহারা এই কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কোন সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিলনা, এসকল কথা ইহারা ভালভাবে বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া আন্দোলনকারী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহিত ইহারা কতকটা বিচ্ছিন্ন-যোগ হইয়া পড়িয়াছে এবং এইজন্যই যে এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহারা যোগ দিতে পারে নাই, একথা আংশিক সত্যমাত্র। ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, দেশের উপকার করিবার যে অস্পষ্ট এবং ক্ষীণ ইচ্ছা আছে বহু 'একেরই' সেই ইচ্ছা এবং মিলিত হইবার সুযোগ না থাকায় তাহা কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। মিলিত হইবার সুযোগ থাকিলে, সেই সম্মিলনের শক্তিই আবার প্রতি ব্যক্তিকে প্রভাবিত ও প্রবুদ্ধ করিত এবং তাহাই আবার সম্মিলনের শক্তিকে বাড়াইত, এবং এইরূপে কার্য্য ও কারণ উভয়ই উভয়কে শক্তিশালী করিয়া জাতীয় উন্নতির কাজে বিশেষ সহায় হইতে পারিত।

যে সকল কথা বুঝিতে না পারায় ইহারা এই সকল আন্দোলনে

যোগ দিতে পারে নাই বলিয়া মনে করিবার কারণ হইয়াছে, বর্ত্তমানে ইহাদিগকে সে সব কথা কোন প্রকারে বুঝান যাইত না। ইহাদের শিক্ষা নাই বলিয়া বুঝান যাইত না, তাহা নহে। মধ্যবিত্তদের অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত অনেক লোক এই আন্দোলনের সমর্থন ও সাহায্যকারী ছিলেন, অথচ, ইহাদের সমস্থানীয় সাধারণ শ্রেণীভুক্ত লোকেরা ইহার সমর্থক হইতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ, এই সকল কথা বুদ্ধি দিয়া কোন প্রকারে নেওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব না হইলেও, ইহাকে আপনার করিয়া লইবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা হইতেছে গণজীবনের প্রেরণা। রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভ হইলে সকল প্রকার দুঃখ দূর হইবে, এই বিশ্বাস থাকিলে এবং যাঁহারা এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ছিলেন তাঁহাদের উপর আস্থা থাকিলেও যে ইহারা এই আন্দোলনে যোগদান করিতে পারিত না তাহার প্রমাণ, ইহাদের নিজেদের নিতান্ত প্রত্যক্ষ যে সকল দুঃখ দুর্দ্দশা আছে, তাহার প্রতিবিধানেও ইহারা সচেষ্ট হইতে পারেন না—এই সকল দুঃখ দূর করিবার জন্য যে সকল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাদের সমর্থন ও সহযোগিতার অভাবে তাহা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিতেছে না। নানা আঘাতে এবং নানা কারণের সম্মিলনে যাঁহাদের মধ্যে গণজীবন পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই শ্রেণীর লোকই ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। অবশ্য এই আন্দোলনই আবার গণজীবন সম্বন্ধে ইহাদিগকে বিশেষ ভাবে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের এই অতি সচেতন গণজীবনই সমগ্র দেশে সমষ্টি জীবন গড়িয়া তুলিবার পক্ষে সহায়তা করিবে। ইহাদেরই বহু সংখ্যক লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অনুন্নতদের সংঘবদ্ধ করিবার কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। এবং ইহারা কতকটা অনুকূল ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবেন। কেননা, এই আন্দোলন,

সমাজের নিম্নস্তরে ব্যাপ্তিলাভ করিতে না পারিলেও সম্পূর্ণভাবে কেহই ইহার প্রভাবের বাহিরে থাকিতে পারে নাই। কাজেই গণজীবন গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্র অনেকটা অনুকূল হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা এই কার্য্যে অবতীর্ণ হইবেন, সফলতার জন্য তাঁহাদিগকেও হৈ চৈ ও বহু ঘৃণিত হুজুগের আশ্রয় লইতে হইবে।

স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করা যে ভাল, এই সহজ কথাটা বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে আমাদের এতদিন লাগে নাই। কিন্তু, বহুসংখ্যক লোকের এই 'বুঝা' একত্রিত হইলে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তাহাই মাত্র আমাদিগকে কোন কাজ করিবার মত, বিশেষ কোন সংকল্প গ্রহণ করিবার মত দৃঢ়তা দিতে পারে। বর্ত্তমান আন্দোলন আমাদিগকে সেই দৃঢ়তা দান করিতে পারিয়াছে বলিয়াই, নানাবিধ শ্রমশিল্পের উদ্ভব এবং দেশে তাহার চাহিদা-সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে।

যদি কেহ আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশ স্বাদেশিকতার দিকে কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহার হিসাব লইবার জন্য, প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনের আওতায় কতগুলি এবং কি ধরণের শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, চরকায় কি পরিমান সূতা উৎপন্ন হইতেছে, বিদেশী দ্রব্যের আমদানি কি পরিমানে হ্রাস পাইয়াছে, অথবা আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে চান দেশে কত সংখ্যক মিলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাদের উৎপাদিত জিনিষের মূল্য, গুণ এবং কাট্‌তি বিদেশী জিনিষের তুলনায় কেমন তাহা হইলে একস্থানে তাঁহাদের বিশেষ ভুল হইবে। ইহার মধ্যে ভবিষ্যতের যে সম্ভাব্যতা নিহিত আছে তাহা হইতেই ইহার সফলতার সঠিক পরিমাপ পাওয়া যাইবে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে একদিন আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ চরকা ঘুরিত, হাজার হাজার তাঁতে বহু সংখ্যক তাঁতি দেশের

লোককে বস্ত্র যোগাইত এবং অন্যান্য প্রায় সর্ব্ব প্রকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যই আমাদের দেশে প্রস্তুত হইত। কিন্তু, সে সময়েও জাতি হিসাবে আমাদের অবস্থা উন্নত ছিলনা এবং তাহা দ্বারা আমরা রাজনীতিক স্বাধীনতা অথবা আর্থিক সমৃদ্ধি কোনটাই রক্ষা করিতে পারি নাই। কুটীর শিল্প থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা রাজনীতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি নাই; প্রতিযোগিতার সম্মুখে আমাদের দেশীয় শ্রমশিল্প কেন আত্মরক্ষা করিতে পারিল না; আবার কোন শক্তির বলে এবং কি আশায় আমরা আমাদের শ্রমশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার (যদিও প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইয়াছে) আশা করিতেছি; যে প্রতিষ্ঠিত শ্রমশিল্প আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহার পুনরুজ্জীবনের দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা কিরূপে হইবে; এ কথাগুলিও ভাবিয়া দেখা দরকার। আমাদের প্রত্যেকের ঘরে একদিন চরকা এবং অনেকের ঘরে তাঁত ছিল বটে, আমাদের ঘরে ঘরে একদিন গুড়, চিনি তৈয়ারী হইত তাহা সত্য, আমাদের নানাবিধ হস্তশিল্পের সূক্ষ্মতা এবং বিস্ময়কর নৈপুণ্য একদিন সমগ্র বিশ্বের ধনী ও আভিজাতদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু অপরের সংঘবদ্ধ প্রতিযোগিতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার মত সংঘশক্তি ভারতবাসীদের ছিল না। এ সকলই চলিত কারিগরদিগের প্রত্যেকের একক শক্তির দ্বারা; আর, আমরা এ সকল জিনিস কিনিতাম, হাতের কাছে ইহার চেয়ে সস্তা এবং ভাল জিনিস পাইতাম না বলিয়া। যখন আমরা সস্তা জিনিস পাইতে লাগিলাম, তখন ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া তাহা কিনিতে লাগিলাম। ইহাতে দেশের যে শেষ পর্য্যন্ত সমূহ অনিষ্ট হইবে, একথা হয়ত অনেকেই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু, এই

আশঙ্কাকে বহু লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার, এবং সংঘবদ্ধভাবে ইহার প্রতিকারকল্পে কিছু করিবার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া, কেহই ব্যক্তিগত সুবিধা ছাড়েন নাই এবং জাতীয় মঙ্গল সম্বন্ধে অসাড়তার এবং কোন সংঘবদ্ধ কার্য্য করিবার ক্ষমতার অভাবে ক্রমে দেশীয় শিল্পের বিনাশ হইয়াছে। শিল্পীরাও ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের প্রস্তুত মাল আর বাজারে বিকাইতেছে না, সস্তার প্রতিযোগিতায় তাঁহারা দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, অথচ তাহার প্রতিকারের উপায় তাঁহাদের হাতে নাই, তখন ক্রমে নিজ নিজ ব্যবসা ছাড়িয়া তাঁহারা কৃষি অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

বর্ত্তমানে, বাহিরের প্রতিযোগিতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে; সকল ক্ষেত্রে যে সকল জাতির সহিত আমাদিগকে প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত হইতে হইবে, তাহাদের সংঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই। আজ যদি মায়ামন্ত্রবলে কেহ পূর্ব্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেও তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষাও সহজে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। (অবশ্য 'হৈচৈ' দ্বারা যে লাভটুকু হইয়াছে, সেটুকু বাদ দিয়া ধরিতে হইবে।) আমাদিগকে এই কথাটাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, যে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার প্রথম আক্রমণেই আমাদিগকে হটিয়া আসিতে হইয়াছিল, তাহা যখন দেশের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে তখন তাহার সেই দৃঢ়মূল শক্তির বিরুদ্ধতা করিয়া আমরা কতকটা সাফল্য লাভ করিলাম কিরূপে। রাজনীতিক এবং অন্যান্য আন্দোলনের উন্মাদনা ও চাঞ্চল্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিক বিচ্ছিন্নতাকে আঘাত করিয়া আমাদিগকে কতকটা একতাবদ্ধ করিয়াছে এবং আমাদের এই আংশিক সংঘবদ্ধ

জীবনের সম্মিলিত ইচ্ছাই, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থের ক্ষতি করিয়াও দেশী জিনিস কিনিবার জন্য বহু লোককে মতি দিয়াছে, বহুলোককে পৃথকভাবে অথবা দলবদ্ধভাবে নানা প্রকার শ্রমশিল্পে আত্ম-নিয়োগের উৎসাহ দিয়াছে। ইহাতে জীবিকাসংস্থানের সহিত দেশের উপকার হইবে বলিয়া অর্থহীন দেশপ্রেমিক লোকদিগকে অপেক্ষাকৃত অল্প লাভে অধিক দিন কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া তাহাকে সফল করিয়া তুলিবার ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা এই স্বদেশী আন্দোলনই দান করিয়াছে। নূতন নূতন পথে যদি আমরা দেশকে আরও সমগ্রভাবে নাড়া দিতে পারি, এবং সেই চাঞ্চল্যের সুযোগে কাজ করিয়া আমাদের মধ্যে গণ-জীবনকে স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে, জাতিকে কোন বিশেষ পথে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ কোন কাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না।

জাতীয় জীবনের যে দিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করিনা কেন, সর্ব্বত্রই উহার সংখ্যাতীত দৃষ্টান্ত পাইব। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের যে কেনও স্থান নাই, তাহাদের উপর অনুষ্ঠিত এই অবিচার যে মনুষ্যত্ব ও জাতীয় মঙ্গল কোন দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা আমাদের প্রধান ব্যক্তিদের অনেকে অনেক দিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের উপর, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর উহার অনিষ্টকর প্রভাবের কথাও অনেকেই বুঝিতে পারিতেছিলেন। প্রথমে যাঁহারা একথা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহা প্রচার করিতে, আদর্শ দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নারীদের মধ্যে স্বাধীনতা অথবা শিক্ষা বিস্তার অতি সামান্যই হইয়াছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে বহু নারী যোগদান করায় এইদিক দিয়া সমাজের গায়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, এবং এই সকল

আন্দোলনের ফলে আমাদের গণজীবনের যে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে, তাহারই ফলে নারীদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা কতকটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।

আমাদের সকল কাজের সাফল্য নির্ভর করিতেছে, কাজের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের উপর। আমরা বর্ত্তমানে যাহাকে কাজ বলিয়া মনে করিতেছি। অর্থাৎ একটা না একটা কিছু খাড়া করা, কোন কিছু গড়িয়া তুলা এবং দেশের কাজ মনে করিয়া নিজেরা ব্যক্তিগত জীবনে চরকা কাটা, কার্পাসের চাষ করা, নিজেদের প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্যাদি নিজে বা নিজেরা করিয়া লইয়া স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করা প্রভৃতির দ্বারা বিশেষ কোন ফল পাওয়া যাইবে না। অবশ্য ফল যে কিছুই পাওয়া যাইবে না এমন নহে। এই সকল চেষ্টার মধ্য দিয়া দেশে যে সকল জিনিষ উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতে আর্থিক লাভ কিছু হইতে পারে; তাহা অপেক্ষা বড় লাভ হইবে যে গত আন্দোলনে সকলের মধ্য দিয়া আমাদের গণজীবন আজ পর্যন্ত যতটা প্রসারিত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত কাজসমূহে নিযুক্ত লোকেরা তাহাকে ধরিয়া রাখিবার কার্য্যে কতকটা সহায়তা করিবেন। নিজেদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোন স্বার্থ নাই, এমন কাজে লিপ্ত থাকিয়া, এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ ব্যতীত শুধু দেশের স্বার্থ আছে এমন অনেক কাজ করিয়া ইহারা জাতীয় জীবনকে সজীব রাখিবার কাজে সহায়তা করিবেন। ইঁহাদের কাজে অন্য বৃহত্তর লাভটিও হইবে; অর্থাৎ ইঁহাদের সকল কার্য্যের ফলাফল শুধুমাত্র কার্য্য-ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না; ইহা অন্য লোককে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেশের কথা, সমাজের কথা ভাবাইবে, নিজেদের পারিবারিক কর্ত্তব্যের বাহিরেও কর্ত্তব্য আছে, সে সম্বন্ধে চেতনা দান করিবে—যদিও খুব

বেশীদূর পর্য্যন্ত এই শেষোক্ত ফল ইহাদের কার্য্যের দ্বারা পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু, ইহার ফলাফল বিচারের সময় সর্ব্বদাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল কার্য্যের নগদ লাভের দিক অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ণিত পরোক্ষ লাভেরই মূল্য অনেক বেশী। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল কাজ সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে চাঞ্চল্য ও উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে এই সকল লাভের কারণ হইবে, সেই সকল কাজকেই বর্ত্তমানে দেশের পক্ষে অধিক ফলপ্রস্ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

যাঁহারা বলেন, বাঙালীরা ভাবপ্রবণ জাতি, শুধুই হুজুগ সৃষ্টি করিতে পারে—কাজের কাজ কিছুই করিতে পারে না, তাঁহাদের কথার উত্তরে এই বলিবার আছে যে বাঙালীরা কাজের কাজ যদি নাও করিতে পারিত, তাহাতে ততটা আসিয়া যাইত না, যতটা আসিয়া যাইতেছে এইজন্য যে হুজুগ সৃষ্টি করিলেও যতটা দিন হুজুগ স্থায়ী হইলে গণজীবনকে অনেকখানি প্রসারিত করিয়া দিতে পারে এবং যাহা দিলে নানা কাজের আকারে এই হুজুগ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, হুজুগকে বাঙালীরা ততদিন চরিত্রগত দুর্ব্বলতার জন্য বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। এই হুজুগকে সমাজের সর্ব্বস্তরে ছড়াইয়া দিতে না পারাও তাহার অন্যতম কারণ।

কাজের যে রূপকে প্রকৃতপক্ষে আমরা কাজ আখ্যা দিয়া থাকি, ব্যাক্তিগত ভাবে তেমন কাজ বহু শতাব্দী ধরিয়া আমরা করিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ সাধারণ বাঙালীরা জীবিকার্জ্জন বা অন্য প্রকার স্বার্থের জন্য কাজ করে না, এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না, কিন্তু তাহা আমাদের দুর্দ্দশাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। বাঙালী

কৃষক ও শ্রমিকেরা আরও কাজের জীবন যাপন করে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসের অতি সামান্য অংশের জন্যই তাহারা পরমুখাপেক্ষী থাকে; কিন্তু দুর্দ্দশা তাহাদের আরও বেশী। নিজেদের অধিকাংশ কাজ নিজেরা করিয়া লইয়া খাওয়া এবং সামান্য কটি-বস্ত্র পরিধান করা ব্যতীত, অন্য সকল অভাব অস্বীকার করিয়া এবং বিলাস-ব্যসন ও কৃত্রিম জীবন হইতে নিরাপদ ব্যবধানে থাকিয়াও তাহারা দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। কাজেই, শুধুমাত্র এই প্রকার কাজের দ্বারা যে আমাদের দুঃখ দূর হইবে না, তাহা সুনিশ্চিত। অন্যান্য দেশের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি এবং তাহার সহিত নিজেদের অবস্থার তুলনা করি তাহা হইলে সেখানেও এই কথারই সমর্থন পাইব।

আমাদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা এই যে, আমরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ ভালর জন্য চেষ্টা করি, নিজ নিজ দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার কাজে মনোযোগ প্রদান করি তাহা হইলে—আমাদের সকলকে লইয়াই জাতি বলিয়া—একদিন সমগ্র জাতি সকল দিকে উন্নত হইয়া উঠিবে। কিন্তু, কথাটা যে সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হইতে দেখিতে হইবে, আমাদের কল্পিত সুপদ্ধতি ও সুকাজের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকে বলিয়া সে কথাটা সহজেই আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। আমরা চিরদিনই পরস্পরের সহিত সহযোগিতাহীন, স্বার্থের সুরক্ষিত সীমার অন্তর্গত কাজ করিতেই অভ্যস্ত। সহসা যখন এমন কোন কাজ আসিয়া পড়ে যাহা আমাদের এই নিরুপদ্রব চিরাভ্যস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়, অথচ, বুদ্ধি দিয়া যাহাকে ভাল না বলিয়া পারি না, এবং যুক্তিযুক্ত বলিয়া সমর্থন না করিয়া পারি না, তখন সেই কাজ এবং আমাদের চিরাভ্যস্ত জীবনের মধ্যে আমরা একটা সামঞ্জস্য

খুঁজিতে যাই এবং তাহার ফলেই এইরূপ নানা অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়।

আমাদের সকলকে লইয়া জাতি গঠিত বলিয়াই জাতীয় উন্নতি হইলে যে আমাদের সকলেরই লাভ হইবে, জাতির শক্তি বৃদ্ধি হইলে যে আমরা সকলে তাহার আশ্রয়ে বাঁচিয়া যাইব, এই সহজ কথাটার পরিবর্ত্তে উল্টা দিক হইতে আমরা বলি,—আমাদের সকলকে লইয়া যখন জাতি গঠিত, তখন আমাদের সকলের উন্নতি হইলে জাতির উন্নতি হইবে। কিন্তু, উন্নতি লাভের পথে যে সকল বাধাবিঘ্ন আছে আমাদের সকলের বিচ্ছিন্ন শক্তিতে তাহা অতিক্রম করা যায় না বলিয়া, চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত উন্নতিও আমাদের লাভ হয় না। এই সংঘবদ্ধ জীবনের অভাব, একত্রিত হইয়া কাজ করিবার এই অক্ষমতা আমাদের সকল দৈন্য ও ত্রুটির মূলে।

আমরা সেবাপরায়ণ ও আত্মীয়বৎসল জাতি; পাশ্চাত্য দেশ-বাসীদের এই সকল গুণ নাই, সাধারণতঃ এমন কথা বলিয়া নিজেদের নানা প্রকার হীনাবস্থার মধ্যেও, গুণগত এই আপেক্ষিক উৎকর্ষের জন্য গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। রোগীর সেবাকে আমরা ধর্ম্ম বলিয়া জানি, রোগগ্রস্ত আত্মীয় স্বজনের যথোপযুক্ত সেবা করিতে না পারাকে আমরা নিদারুণ অধর্ম্ম বলিয়া মানি এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকিলেও অন্ততঃ লোকনিন্দার ভয়ে এবং প্রাণের টানে , এইরূপ কর্ত্তব্যে কখনও অবহেলা করিতে পারি না। অথচ, আমাদের যথাসাধ্য যত্ন সত্ত্বেও আমাদের কয়টি রোগী যথাযথ ঔষধ, পথ্য ও শুশ্রূষা পাইয়া থাকেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত নাই। কিন্তু, যাহারা নিজ নিজ বাড়ীর কথা না ভাবিয়া সকল রোগীর কথা এক সঙ্গে ভাবিল,—এবং সকলের কথা ভাবিস বলিয়া সকলকে সঙ্গে পাইবার সুবিধা হইল—

তাহাদের দেশে চিকিৎসার অভাবে, সেবার অভাবে রোগী রাস্তায় পড়িয়া মরে না। আমাদের সকল স্নেহ ও সামর্থ্য দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াও নিজেদের প্রিয়জনদের সুস্থ রাখিতে পারি না, আর যাহারা নিজের কথা না ভাবিয়া দেশের সকলের স্বাস্থ্যের কথা ভাবিয়াছে, তাহারা দেশকে, যাহার মধ্যে নিজেরাও আছি, সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত করিয়াছে। আমাদের দাক্ষিণ্য ও স্বজনপ্রীতি আমাদের সম্বলহীন, কর্ম্মহীন আত্মীয়দের বাঁচাইতে পারিতেছে না, কিন্তু যাহারা নিজের আত্মীয়দের কথা নিজে না ভাবিয়া সকলে একসঙ্গে সকলের কথা ভাবিয়াছে, তাহাদের সামান্য সংখ্যক লোকের অপেক্ষাকৃত অনেক সামান্য কষ্টে রাজসরকার বিচলিত হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে প্রতিযোগিতায় বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, আমাদিগকে ব্যক্তিগত কার্য্যের নীতি পরিত্যাগ করিয়া সকল কার্য্যের জন্য সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। সভ্যতার প্রথম যুগে যখন সংঘবদ্ধতার পরিধি বিশেষ বিস্তৃত হয় নাই, তখন নিজের প্রয়োজনীয় সকল কাজ মানুষের নিজেরই করিতে হইত। সংঘের পরিধি বিস্তৃত হইবার সহিত মানুষ নিজ নিজ প্রতিভা ও ক্ষমতানুযায়ী, সমাজের কোনও একটি বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার কাজে নিযুক্ত হইতে লাগিল। ইহা হইতেছে শ্রমবিভাগ অর্থাৎ পারস্পরিক সাহায্য, আমাদের সামাজিক জীবন ও সভ্যতা আরও অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর এবং এক বৃত্তির লোকদের কাজের জন্য একত্রিত হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইতে লাগিল, ইহাই হইতেছে সমবায়। আমরা কোন অবস্থাতেই আদিম যুগের দিকে ফিরিয়া যাইতে পারি না। গেলেও তাহাতে আমাদের মঙ্গল হইবে না। কিন্তু এই সকল কার্য্যের জন্য প্রয়োজন জাগ্রত গণজীবনের; ইচ্ছা করিলেই এই সকল প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে

গড়িয়া উঠিবে না, অথবা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গোটা কয়েক গড়িয়া তুলিতে পারিলেই জাতীয় জীবন আমাদের উন্নত ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে না। আমাদের মধ্যে গণচেতনা গড়িয়া তুলিতে পারিলেই তবে এ সকল দিকে আমাদের উন্নতি সম্ভব। রাজনীতি সমাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আরও বিস্তৃততর সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ গণজীবনের প্রয়োজন আছে, সে সকল ক্ষেত্রে উন্নতির জন্যও আমাদিগকে গণচেতনা জাগ্রত করিবার জন্য যথাসাধ্য করিতে হইবে। এই সঙ্গে আমাদিগের তুলিলে চলিবে না যে, কোনও গঠনমূলক কাজের প্রত্যক্ষ এবং নগদ লাভ অপেক্ষা ইহার পরোক্ষ লাভ অর্থাৎ জাতির গণজীবন গঠনে ইহা যে সহায়তা করিবে তাহারই মূল্য বেশী এবং যে সকল কাজের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে এই শেষোক্ত ফল পাওয়া যাইবে, আমাদের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যতের পক্ষে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী।

এখন কথা উঠিবে, আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের জন্য দেশের নিজ্জীব, পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন, শুধুমাত্র নিজ নিজ স্বার্থের কথা ভাবিতে অভ্যস্ত জন-সমষ্টিকে আঘাত দিবার যে প্রয়োজন আছে সেই আঘাত কোন দিক দিয়া দেওয়া যাইবে। সুনিদ্দিষ্ট, সুপরিজ্ঞাত, বিপদ ও ঝুঁকির সম্ভাবনাহীন রাস্তায় নির্ভুল হিসাবের সহিত ধীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হইবার মত সময় যে আমাদের আসে নাই, বহু লোকের সময় ও উৎসাহের আপাতদৃষ্টিতে প্রচুর অপব্যয়ের মধ্য দিয়াই যে আমাদিগকে চলিতে হইবে, কি উপায়ে সে কথা এই পঁইত্রিশ কোটি লোককে বুঝান যাইবে।

চিরদিন ধরিয়া আমরা পারিবারিক গণ্ডীকে কেন্দ্র করিয়াই যাহা কিছু কাজ ও চিন্তা করিয়াছি। সমাজ আমাদের ছিল, কিন্তু তাহা বহুলোকের শক্তির সম্মিলিত রূপ হিসাবে ছিল না; কোন কিছু করিবার

জন্য অথবা কোন কিছুর প্রতিরোধ করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করিবার মত আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা ও সংহতি ইহার ছিলনা। ইহা শুধু উৎসব করিবার, পরস্পরের সঙ্গ লাভ করিবার, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব করিবার, সামাজিক জীব হিসাবে অত্যাবশ্যক প্রয়োজনগুলি সিদ্ধ করিবার একটা শিথিল মিলন-কেন্দ্র মাত্র ছিল। এখানে সকলের সম্মিলন হইত বটে, কিন্তু কর্ম্মশক্তির সমবায় হইত না। দেশের ও সমাজের কথা আমরা যাহা চিন্তা করিতাম, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা কার্য্যকরী প্রেরণা হইতে উদ্ভূত না হইয়া প্রাণের সম্পর্ক বিরহিত পাণ্ডিত্য হইতে উদ্ভূত হইত এবং এই কথা বর্ত্তমান সময়েও সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া যায় নাই। কাজেই প্রথম কাজ হইতেছে, একান্তভাবে পারিবারিক সীমার মধ্যে কাজ ও চিন্তা করিতে আমাদের যে মন অভ্যস্ত হইয়াছে সেই মনকে এই অভ্যস্ত সীমার বাহিরে আনিয়া সকলের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা ভাবিতে ও তাহার জন্য কাজ করিতে শিখাইতে হইবে। যদিও দেশের লোকের এই মনোবৃত্তি গঠন করিতে পারিলে তাহাতে আমাদের পারিবারিক সুখ সুবিধা অনেক গুণ বাড়িয়া যাইবে, তবুও, এই চেষ্টার শেষ প্রান্ত অবধি পৌঁছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই প্রকার কার্য্যের সহিত আমাদের পারিবারিক স্বার্থের একটা বিরোধ থাকিবেই। এই জন্য মনের চিরদিনের অভ্যাস কাটাইবার সকল চেষ্টাকে হিসাবী লোকেরা অকাজ বলিয়া বাধা দিবেন এবং মনের স্থিতিপরায়ণ অভ্যাস কাটাইবার পক্ষে চাঞ্চল্য ও উন্মাদনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী বলিয়া ইহাকেই তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বড় অকাজ বলিবেন। কিন্তু, যাঁহারা কাজ করিবেন তাঁহাদের এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকিলে বিশেষ অসুবিধার সম্ভাবনা রহিয়াছে। হিসাবী লোকের কথা শুনিয়া যদি তাঁহারা চাঞ্চল্য সৃষ্টিকে অকাজ মনে করিয়া সঙ্কোচ ও দ্বিধার সহিত তাহা করিতে থাকেন তাহা হইলে সিদ্ধি লাভে অনর্থক বিলম্ব হইবে মাত্র অন্য লাভ কিছু হইবে না।

———

প্রসঙ্গ কথা

বিজ্ঞাপনের কথা দিয়াই আরম্ভ করিলাম। সাময়িকপত্রের জীবন বিজ্ঞাপন পাওয়ার এবং ব্যবসার জীবন বিজ্ঞাপন দেওয়ার উপরে নির্ভর করে বিজ্ঞাপনদাতা দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থলাভ করেন, সাময়িকপত্র বিজ্ঞাপনদাতার নিকট হইতে অর্থলাভ করেন। সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে বহুলোকে সাময়িকপত্র পাঠ করিয়া থাকে, সুতরাং বহুলোকের নিকট বিজ্ঞাপনের বার্ত্তা অল্পসময়ে অল্পখরচে পৌছাইয়া দিবার ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়। সুতরাং এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতার চেয়ে পত্রপরিচালকের দায়িত্ব অধিক।

* * *

আমরা ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহের বিজ্ঞাপন অনেকদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ভদ্ররুচিবিগর্হিত একটি বিজ্ঞাপনও আজ পর্য্যন্ত ইংরেজী কাগজে আমাদের চোখে পড়ে নাই। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক কোথায়ও না। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের সাময়িকপত্রসমূহে অনেক বিজ্ঞাপন এরূপ দেখা যায় যাহা অমার্জ্জিত বিকৃতরুচির পরিচায়ক। এরূপ কেন হয়? কাগজ-পরিচালকগণ সকলদেশেই লাভের আশায় বিজ্ঞাপন লইয়া থাকেন; বিজ্ঞাপনদাতাগণও সর্ব্বত্র লাভের আশায় বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনের ভাষায় এরূপ অসভ্য রুচিবিকার সম্ভব হইল কেমন

করিয়া? ইহাতে প্রমাণ হয়, ইংরেজ-জনসাধারণের সৌন্দর্য্যবোধ এবং রুচি আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ ও রুচি অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষপ্রাপ্ত।

* * *

সর্ব্বত্রই সংবাদপত্রসমূহের একটা মূলনীতি আছে। তাহা জনমত-গঠন এবং জনসেবা। যেসব কাগজ জনসেবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ (সাময়িকপত্রের মধ্যে সংবাদপত্রই বিশেষভাবে এই দাবী করে) সেই সব কাগজ যখন বিজ্ঞাপনদাতার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জনসেবার মূলে কুঠারাঘাত করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না, তখন স্বতঃই মনে হয়, এদেশে দেশপ্রেম, জনসেবা প্রভৃতি শব্দ-গুলি জনগণকে প্রতারিত করিবারই এক একটি উপায় মাত্র, ইহার বেশি কিছু নহে। কেন না, ঘরে ঘরে অশ্লীল ভাষার বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা জনসেবা হয় না; কুরুচিপূর্ণ ভাষার বিজ্ঞাপন ছাপিয়া জনমত গঠন করিবার প্রয়াসও ব্যর্থ হয়।

* * *

সভ্যতা ও অসভ্যতার মধ্যে যদি কিছু পার্থক্য থাকে তবে জনসেবার দায়িত্ব যাঁহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের উচিত জনসাধারণের মধ্যে অসভ্যতার প্রচার বন্ধ করা। আমাদের দেশ অর্দ্ধ-শিক্ষিতের দেশ। ছাপার অক্ষরে যাহা দেখে এদেশের লোক তাহাই বিশ্বাস করে। সুতরাং সংবাদপত্র-পরিচালকগণ নিজেরা শিক্ষিত হইয়া শুদ্ধমাত্র অর্থ-লাভের জন্য নীতিধর্ম্মের পরিপন্থী কাজ করিবেন না। এবিষয়ে ইংরেজী কাগজই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। য়ুরোপ আমেরিকার সংবাদপত্র-পরিচালকগণ রুচি এবং সংস্কৃতির দিক দিয়া এমন একটা স্তরে

পৌঁছিয়াছেন যেখান হইতে নীচে নামা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অথচ ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। অপরপক্ষে আমাদের দেশের সংবাদপত্র পরিচালকগণ ব্যবসার জন্য বিজ্ঞাপনের পাতায়, মিথ্যা জানিয়াও মিথ্যা জিনিষের এবং অশ্লীল জানিয়াও অশ্লীল ভাব এবং ভাষার বিজ্ঞাপন দিনের পর দিন ছাপিয়া চলিতেছেন। যে পাতায় বিজ্ঞান-কনফারেন্সের বক্তৃতা—সেই পাতাতেই বশীকরণ কবচের বিজ্ঞাপন ছাপা হইতেছে; যে পাতায় ছাত্রছাত্রীর ক্রীড়াকৌতুকের সংবাদ—সেই পাতাতেই ধ্বজভঙ্গ এবং পুরুষত্বহানির বিজ্ঞাপন ছাপা হইতেছে। বিখ্যাত দৈনিকপত্রে "ছাত্রবন্ধু" নাম দিয়া ধ্বজভঙ্গ এবং গনোরিয়ার বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়াছে! ইহা শুধু যে অসভ্যতা তাহা নহে, ইহা তাহার চেয়েও বেশি,—ইহা স্বার্থান্ধ শিক্ষিত লোকের জ্ঞানকৃত শঠতা—দেশকে বর্ব্বরতার খোঁটায় আবদ্ধ রাখিবার ইহা একটি চমৎকার লাভজনক ফন্দি।

* * *

ইংরেজ পরিচালিত "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" দেখিতেছি। শতশত বিজ্ঞাপন প্রতিদিন বাহির হইতেছে—কই, সেখানে ত কোনোদিন কোনো অসভ্যভাষার বিজ্ঞাপন বাহির হয় না! কোন হাতুড়ি-আচার্য্য বা স্বপ্নদর্শক এরূপ অব্যর্থ ঔষধের বিজ্ঞাপন দিতে সাহস করে না! ইহার কারণ এই যে ভারতীয় পরিচালিত কাগজে যে আবদার চলে, এবং ভারতীয় সংবাদপত্র-পরিচালক টাকা পাইলেই যাহা অম্লানবদনে ছাপেন ইংরেজ-পরিচালিত কাগজে সেরূপ সুবিধা নাই। "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" ভদ্রস্ত্রীপুরুষের হাতে যাইবার স্পর্দ্ধা রাখে—দেশী কাগজের সে স্পর্দ্ধা

নাই। যে কোনো ভদ্রলোক শুদ্ধমাত্র ঐ বিজ্ঞাপনের জন্য দেশী কাগজ ঘরে লইতে আপত্তি করিবেন। এবিষয়ে দেশের শিক্ষিত প্রকর্ষমনা ব্যক্তিবর্গের মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

* * *

আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। যে সব বিজ্ঞাপনে এরূপ অশ্লীল ইঙ্গিত বা খোলাখুলি অশ্লীলতা থাকে না, এই সব বিজ্ঞাপনের পার্শ্বে সেই সব বিজ্ঞাপনের মূল্য কমিয়া যায়—অসৎ সংসর্গে তাহাদের অসম্মান ঘটে। যাহারা ব্যাধিমুক্তির "গ্যারাণ্টি" দিয়া থাকে তাহাদের উগ্রতার পার্শ্বে সংযত ভাষার গ্যারাণ্টি-আস্ফালনহীন কথাগুলি অত্যন্ত নীরস বলিয়া বোধ হয়;—বোধ হয়, যেন ইঁহারা ভয়ে ভয়ে কথা বলিতেছেন—যেন ইঁহাদের ঔষধের উপর ইঁহাদের নিজেদেরই কোনো আস্থা নাই। অথচ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, যাঁহারা বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করেন তাঁহারা কোনো ব্যাধিমুক্তি সম্বন্ধেই গ্যারাণ্টি দিতে পারেন না। এরূপ গ্যারাণ্টির কোনো মূল্য থাকিলে পৃথিবী হইতে ব্যাধি নির্ম্মূল হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই, এবং শীঘ্র হইবে বলিয়াও কোনো সম্ভাবনা নাই। যাহাদের দায়িত্বজ্ঞান কম তাহারাই অসুখ সারাইতে গ্যারাণ্টি দিবার স্পর্দ্ধা করে। শিক্ষিত চিকিৎসক এরূপ করিতে পারেন না। কাজেই বিজ্ঞানসম্মত ঔষধের বিজ্ঞাপন স্বভাবতই সংযত ভাষায় লেখা হইয়া থাকে বলিয়া গ্যারাণ্টিওয়ালাদের তুলনায় সাধারণের নিকট তাহা কম কার্য্যকরী হয়।

* * *

সম্প্রতি ঔষধের বিজ্ঞাপনের আরো একটি নূতন রূপ এদেশে দেখা দিয়াছে। বিজ্ঞাপনের রূপ যে কি কুৎসিত হইতে পারে তাহা

দেখিতেছি। বিজ্ঞাপনের পাতায় অথবা পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে বিজ্ঞাপন ছাপিবার রীতি সকল দেশেই প্রচলিত আছে। গল্পে বা প্রবন্ধেও কোনো বিখ্যাত জিনিসের নাম উল্লেখিতমাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বিজ্ঞাপন নহে। কিন্তু কোনো কাগজে বিজ্ঞাপন দিবার সময় যদি বিজ্ঞাপনদাতা সর্ত্ত করিয়া বসেন যে আমার বিজ্ঞাপিত জিনিষ বিষয়ক একটি প্রবন্ধকে অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে স্থান দিতে হইবে এবং এমন ভাবে দিতে হইবে যাহাতে লোকে টের না পায় যে ইহা বিজ্ঞাপন—তাহা হইলে এরূপ সর্ত্তে রাজি হওয়া অপেক্ষা হীনতর কার্য্য আর কিছু হইতে পারে না। সম্পাদক কোনো জিনিসের গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন—প্রশংসাপত্র দিতে পারেন, সমালোচনা করিতে পারেন, কিন্তু এ সমস্ত মামুলি প্রথাকে অগ্রাহ্য করিয়া বিজ্ঞাপন এখন ছদ্মবেশে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আকারে সাময়িক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইতেছে।

*　　　*　　　*

বিজ্ঞাপনকে বিজ্ঞাপন-হিসাবে জানিতে পারিলে বিজ্ঞাপনপাঠক নিজের দায়িত্বে জিনিসের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন। কাগজের সম্পাদক সে ক্ষেত্রে কোনোমতেই দায়ী হন না। কিন্তু টাকার অসাধ্য আর কিছুই রহিল না। সম্প্রতি "সিরোলিন রচি" নামক একটি পেটেণ্ট ঔষধ সম্বন্ধে উপাধিধারী ডাক্তারের লেখা প্রবন্ধ বহু কাগজে প্রকাশিত হইতেছে। একই ডাক্তার একাধিক পত্রিকায় একই প্রবন্ধ ছাপাইতেছেন। ভাষার পরিবর্ত্তনও আবশ্যক বোধ করেন নাই! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ইহা বিজ্ঞাপন। কিন্তু যদি বিজ্ঞাপন না হয়, এবং ডাক্তারের নাম যদি কাল্পনিক না হয় তাহা হইলে আরো দুঃখের বিষয়। কেননা লেখার ধরণ দেখিয়া ইহা কখনই মনে হয় না

যে উহা গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা যক্ষ্মা নিবারণের জন্য একটা ব্যাপক আয়োজনমূলক কিছু। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, যক্ষ্মার কোন অব্যর্থ ঔষধ নাই। মোট কথা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং আনুষঙ্গিক কতকগুলি নিয়মপালন দ্বারা যক্ষ্মারোগ চিকিৎসিত হইয়া থাকে। কোনো উপাধিধারী ডাক্তার যক্ষ্মা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিলে সর্ব্বপ্রথম এই স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া প্রভৃতির কথাই লিখিবেন। যদি কোনো ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তবে তাহা গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত হাসপাতাল সমূহে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় কিনা দেখিতে হইবে। ইহা না দেখা পর্য্যন্ত কোনো ডাক্তার কেমন করিয়া লেখেন, "বহু বৎসরাবধি ব্যবহারের পর ইহা বলা যাইতে পারে যে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত স্ত্রীপুরুষ কিংবা শিশুদের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করাইতে "সিরোলিন" রচিই একমাত্র সক্ষম"? আর যদি ইহা প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞাপন হয় তাহা হইলে এইরূপ গুপ্ত পন্থা অবলম্বন করিবার অর্থ কি ?

* * *

কোনো ঔষধ একমাত্র সক্ষম কিনা তাহা প্রমাণ করাও যেমন শক্ত অপ্রমাণ করাও তেমনি শক্ত। কাজেই ডাক্তারবাবুদের এইরূপ উক্তির বৈজ্ঞানিক মূল্য কিছুই নাই। "একমাত্র সক্ষম" দূরের কথা মোটেই সক্ষম কিনা তাহার বিচার বহু বৎসর ধরিয়া করা আবশ্যক। ডাক্তার-বাবুগণ না হয় লিখিয়াই দায়িত্ব এড়াইয়াছেন, সম্পাদকগণ ইহা ছাপিয়াছেন কেন ? বিজ্ঞাপন ছাপার ইহা যদি সর্ত্ত হয়, তবে অন্যান্য বিজ্ঞাপন দাতাগণ কি দোষ করিয়াছেন ?

* * *

সিনেমার টিকিটের দাম কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আশা করা যায় এইবার দেশী ফিল্মের কিছু উন্নতি

হইবে। দর্শনী বেশি হইলেই লোকে ভালমন্দের বিচার করিত শিখিবে এবং তখন যে কোনো ছবি তুলিয়া শুধু ঢাকঢোল বাজাইলেই বিক্রয় হইবে না। এইরূপে যদি ভাল ছবির চাহিদা বাড়ে তাহা হইলে ষ্টুডিও-মালিকগণের হুঁস হইবে। তবে ইহাতে ভাল ছবি শস্তায় দেখিবার যে সুযোগ ছিল তাহা অবশ্যই কিছু নষ্ট হইবে, কিন্তু মোটের উপর ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি হইবে। আমোদের জন্য কিছু বেশি খরচ করিলে ক্ষতি কি ? ট্যাক্স ত আর চাল ডালের উপর বসিতেছে না!

* * *

দর্শনী যতই বাড়ুক সিনেমা দেখা কখনই বন্ধ হইবে না। যেমন করিয়াই হউক পয়সা জুটিবেই। আর যদি অতিরিক্ত পয়সা না জোটে তাহা হইলে পাঁচবারের জায়গায় চারি বার দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যাহারা সপ্তাহে পাঁচবার দেখে তাহারা সপ্তাহে চারিবাব দেখিবে, যাহারা মাসে কুড়িবার দেখে তাহারা মাসে ষোলবার দেখিবে ইহাই তফাৎ। তবে ইহাতে একদিকে ক্ষতি হইতে পারে। সপ্তাহে একবার বা মাসে চারিবার কম দেখার জন্য অনেকের মন এবং স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে সুতরাং মনের জন্য বিশেষ কিছু না হইলেও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে কিঞ্চিৎ ঔষধপত্র খাওয়া আবশ্যক। এই ঔষধ খরচটাই একমাত্র ক্ষতি।

* * *

কিন্তু যাঁহাদের ভাল ছবি দেখাইবার শক্তি আছে—তাঁহাদের কিছু মাত্র ভয়ের কারণ নাই। ভাল ছবি দেখিবার জন্য লোকে পাগল। পাগল হইলে খরচ সম্বন্ধে কোনো কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি টিকিটের মূল্য শ্রেণীনির্ব্বিশেষে যদি দ্বিগুণ

বাড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও দর্শকসংখ্যা কিছুমাত্র কম হইবে না।

*　　　*　　　*

তামাকের উপরে শুল্ক বসিলেও সুবিধা। দুর্ব্বল ফুসফুসের দেশে যদি তামাক খাওয়া কিছু কমে তবে আপত্তির কিছুই নাই। কিন্তু আশঙ্কা হয় মূল্য বাড়িলেও তামাক খাওয়া কমিবে না। অনেক ভারতবাসী প্রতিদিন আট আনা হইতে এক টাকার তামাক খাইয়া থাকেন, ইহার উপর খরচ কিছু বাড়িলে উহা বোঝার উপর শাকের আঁটি হইবে। ঐ সঙ্গে বেশি দামের তামাক খাইবার গর্ব্বও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু গর্ব্বের চেয়েও যদি অসুবিধা বৃদ্ধিই বেশি হয় তাহা হইলে সেরূপ অসুবিধা বৃদ্ধি হওয়াই ভাল। কেননা বর্ত্তমানের অসুবিধা ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে হয়ত কোনো তামাকহীন রাজ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে। অতএব তামাকের উপর শুল্কধার্য্য না হইলেও আমরা তামাক খাইব, হইলেও তামাক খাইব, ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে তাহার বিচার করিব না।

মৃন্ময়ী

ধরিয়া খোকার কান
তর্জ্জন করি খোকার জননী বলে—
বজ্জাত ছেলে, খালি ধূলো নিয়ে খেলা!
চলত তোমায় এখনি নাইয়ে দেব।

চীৎকার করে খোকা কাঁদে আর কহে—
ধূলো নিয়ে খেলা খেলতে যে ভাল লাগে !
—হায়, খোকা মোর তিন বছরের ছেলে !
ধূলা-মাখা দেহ কোলেতে তুলিয়া লয়ে
জিজ্ঞাসা করি—বল ত খোকন মণি,
ধূলো নিয়ে খেলা কেন এত ভাল লাগে ?
খোকা কাঁদে খালি, কারণ ত জানেনা সে।
অনেক কষ্টে থামাই কান্না তার।
মা এসে তাহার ধোয়ায় হাত পা মাথা
আর বলে—তুমি ছেলের মাথাটি খেলে।
আমি বলি—খোকা, শুনছ ত মা'র কথা ;
কখ্‌খনো আর খেলো নাকো মাটি নিয়ে।

মিনিট পনের পরে
খোকা কোথা গেল খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি—
হায় হতোস্মি ! আবার বাগানে গিয়ে
বসিয়াছে খোকা ধূলির স্তূপের মাঝে।
মুখে মাখিয়াছে বুকে মাখিয়াছে ধূলি
মুঠি মুঠি মাটি মাথায় দিতেছে তুলে !
স্তব্ধ হইয়া ভাবি
মৃন্ময়ি, তব একি এ নিবিড় মায়া ?
এতটুকু শিশু, তারো কচি বুক খানি
ভরিয়া দিয়াছ তোমার গহন প্রেমে ?

চন্দ্রহাস

———

স্ত্রী-কান্ত

অপরাহ্ন বেলায় আফিংএর নেশাটি যখন জমিয়াও জমিতে চাহে না, এবং ঘন ঘন হাই উঠার সহিত মনে হয় আমার দুই চক্ষু ও এই পরিক্ষীণ জগতের মধ্যে সমুদায় আদান প্রদানের ছিদ্রগুলি যেন ক্রমশঃ বুজিয়া আসিতেছে, যেন কিয়ৎকাল পরে একটি বস্তুবর্ণহীন অখণ্ড অন্ধকারে ঝিম্ হইয়া বসিয়া থাকা ব্যতীত কোন কর্ম্মই থাকিবে না,—সেই অবসরটির অন্তরালে, আজ এই বার্দ্ধক্যের উপকূলে দাঁড়াইয়া কত কথাই না মনে পড়িয়া যায়! আজ কি আমার এত শীঘ্রই বুড়া হইবার কথা ছিল? কিন্তু জ্ঞান হইবার পূর্ব্ব হইতেই এই কয়খানি হাড়ের উপর কি নির্দ্দয় অত্যাচারটাই না করিয়াছি! কৈশোর আসিয়াছিল কি আসে নাই তাহা মনে পড়ে না, যৌবন ব্যাটা আসিতে না আসিতেই চোখে ধূলা দিয়া পলাইয়াছে, একদিন সকালে হঠাৎ জাগিয়া দেখি ঘুণধরা বাঁশের মত আগাগোড়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছি। তথাপি, সেই বারো হইতে আজ এই বাষট্টি অবধি মেছুনি হইতে ভিস্তিওয়ালা পর্য্যন্ত সকলেই আমাকে দেখিবামাত্র "ছিছিছিছি" করিয়া উঠিয়াছে এবং হোটেল, মুদিখানা অথবা মাংসওয়ালার দোকানে উপস্থিত হইলেই পরিচিত অপরিচিত সব লোক একবাক্যে ধিক্কার দিয়া আসিয়াছে। আজ ত সবই ছাড়িয়াছি, আফিং ব্যতীত কোন সম্বলই নাই, তথাপি এই বাষট্টি বৎসর সেই সব স্মৃতি ও বিস্মৃতির শিকলে টান পড়িয়া সন্ধ্যাবেলার মৌতাতটা জমিয়াও জমিতেছে না, আর মনে হইতেছে বিড়িওয়ালা এবং পানওয়ালীরা

এই "ছিছি"টাকে যত বড় করিয়া দেখিয়াছে,—তা' হয়ত সত্যই তত বড় ছিল না! ভগবান তাঁহার আবগারি ডিপার্টমেণ্ট ও আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলির ঠিক মাঝখানটিতে যাহাকে টান দেন, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া একজামিনে পাস করিবার সুবিধাও দেন না, বুদ্ধি হয়ত কিছু দেন কিন্তু সাধারণ লোকেরা তাহাকে দুর্ব্বুদ্ধি বলে এবং তাহাদের প্রবৃত্তি এমন সব স্থানে তাহাদিগকে লইয়া যায়, তাহাদের উপভোগের বিষয়বস্তু নিজেদের জীবনকে এমনই আপৎ-সঙ্কুল করিয়া তুলে যে তাহার বর্ণনা করিতে গেলে ভদ্র ব্যক্তিরা ভয়েই আঁৎকাইয়া উঠিবেন। তারপর সেই লোকটি কেমন করিয়া সবার চক্ষুর অন্তরালে একদিন বেমালুম সরিয়া পড়ে এবং বহু বৎসর শ্রীঘরবাসের পর হঠাৎ একদিন একমুখ দাড়ি লইয়া এবং দাড়ির নিম্নে 'একজিমা' লইয়া দেশে ফিরিয়া আসে,—কেহ তাহার কোন পাত্তাই পায় না।

অতএব থাক এসকল কথা। যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। কিন্তু বলিব বলিলেই ত আর বলা হয় না! তাহার জন্য লিখিবার ক্ষমতা থাকা চাই, কল্পনার দৌড় চাই। সে যে শক্ত কাজ! বাবুই-পাখীর বাসাকে আমি ত কখনও শরতের চাঁদ মনে করিতে পারি নাই, মাছিকে মাছিই মনে হইয়াছে—কোকিল মনে হয় নাই, বিছা কামড়াইলে কেউটে সাপ দংশন করিয়াছে—এরূপ কখনও ভাবি নাই, ধেনো খাইতে বসিয়া একথা বলিয়া মনকে ভুলাইতে পারি নাই যে শ্যাম্পেনের পাত্রে চুমুক দিতেছি। অতএব সহজ ভাষায় সত্য কথাই বলিব, তাহাতে যদি কাহারও রুচিবিভ্রাট ঘটে তবে তিনি সুনীতি-সঙ্ঘের সভ্য হইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, আমাকে দিক্ করিবেন না।

লিখিতে বসিয়া অনেক সময় আমি আশ্চর্য্য হই এই ভাবিয়া যে

ঘটনাগুলি যখন ঘটিয়াছিল তখন ত তাহারা এমন স্পষ্ট করিয়া ঘটে নাই ! ঘন কুয়াশার মধ্যে আবছা দেখার মত অথবা মাতৃগর্ভ হইতে বহির্জগতের কথাবার্ত্তা শুনিবার মত যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সঠিক আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া ঘটে নাই, স্রোতের আবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে তীরস্থ দৃশ্যাবলি আমার ঘোলাটে দৃষ্টির সম্মুখে কখন তলাইয়া যাইত, তাহার খবর আমি রাখিতাম না। কিন্তু মনের তলায় গাঢ় কর্দ্দমের নিম্নস্তরে অতীতের যে মৃত ঘটনাগুলি বিস্মৃতি-ভূমির চাপে কয়লা হইয়া গিয়াছে, আফিং জিনিষটার এমনই মাহাত্ম্য যে, সে অভিজ্ঞ নৃতত্ত্ববিদের ন্যায় বহু কষ্টে আজ সেগুলির উদ্ধার করিয়া ফিরিতেছে। তাই প্রভু আফিং আমাকে যাহা বলাইবেন তাহাই বলিব, যাহা করাইবেন তাহাই করিব ; এবং ইহার কোনও কৈফিয়ৎ আমি পাঠককে দিব না, দিতে বাধ্যও নহি।

এমনি একটি বেকৈফিয়তী ঘটনা আজ হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায় বড়ই বিস্ময় বোধ করিতেছি। প্রথমেই যদি বলি ইহা একটি প্রেমের ইতিহাস তবে হয়ত পাঠক তখনি হাসিয়া বলিবেন, ওই চেহারায় প্রেম হয় না কি ? কিন্তু এই চেহারা লইয়া নানারূপ পূজায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াও যে আমার চিত্তের অনেকখানি উদ্বৃত্ত থাকিয়া গিয়াছে এবং তাহাই অকাতরে পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে আমি বিলাইয়া দিয়াছি—শুধু যে নেশার ঝোঁকে তাহা নয়,—সেই কথাই আজ বলিব। তবে বলিতে বলিতে যদি আমার ঝাপসা দৃষ্টিতে বড়কে ছোট এবং ছোটকে বড় ও চ্যাপ্টা বস্তুকে লম্বা এবং লম্বা বস্তুকে চ্যাপ্টা দেখায়, সেজন্য দায়ী আমি নই, দায়ী তাহারা যাহারা এজগতে গাঁজার চাষ প্রথম সুরু করিয়াছিল।

উপরোক্ত দ্রব্যটি যখন বাল্যকালে প্রথম অভ্যাস করিতেছিলাম

তখন যে কয়জন ছোকরা স্কুল হইতে বিতাড়িত হয় তন্মধ্যে আমার প্রধান সাকরেদ ছিলেন একজন জমিদার পুত্র। তাঁহার বয়স তখন ষোলো। বত্রিশ বৎসরের এক রজকিনীকে লইয়া সেই যে তিনি একদিন রাত্রিকালে কলিকাতায় রওনা হইলেন, আর ফিরিলেন না। আমিও কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইব—এইরূপ কথাবার্ত্তা ছিল, কারণ এ কীর্ত্তি তাঁহার একার প্রচেষ্টায় হয় নাই,—কিন্তু বহুকষ্টে যদিও রজকিনীর সন্ধান মিলিল—বহুদিন পরে, কলিকাতার কোন নামজাদা পল্লীতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, বন্ধুর সন্ধান আর মিলিল না। তাহার মুখে শুনিলাম তিনি পরদিবসই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পাশের বাড়ীতে ঢুকিয়াছিলেন এবং তারপর আর সে তাঁহার কোন খবর রাখে নাই। তিনি যেখানেই থাকুন, যদি আজিও বাঁচিয়া থাকেন তবে বন্ধু ও গুরুর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন ইহা আমার অনেকবার মনে হইয়াছে। আমার অনুমান মিথ্যা নহে তাহা বুঝিলাম সেদিন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার নিমন্ত্রণ পাইয়া। পিতৃত্যক্ত এষ্টেটের মালিক কুমার সাহেবরূপে আখ্যাত হইয়া তখন তিনি দুই হাতে স্ফূর্ত্তি লুটিতেছেন। শিকারের উপলক্ষ্যে বহুদূরে এক শূন্য নদীর তীরে তাঁহার তাঁবু পড়িয়াছে। উষ্ট্রপৃষ্ঠে আমি সেদিন সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছিয়া দেখি একেবারে চাঁদের হাট বসিয়াছে। পনের হইতে পঞ্চান্ন অবধি বয়সের বিভিন্ন জাতীয়া বাইজীদের তাঁবুর ঠিক মাঝখানটিতে তাঁহার তাঁবু পড়িয়াছে। পারিষদবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে রকমারি বোতল, গ্লাস ও অর্দ্ধভুক্ত লুচি-মাংসের পাত্র। পারিষদবর্গের সকলেই কেহ সম্পূর্ণ শয়ান, কেহ বা অর্দ্ধশয়ান। অনেকের চক্ষু মুদ্রিত, যিনি চাহিয়া আছেন তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু দেখিতেছেন না, শূণ্যমার্গে তাঁহার

চক্ষুদ্বয় ফ্যাল ফ্যাল করিতেছে। মধ্যস্থলে বহুমূল্য ফরাসের উপর একটি প্রৌঢ়া বাইজী তখন নৃত্যরতা। তাহারও কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট এবং নৃত্যোদ্যমে ডাইনে অথবা বাঁয়ে কখন কাত হইয়া পড়িবে—বলা কঠিন। হারমোনিয়ামওয়ালা বহুক্ষণ বেলো বন্ধ করিয়া দুই হাতই রীডের উপর যদৃচ্ছাক্রমে চালাইতেছে, বোধ হয় এতক্ষণে মনে প্রাণে বুঝিয়াছে "Heard melodies are sweet, those unheard are sweeter ;" তবলচি ডুগিতবলা উল্টাইয়া ধরিয়া উভয় যন্ত্রের পশ্চাদ্দেশ বাদ্য করিতেছে। প্রবেশমাত্র আমার চোখের দৃষ্টিতে ঘোর লাগিয়া গেল। বাইজী সাহেবা জড়িতচরণে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া বিকৃত কণ্ঠে গাহিল—

"মাশুক বেবফায়ো আব্‌কে জবানেওয়ালে—এ—এ—এ"

এবং নৃত্যের উদ্দেশ্যে ঘাঘ্‌রার প্রান্তদেশ উত্তোলন করিতে গিয়া আমার সম্মুখে শুইয়া পড়িল ও দুই হাত বাড়াইয়া আমার পদদ্বয় ধারণ করিয়া—"মাশুক বেদরদে"—পর্য্যন্ত বলিয়া ভুক্ত দ্রব্যগুলি আমার পায়ের উপর উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমি কুমার সাহেবের সন্নিধানে গেলাম ও তাঁহাকে ঝাঁকানি দিয়া চাঙ্গা করিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি বিহ্বল নেত্রে আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন—

"বাওবা খাসা মাল, আমার বাঙা ঘরে চাঁদের আলো।" আমি অগত্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া বোতলগুলির অবশিষ্ট এবং পাত্রগুলির ভুক্তাবশেষের প্রতি মনোনিবেশ করিলাম। তারপর সে রাত্রে কি হইয়াছিল তাহার খবর অন্তর্যামী বলিতে পারেন, আমরা ত তাঁহার খেলার পুতুল মাত্র, আমাদের জ্ঞান আর কতটুকু ?

২

পরদিন প্রভাতে কুমার সাহেবের তাঁবুর সহিত আমরাও পরিষ্কৃত হইলাম। আমার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, সেখানে গিয়া গত রাত্রির কাপড়চোপড় পরিত্যাগ করিয়া ভৃত্যদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে তেল মালিশ করাইতেছি এমন সময় একজন অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি লোক দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সেলাম জানাইল। লোকটির নাসা-পর্ব্বতটি যেন কে ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, চোখ দুইটির মাঝখানে এতটা ফাঁক যে প্রথম দর্শনেই মনে হয়—যেন চক্ষুনাসিকাহীন একটি মুখমণ্ডল গুড়ের কলসীর উপর বসিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। রাত্রি হইলে ভয় পাইবার কথা ছিল,—হুঁকাটা মুখ হইতে নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম —"কি চাও ?"

আগন্তুকের মুখগহ্বর হইতে একটি জমাট আওয়াজ বাহির হইয়া আসিল "এজ্ঞে, আমার নাম বদন।"

নামের সার্থকতা আছে বটে—কহিলাম, "তা'ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কি মনে করে আসা হয়েছে ?"

"বাইজী সাহেবা সেলাম জানিয়েছেন।"

ঠিক এইটি আশাও করিতেছিলাম, আশঙ্কাও করিতেছিলাম। প্রকাশ্যে বলিলাম বটে—"যাচ্ছি, যাও",—বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল, দক্ষিণের বাতাসে কচি পাতা যেমন করিয়া কাঁপে সেরূপ নহে— বুড়া পাতা ঝরিয়া পড়িবার পূর্ব্বে শীতের বাতাসে যেমন কাঁপিয়া উঠে,—এ ঠিক সেই প্রকার। তথাপি সেই কাঁপনের মধ্যেই কত আশা, কত ভয়, কত কুণ্ঠা ও কত লজ্জা! তাহার যে শিরা উপশিরা

পাকিয়া হলুদবর্ণ হইয়াছে, তাহারই অন্তরে অন্তরে নিত্যকাল ব্যাপিয়া সবুজ আকাঙ্ক্ষার জয়োল্লাস ধ্বনিত হইতেছে, তাহা আমি ত এই বয়সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। অতএব কেন আর বিড়ম্বনা, বাইজীর আমন্ত্রণ রক্ষা করাই শ্রেয়। ভৃত্যকে তেলের বাটি লইয়া অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

তাঁবুর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া দেখি বাইজী বিছানায় বসিয়া গড়গড়ার নলে সুখটানটি দিয়া কল্যকার সেই তবলচির হাতে নলটি ছাড়িয়া দিল। আমাকে দেখিয়া জিভ কাটিয়া মাথার উপর কাপড়টা টানিয়া দিয়া পরিষ্কার বাংলায় কহিল, "ওমা ছিছি, তোমার সামনেই যে তামাকটা টেনে ফেললাম, হতভাগা বোদেটাও হয়েছে এমনি যে,— দৌড়ে এসে খবরটা দিলেই হত।"

বাস্তবিক, বাইজীর মুখ-নাক হইতে সুখটানের ধোঁয়াটা তখনও রহিয়া রহিয়া বাহির হইতেছিল। কিন্তু আমি বড় দ্বিধায় পড়িয়া গেলাম। কাল রাত্রে বোধ হইয়াছিল বাইজী খাঁটি লক্ষ্ণৌএর লোক, তাহা নহে, বাইজী বাঙালী, এবং কথার টানে বোধ হইল আমাদেরই অঞ্চলের লোক। বয়স চল্লিশ অথবা পঁয়তাল্লিশ—বলা কঠিন। রংটি কালোও বলা চলে না, অথচ ফর্সাও নহে, শ্যামবর্ণই বা তাহাকে বলি কি করিয়া? চোখ দুটি ছোট কি বড় সে প্রশ্ন মনে জাগে না। কেবল সম্মুখের সিঁথিটা প্রশস্ত হইয়া টাকের আকার ধারণ করিয়াছে। নাকটি বাঁশীর মত অথবা খাঁড়ার মত তাহা ভাবিয়া লাভ নাই। বাইজীর উপরের ওষ্ঠটি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া নাসিকার তলদেশে সংযুক্ত হইয়াছে এবং উপরের পাটীর নাতিক্ষুদ্র দন্তচতুষ্টয় সর্ব্বদাই বিকশিত হইয়া আছে। ত্রিভুজাকার মুখখানি যেন হাসি হাসি করিতেছে। জন্মাবধি বাইজীর মুখভঙ্গি এবম্প্রকার অথবা কোন সময় অস্ত্রোপচার হেতু এরূপ

হইয়া গিয়াছে—এ প্রশ্নও নিরর্থক। কিন্তু এই বয়সেও বাইজীর শরীরের বাঁধুনি অক্ষুণ্ণ আছে, পঁয়তাল্লিশ ত মনেই হয় না, পঁয়ত্রিশ, এমন কি পঁচিশ এবং সময় বিশেষে পনের বলিয়াও ভ্রম হইতে পারে। মনের সঙ্গে তর্ক করিয়া কিন্তু তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে সত্যই ইহাকে আর কখনও দেখি নাই। কিন্তু কবে এবং কোথায় দেখিয়াছি, কে ঠিক এমনি করিয়া বার বার তাহার জিহ্বার প্রান্তদেশ উন্মুক্ত দাঁতগুলির উপর বুলাইয়া লইত এবং কেবলই দাঁত দিয়া অধর দংশন করিত,—তাহা মনে পড়িয়াও পড়িল না। সবিনয়ে কহিলাম, "আমার বহুভাগ্য যে বাইজী সাহেবা সকাল বেলাতেই স্মরণ করেছেন।"

সে ক্ষণকাল উন্মুক্ত দন্তপংক্তিদ্বারা অধর চাপিয়া মিহি গলায় কহিল—"আর সকলে আমায় বাইজী বলে বলুক, তুমি কেমন করে বল ক্যাব্‌লা-দা?"

চমকিয়া উঠিলাম। বাল্যকালের বিস্মৃত নাম এই সুদীর্ঘকাল পরে অপরিচিতা নারীর মুখে শুনিলে কে না চমকিত হয়? আমার এই নামটি পাঠশালার পণ্ডিত মশাইএর দেওয়া, তিনি স্ত্রী-কান্ত না বলিয়া ক্যাব্‌লা-কান্ত বলিয়া ডাকিতেন। ছেলেবেলায় নাকি আমার নাক দিয়া সদা সর্ব্বদা সিকনির ধারা ঝরিত ও দাঁড়াইলে অথবা চলিতে গেলে আমার পিঠে, কোমরে ও হাঁটুতে তিনটি বাঁক দেখা দিত, জোরে দৌড়িতে গেলে লোকে বলিত যেন লাটিমের মাথা টলিয়া পড়িবার পূর্ব্বে পাক খাইতেছে। পণ্ডিত মশাই আমাকে তাঁহার গরু ও ছাগলের হেপাজতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমিও মনকষার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলাম ও গোয়াল পরিষ্কার করিবার ছুতায় প্রায়ই পণ্ডিত মশায়ের ঁকাটি তথায় লইয়া গিয়া স্বচ্ছন্দে টানিয়া বাঁচিতাম। যেদিন পণ্ডিত মশাইএর তামাক কম পড়িত, আমাকে গলাধাকা দিয়া

দূর করিয়া দিতেন। বলিতেন, "ক্যাব্‌লা ব্যাটার জ্বালায় এবার তামাক খাওয়া ছাড়তে হ'ল দেখছি।"

বিস্মৃত অতীত মনের মধ্যে ছুটপাট করিয়া উঠিল, অথচ দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল না। বাইজী কহিল, "ওকি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো। তুমিও যে তামাক খাও তা জানি, কিন্তু দেব কিসে? জেনে শুনে ত আর আমার মুখের নলটা তোমায় ধরিয়ে দিতে পারি না। আচ্ছা বর্ম্মা-চুরুট আনিয়ে দিচ্ছি—"

"থাক্ থাক্, বর্ম্মা চুরুট আমার কাছেই আছে।"

"আছে? বেশ, তা হ'লে ধরিয়ে একবার কাছে এসে বোসো—ঢের কথা আছে। বাবা ভালো আছেন?"

"না, তিনি মারা গেছেন।"

"এ্যাঁ মারা গেছেন, মা?"

"তিনি আগেই গেছেন।"

"ওঃ তাইতেই—" বলিয়া বাইজী ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এই প্রৌঢ়া রমণীর অন্তরে হঠাৎ আমার প্রতি এতখানি বাৎসল্যরস কেন জাগিয়া উঠিল তাহাই ভাবিয়া আকুল হইলাম।

"এখন তা হ'লে এই রকম বেহারী জমিদারের মোসাহেবি ক'রেই কাটাচ্চ বল!"

শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পিত্ত অবধি জ্বলিয়া গেল। রুক্ষকণ্ঠে বলিলাম, "আচ্ছা কে তুমি? কাল রাত্রে ত প্রথম দেখলাম তোমায়, তখন তোমার যে অবস্থা তাতে চেনাশুনা হওয়া দূরে থাক, কাছে দাঁড়ানও নিরাপদ ছিল না, তবে সে কথা তোমার মনে পড়বে না। যাক, কিন্তু আমার সম্বন্ধে এ সব জেনে তোমার লাভ কি?"

"সংসারে লাভ-ক্ষতিটাই কি সব ক্যাব্‌লা-দা? স্নেহ, মায়া, মমতা

—এ সব কি কিছুই নয়, ভালবাসার কথাটা না হয় নাই বললাম। তাই বটে, তা না হ'লে ছেলেবেলায় যাকে দেখলেই পেটের উপর ধাঁ ক'রে তিন লাথি মেরে দিতে, সে যদি কোন কারণে কাল রাত্রে তোমার পায়ের উপর একটু অত্যাচার ক'রে থাকে, সে নিয়ে এমন খোঁটা দিতে না।"

বিস্মৃতির আগল ধড়াস্ করিয়া খুলিয়া গেল। তখন আমার বয়স বারো কি তেরো। আমাদের পাড়ার পুরলক্ষ্মী ও কুললক্ষ্মীর বিধবা মাতা যখন একটি ছুতার-মিস্ত্রীর সহিত একদিন রাত্রে কোথায় চলিয়া গেলেন—তুইটি মেয়েরই ভরণপোষণের ভার পড়িল তাহাদের এক জ্ঞাতি খুড়ার উপর। পুরলক্ষ্মীর পৃষ্ঠে ছিল একটি কুঁজ এবং কুললক্ষ্মীর মুখখানি ছিল একটি খরগোসের মত। তাহারা উভয়েই পাঠশালার ছাত্রী ছিল। পুরলক্ষ্মীর কুঁজটা কতক সহ্য হইত, কিন্তু কুললক্ষ্মীর উদ্গত ওষ্ঠদ্বয় দেখিলেই ক্রোধে আমি জ্ঞানশূন্য হইতাম। তাহার উপর ইহার পেটটি আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকের মত ফুলিয়া থাকিত, হাত-পা ঠিক ঝাঁটার কাঠির মত, মাথায় চুল ছিল না বলিলেই হয়,—যাহা ছিল তাহাও অজস্র উকুনে ভরা। সে বছরটা দারুণ পাঁচড়ায় আমার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গিয়াছিল, কুললক্ষ্মী প্রত্যহ নিমপাতার জল দিয়া আমার ঘা ধুইয়া দিত এবং পুরস্কারস্বরূপ অবশেষে তাহার স্ফীত উদরের উপর ঝাড়িয়া লাথি মারিতাম। সে কাঁদিয়া আকুল হইত, তথাপি কোনদিন বলিত না—"ক্যাবলা-দা আর লাথি মেরো না।"

সেই সাত বছরের মেয়ে যে নীরবে এত অত্যাচার কেন সহ্য করিত তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। কোনদিন হয়ত বলিতাম, "দেখ কুলি, আজ যেখান থেকে পারিস আমার জন্য

বিশটা ল্যাঠামাছ ধরে আনবি, তাড়ির চাট করতে হবে। আর যদি না পারিস ত রাত্রি পর্য্যন্ত এই শীতে একগলা জলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।" বেচারা হয়ত উনিশটি যোগাড় করিয়াছে, তথাপি রাত্রি দশটার এক মিনিট আগে জল হইতে উঠিতে দিতাম না, বেত লইয়া পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতাম। ক্রমশঃ আমার অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল,—কোনদিন একঠ্যাং তুলিয়া সারাদিন দাঁড় করাইয়া দিতাম, কোনদিন কুকুরের মত তাহাকে দুই হাতে দুই পায়ে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতে হইত। শেষে একদিন বলিয়া বসিলাম শুধু কুকুরের মত হাঁটলেই হবে না, তোকে যখনই ব'লব, কুকুর ডাকতে হবে। সে তাহাই করিত। আমি তাহাকে ডাকিবামাত্র সে বলিত "কেঁউ" আর পাঠশালার ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। শেষে এমন হইল যে অন্যলোকের আহ্বানেও ইহাই তাহার সাড়া দিবার পদ্ধতি দাঁড়াইয়া গেল। তাহার জ্ঞাতিখুড়া একদিন নেশার মাথায় ইহাতে অত্যন্ত অপমানবোধ করিয়া তাঁহার খড়মের একটি ঘা মারিলেন ইহার মুখে, ফলতঃ কুললক্ষ্মীর উপরের ঠোঁটটি দুই ফাঁক হইয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও খুড়া মহাশয়ের ক্রোধ প্রশমিত না হওয়ায় তিনি পাড়ার ভেলি কুকুরকে ধরিয়া আনিয়া সেই রাত্রেই তাহার সহিত পুরলক্ষ্মীও কুললক্ষ্মীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দিলেন। পৌরহিত্য করিলেন তিনি স্বয়ং এবং বিবাহবাসরে নিমন্ত্রিত হইল গ্রামের যতগুলি চতুষ্পদ প্রাণী। এখনও আমার মনে পড়ে, সেরাত্রে কুকুরের চীৎকারে পাড়ায় টেঁকা দায় হইয়াছিল। বিবাহান্তে ভূরিভোজনের ফলেই হউক অথবা অভাগীদের কপালে স্বামীসুখ নাই বলিয়াই হউক, ভেলি ইহার দুইতিন দিন পরেই পরলোক গমন

করিল এবং উভয় ভগিনীর হাতের নোয়া ও সিঁথির সিঁদুর ঘুচিল। নিদারুণ শোক সহিতে না পারিয়া পুরলক্ষ্মী ইহারই কয়েকদিন পরে স্বামীর অনুগমন করিল। আরও কিছুদিন পরে শুনিলাম কুললক্ষ্মী অন্তঃস্বত্বা। যথাসময়ে সে এক শিশু সন্তান প্রসব করিল বটে, কিন্তু তাহার আকৃতি আদৌ মানুষের মত নহে, আমাদের গ্রামে সারমেয় অবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এইরূপ একটি জনরব চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া যাওয়ায় গ্রামান্তর সমূহ হইতে লোকজন তীর্থযাত্রীর মত তাহাকে দেখিতে আসিল। অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে সর্দ্দিগর্ম্মী হইয়া অকালে শিশুটি ইহলীলা সাঙ্গ করিল। সেদিনকার দৃশ্য আমি আজিও ভুলি নাই। চতুর্দ্দিকে খোল করতাল লইয়া বহুলোক সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, মধ্যস্থলে চন্দনমাল্যভূষিত সারমেয়-অবতারের মৃতদেহ কোলে লইয়া ম্যাডোনার মূর্ত্তির মত বসিয়া আছে কুললক্ষ্মী; তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু যাক সে কথা, যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। পুত্রশোকবিধুরা মাতা কুললক্ষ্মী ইহারই কিয়দ্দিবস পরে আমাদের পাড়ার জগা নাপতের সহিত মনের দুঃখে দেশান্তরে চলিয়া গেল—আর তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া গেল না। কয়েক বৎসর পরে একদিন জগা ফিরিয়া আসিয়া গ্রামে রাষ্ট্র করিয়া দিল যে কুললক্ষ্মী কাশীর গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে, সে স্পষ্ট দেখিয়াছে কুকুরের ন্যায় একটি জানোয়ার হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে জলের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

আজ যাহার সম্মুখে এইক্ষণে বসিয়া বর্ম্মা চুরুটে টান দিতেছি—এ সেই কুললক্ষ্মী,—বর্ত্তমানে "কচুরি বাই" নামে অভিহিতা। তাহা না হয় হইল। সারমেয়-বিলাসিনী কুললক্ষ্মী মরিয়া না হয় কচুরি বাই হইয়াছে, কিন্তু বাল্যে যে ক্যাব্‌লা-দার নেশার খোরাক যোগাইতে

না পারিয়া তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না, যাহার পদাঘাতে প্রত্যহ তাহার পেট ফাটিবার উপক্রম হইত, সে যে সঙ্গোপনে তাহার সেই ক্যাব্‌লা-দাকেই এমন নিরতিশয় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল এবং তাহার এই সুদীর্ঘ জীবনের অবকাশে, কত দেশ কাল ও পাত্রের সংঘর্ষের মাঝখানে, কত সহস্র রজনীর প্রেমোৎসবের কোলাহলে এবং কত কত ধনীর পুত্রকে ফকিরে পরিণত করিবার আয়োজনের অন্তরালে,—সে যে তাহার বাল্যপ্রেমের শিশুলতাটিকে মারিয়া ফেলে নাই, পক্ষান্তরে তাহাকে আপন বক্ষমধু দিয়া সুপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, এবং আজ যখন এই পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে আমার সম্মুখে তাহার মনের কপাট অতর্কিতে খুলিয়া গেল—আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখি যে সেই শিশু-লতাটি এতদিনে সকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে—তখন বিস্ময়ে হতবাক হইয়া চুরুটের ধূমোদ্গীরণ করা ব্যতীত আর উপায় আছে কি? তাই বলি হে রাধানাথ, আরও না জানি কত আশ্চর্য্য ঘটনা তুমি আমাকে দেখাইতে চাও!

লোকে বলে, ওঃ অমুক জায়গায় কি ব্যাপার চলিতেছে তাহা আর জানিতে বাকী নাই, অমুক লোক কিরূপ চরিত্রের তাহাও কি বুঝাইতে হইবে? একথার মানে কি তাহা সবিশেষ জানা আছে। কিন্তু আমি, নিজের জীবন আলোচনা করিয়া, এই সব শুনিয়া তাহাদের লজ্জায় আপনার মাথাটা তুলিতে পারি না, ধূলায় লুটাইয়া পড়ি ও চক্ষু বুজিয়া আপনার মনে মনে বলি, হারে আমার পোড়া কপাল। তুমি মনে কর এই যাহা চোখের সম্মুখে ঘটিতেছে, তাহা ব্যতীত আর কিছুই ঘটে নাই! একবার একটু নির্জ্জলা মাল টানিয়া লও দেখি, কেমন দেখিতে পাও কি না—তাহা ছাড়া আরও কত ব্যাপার ছায়াবাজীর মত খেলিয়া যাইতেছে! দুইএ দুইএ চার, কোদালটা

কোদাল, নাকটা কান নহে নাকই, এই ত তোমাদের জ্ঞান? কিন্তু আমি কতবার মনে মনে ভাবিয়াছি হয়ত ইহাই অভ্রান্ত নহে, ইহারও ব্যতিক্রম হইতে পারে। সে কথা প্রকাশ করিয়া বলি নাই, কারণ তদ্দণ্ডেই তোমরা বলিয়া বসিবে "ব্যাটা গুলিখোর!" এইত? কিন্তু এটাও কি মনে পড়ে না যে পৃথিবীর সব লোকই যদি* এক সঙ্গে নেশা করে তবে তাহারা ব্যতিক্রমটাই নিয়মস্বরূপ দেখিতে থাকিবে? তাহা যদি হয় তবে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা—এ লইয়া তোমরা বড়াই কর কি বলিয়া? ছি ছি, একথা মনে রাখিয়ো যে মানুষের মধ্যে যিনি আত্মা আছেন—তিনি আত্মরস অশেষ প্রকারে পান করিতে চান, তোমরা যেটাকে নেশায় বেঘোর অবস্থা বল, তাহা সেই রসেরই প্রকারভেদ মাত্র। যাক, যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি, তোমাদের সহিত তর্ক করিব না, কারণ আমি বিশেষরূপে টের পাইয়াছি যে মানুষ শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার সমস্ত পরিচয় পায় না। আজ যে ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইয়াছে, সেই ব্যাটাই যে কাল লোকের গলায় ছুরি বসাইবে না, ইহা কেহ হলফ করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু যাক সে কথা। হাঁ, যাহা বলিতেছিলাম, কচুরি বাই। চোখ মেলিয়া দেখি আমার হাতের চুরুট হাতেই নিভিয়া গিয়াছে—কচুরি বাই কখন উঠিয়া গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করি নাই। দারোয়ান বলিল, "বাবু সাব্ বাইজী সাহেবা রোতী থি।" তাহাকে শান্ত হইবার অবকাশ দিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলাম।

৩

সন্ধ্যার সময় তাজা হইয়া কুমার সাহেবের তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া দেখি গল্পের মধ্যে সেরা গল্প—ভূতের গল্প জমিয়া উঠিয়াছে। প্রথমটা

খেয়াল করি নাই, কিন্তু বৃদ্ধ খোট্টা ভদ্রলোকটি শেষকালটা এমন জমাইয়া দিলেন যে তৎকালের জন্য আমার উভয় হস্ত দাড়ির অন্তর্নিহিত দাদের কাতর আহ্বান বিস্মৃত হইল। এই গ্রামেরই উপকণ্ঠে প্রায় দশ হাজার বৎসরের মহাশ্মশান বিরাজিত, এখানকার প্রথানুযায়ী পানাসক্ত ব্যক্তিগণের মৃতদেহ দাহ না করিয়া সেখানে নিক্ষেপ করিয়া আসা হয়। ফলে নরকঙ্কালের স্তূপ সেথায় পর্ব্বত-প্রমাণ উচু হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রিকালে আজিও তাহারা মাংসচর্ম্মহীন কণ্ঠের আকুল তৃষ্ণায় শ্মশানের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, কোন পথিক যদি এই নিশীথ সময়ে পথ ভুলিয়া সেখানে যাইয়া পড়ে, তাহার নিস্তার নাই। সঙ্গে মদের বোতল থাকিলে তাহা সম্পূর্ণ উজাড় করিয়া শ্মশানভূমিতে ঢালিয়া দিতে হইবে, তৃষিত নরকঙ্কালের দল ভিড় করিয়া তাহাদের ওষ্ঠ-গণ্ডহীন দন্তরাজি দ্বারা সেইটুকু সুধার আস্বাদ পাইবার জন্য পরস্পর বিপুল রবে ঠোকাঠুকি সুরু করিবে, সেই ফাঁকে যদি সরিয়া পড়িতে পার ত রক্ষা, নচেৎ পৈতৃক প্রাণটি দিয়া আসিতে হইবে। ভূতের গোষ্ঠী এইরূপে উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে, শ্মশানে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তাহারা এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িতেছে, এমন কি এখনও যে তাহাদের দুই একজন এই তাঁবুরই বাহিরে দাঁড়াইয়া এখানকার এই উগ্র গন্ধে ছটফট করিয়া মরিতেছে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? আমার ঠিক পিছনটিতে বসিয়া কচুরি ভূতের গল্প শুনিতেছিল, তাহার নিশ্বাস এতক্ষণ আমার কাঁধে পড়িতেছিল, বক্তার শেষ কথাটা শুনিবামাত্র সে সভয়ে আমাকে জাঁকিয়া ধরিল। তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, আমার দেখাদেখি বাকী সকলেও উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল,

হাসিতে হাসিতে কেহ কেহ উপুড় হইয়া পড়িল, তথাপি হাসি আর থামে না।

বৃদ্ধ লোকটি আমার উপর চটিয়া কহিলেন, "বাবুসাব্ আপ্‌নে হাঁস্ দিয়া, আগর আপ ইসি বখ্‌ত হুঁয়া যাকে আপোস আনে সেকেঙ্গে তব্ হম কহেঙ্গে হাঁ, আপ্ সেরকা বাচ্চা হ্যায়,—শূয়ারকা নেহি।" এতদ্ব্যতীত বাঙালী জাতির অশ্রাব্য ভাষায় নিন্দা সুরু হইল, আমরা নাকি পড়িয়া মার খাই, লাঠি দ্বারা পিটিলেও আমাদের পেট হইতে টুঁ শব্দ বাহির হয় না এবং হিন্দুস্থানীরা যাহা করে তাহা বুক ফুলাইয়া করে,—অর্দ্ধেক গ্লাস সেবন করিয়াই আমরা নাকি বেহুঁস হইয়া পড়ি, তাহারা বোতলের উপর বোতল পান করিয়াও ঠিক থাকে, ইত্যাদি। সুস্থচিত্তে এসব সহ্য করা অসম্ভব। নিকটস্থ পানপাত্র তুলিয়া লইয়া তাহা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া কহিলাম, "এহি দারুকা কসম হম আভি লে লিয়া, ইসি বখ্‌ত হম্ যাতেহেঁ, আগর নেহি আপোস আবেঁ তব্ হম্ ইস্ জিন্দিগীভর দারু পিনা ছোড় দেঙ্গে।"

ফিরিয়া না আসিতে পারিলে আমার শপথের মূল্য কি থাকিবে তাহা তখন সম্যক্ বুঝিবার মত মাথার অবস্থা আমাদের কাহারও ছিল না। যাহা হউক বাক্যব্যয় না করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

নিজের তাঁবুতে গিয়া গোটা তিনেক ভর্ত্তি বোতল পকেটে পূরিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ আমার কাছায় টান পড়িল। ফিরিয়া দেখি—কচুরি বাই। রাগও হইল, হাসিও পাইল। কহিলাম, "আঃ ছাড়, এখন আর জ্বালিয়ো না।"

সে যে কাঁদিতেছিল অন্ধকারে তাহা বুঝিতে পারি নাই, ভারী গলায় সে কহিল—"তোমার যাওয়া হবে না।"

"হবে না? তার মানে?"

"মানে আবার কি, আমি যেতে দেব না।"

এ কথার কি জবাব দিব ? সে কহিল, "যাকে এতদিন পরে শেষ বয়সে খুঁজে পেয়েছি, তাকে এত শীগ্‌গির ভূতের পেটে যেতে দেব না।"

"ভূত আমি মানি না।"

"ভূত নেই না কি যে তুমি মান না ?"

"হাঁ আছে, আর তা সাম্‌নেই দেখতে পাচ্ছি।"

"তবে আর কি জন্যে যাবে ? ফিরে গিয়ে বললেই হবে দেখে এলাম।"

"কিন্তু ভূতের জন্য যে মাল সঙ্গে নিয়েছি তা ত তাকে দেওয়া দরকার,"—বলিয়া একটি বোতলের মুখ খুলিয়া অর্দ্ধেকটা কচুরি বাইএর মুখ চিরিয়া ঢালিয়া দিলাম। সে তাহাতেও নিরস্ত হইল না, কহিল, "ক্যাব্‌লা-দা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব, তোমায় একলা যেতে দেব না।"

"বেশ চল।"

"আহাহা, তা হ'লে আর সুখ্যাতির অন্ত থাকবে না। এম্‌নিই ত শুঁড়ির দোকান ফেল মারিয়েছে বলে সুনাম আছে, তার ওপর কাল যখন চতুর্দ্দিকে রটে যাবে যে ক্যাব্‌লাকান্ত কচুরি বাইএর হাত ধরে ভূত দেখতে বেরিয়েছিল—তখন আর কিছু বাকী থাকবে না! বলি ঘরে কি একেবারে আউট হ'য়ে গেছ নাকি ? ছিছি তুমি ত এমন ছিলে না ক্যাব্‌লা-দা, নেশাপত্রগুলোই না হয় করতে শিখেছিলে, তা ব'লে এতদূর বয়ে গেছ তা ত জানতাম না! হায় আমার পোড়া কপাল, তা না হ'লে আমি এতদিন হিন্দুস্থানীদের মুজ্‌রাতে নেচে বেড়াই ! কথা শোনো ক্যাব্‌লা-দা—"

বার বার ক্যাব্‌লা ক্যাব্‌লা শুনিয়া মেজাজটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল,—কচুরি বাইএর স্ফীত উদরের উপর ক্যাৎ করিয়া মারিলাম এক লাথি—সে আলুর বস্তাটির মত পায়ের কাছে পড়িয়া গেল, কোন সাড়াশব্দ করিল না। আমিও শ্মশানের পথে প্রস্থান করিলাম।

চলিয়াছি ত চলিয়াছিই, পথের আর শেষ নাই। মেজাজটা প্রথমে গোলাপী ধরনের হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা ঘোর লাল হইয়া আসিতেছে।

"বাপ্‌"

চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি—বিস্তীর্ণ বালুচর ব্যাপিয়া নিস্তব্ধ অন্ধকার, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই। দক্ষিণদিকটায় বোধ হইল একপাল লোক হিন্দুস্থানী প্রথায় মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া ও কম্বল মুড়ি দিয়া বাঁধের ধারে শৌচক্রিয়া করিতে বসিয়া গিয়াছে। বুঝিতে বাকী রহিল না যে এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাশের ঝোপ। নিকটেই শীর্ণকায়া তটিনীর জল খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ারের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জলের সান্নিধ্যে আমার উপরোক্ত কল্পনাটির আনুকূল্য বাড়িবে বই কমিবে না মনে করিয়া গোঁফের আড়ালে একটু মুচকি হাসিয়া লইলাম। ক্রমশঃ অন্ধকারটা গাঢ় হইয়া চতুর্দ্দিক ভারী বোধ বোধ হইতেছে, বায়ুমণ্ডলের চাপ যেন হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, অথবা যেন আকাশপ্রমাণ উচু জলের নিম্নস্তর দিয়া হাঁটিতেছি, দুই হাত দুই পা দিয়া আর ঠেলিতে পারা যায় না। কিছুক্ষণ পরে প্রতীয়মান হইল—আমি সম্মুখে অগ্রসর হইতেছি না, কেবল বাঁধের উপর একবার দক্ষিণে পুনর্ব্বার বামে কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় ঢেউএর বুকে পান্‌শী খানির মত দুলিতেছি; এমতাবস্থায় পাল নামাইয়া দেওয়া দরকার, নচেৎ উল্টাইয়া যাইব মনে করিয়া গায়ের চাদরখানি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ

করিলাম। এবার অনেকটা বেগ সঞ্চয় করিতে পারিলাম বটে —আবার কিয়ৎকাল পরে বোধ হইল প্রকৃতপক্ষে মাটির উপর দিয়া হাটিতেছি না, বাদুড়ের ন্যায় উপরে পা নীচে মাথা করিয়া ঝুলিতেছি। শরীরটাকে সোজা করা দরকার বিবেচনা করিয়া পদদ্বয় ও মস্তক পরস্পর বিপরীত দিকে ঘুরাইবার চেষ্টা করিলাম। অনেকটা হইল, তবে সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে পারিলাম না, চিৎ হইয়া মাটির উপর শুইয়া পড়িলাম; যাই হোক স্বর্গের দিকে পা করিয়া দেবগণের অভিশাপ বহন করিতে হইবে না মনে ভাবিয়া আনন্দ অনুভব করিলাম, —এ বরং ভাল, একরকম মাঝামাঝি অবস্থায় আছি। কিন্তু আবার নূতন উপদ্রব সুরু হইল. মাথার উপর সিমুল গাছের ঘন ডালপালা যেন জটায়ুর মত পক্ষ মেলিয়া আমাকে ছোঁ মারিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইবে, এবং আমি লোকটাও এমন অন্তঃসারশূন্য হইয়া গিয়াছি যে অচিরে আপনিই বেলুনের মত শূন্যমার্গে উঠিয়া পড়িব। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম, আমার পকেটের বোতলগুলাও কি এত হাল্কা হইয়া গেল নাকি? তাহারা ত মালদার লোক, রীতিমত ভারী হইবার কথা! অথবা আমার অদৃষ্ট, শুনিয়াছি সময় বিশেষে স্বর্ণমুষ্টি ও ধূলিমুষ্টি হইয়া যায়! উপরে চাহিয়া দেখি আকাশের তারাগুলি আর তারা নাই, সহস্র ফণীর উজ্জ্বল চক্ষুর মত তাহারা ঠিক আমার মাথার উপরেই জ্বলিতেছে, এখনি উহাদের উদ্যত ফণাগুলি ঠিক আমার তেলোটির উপর পড়িল বলিয়া! খাঁ করিয়া কাপড়টা খুলিয়া মাথায় জড়াইয়া ফেলিলাম, মাথাটা বাঁচানো চাই। অমনি মনে হইল তাহা ত নহে, এ ত আমি বাসুকী নাগের ফণার নীচে নীচে দেবকী-নন্দনকে কোলে করিয়া এক ঝড়ের রাত্রে নদী পার হইতেছি। পকেটের বোতলটি বাহির করিয়া তাহাকে শিশুর মত দুই হাতে বক্ষে ধারণ

করিয়া অগ্রসর হইব—এমন সময় ঠিক পিছন হইতে আওয়াজ হইল—

"গাঁক্"

হাসিয়া মনে মনে বলিলাম ষণ্ডরাজ, এতরাত্রে আর জ্বালিও না বাবা! কিন্তু দূর হইতে যেন একপাল ষাঁড় তাড়া করিয়া আসিল, উপায়ান্তর না দেখিয়া তাড়াতাড়ি পাশের খেজুর গাছটি বাহিয়া উঠিয়া পড়িলাম—ষাঁড়ের পর ষাঁড় কানের পাশ দিয়া ভীমবেগে দৌড়িয়া চলিল। আমার মুখে ও চোখে খর্জ্জুর-বৃক্ষ-বাসী পক্ষীকুল বার বার পূরীষোৎসর্গ করিবার পর জ্ঞান হইল, ইহা ষাঁড় নহে বাতাস। নামিয়া আবার পথ চলিতে সুরু করিলাম। ওই সেই শ্বেত কঙ্কালের স্তূপ নয়? হঁা, তাই বটে, কিন্তু অদূরে ও কিসের আগুন? নিকটে গিয়া দেখি একটি নির্ব্বাপিতপ্রায় চিতা জ্বলিতেছে, আগুনটা মজিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ মনে হইল সারা শ্মশানময় যেন চাপা অট্টহাসির কলরোল উঠিল, হাসির পর হাসি সে হাসি, আর থামে না। তাড়াতাড়ি একটি বোতলের মুখ খুলিয়া শূন্যে ছড়াইয়া দিলাম। বাস্, সব চুপচাপ। চিতার দিকে চাহিয়া দেখি যেন একটি অর্দ্ধদগ্ধ বিকলাঙ্গ ব্যক্তি অগ্নিশয্যার উপর অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছে। আমারই দিকে উহার দৃষ্টিনিবদ্ধ এবং কি অতৃপ্ত আশার আর্ত্তনাদ উহার করুণ চাহনিতে! যদি এখনও লোকটিকে বাঁচাইয়া উহার আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে পারি তাহাতেও লাভ আছে চিন্তা করিয়া চিতায় ঝাঁপ দিবার সঙ্কল্প করিলাম। অকস্মাৎ শ্মশানের মধ্যে যেন লক্ষ তাড়ির কলসী একসঙ্গে ফাটিয়া গেল, লক্ষ মদের বোতল একসঙ্গে চুরমার হইল, লক্ষ গাঁজার কলিকায় একসঙ্গে টান পড়িল;—চাহিয়া দেখি কি দারুণ অন্ধকার! চিতার আগুন দূরের অন্ধকারকে গাঢ়তম করিয়া তুলিয়াছে! সৃষ্টির সমস্ত আলো যেন কে পাম্প করিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে.

অন্ধকারের ভ্যাকোয়ামে নিশ্বাস ফেলিবার আর উপায় নাই। মনে হইল আমার নিশ্বাস ত পড়িতেছে না, তবে কি মরিয়া গেলাম না কি? কানে হাত দিয়া দেখি, না না, কান দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতেছে, ভয়ের কারণ নাই। কে যেন কানে কানে বলিল—ওকি, আজ বহুদিন পরে তুই আমাদের তৃষ্ণা মেটালি, আয় একেবারে আমাদের মধ্যে এসে বোস, অমন অস্পৃশ্যের মত ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? এই বলিয়া যেন কাহার পদধ্বনি আমার সম্মুখ দিয়া শ্মশানের মধ্যে মিলাইয়া গেল। আমিও গরুর মত টানা হইয়া মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলাম, অমনি অসংখ্য নরকঙ্কাল আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আর সকলের দৃষ্টিই কি আমার বগলের অবশিষ্ট বোতলটির উপর! হতভম্ব হইয়া এটিকেও হাতছাড়া করিব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় তাহারা ফিস ফিস করিয়া পরস্পর কি কথাবার্ত্তা সুরু করিয়া দিল। তাহাদের কথাগুলা বাতাসের মধ্য দিয়া আমার বুক, পেট, ও পাঁজরা ভেদ করিয়া এপার ও পার হইতে লাগিল. যেন কয়েকটি বরফের করাত আমার স্নায়ু গুলিকে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া যাইতেছে। আমার কোমরে টান লাগিয়া দেহটি অগ্রপশ্চাৎ দুলিতেছে, অথচ মাথাটি ঠিক এক জায়গায় আছে। আর কি ভারী এই মাথাটা! যেন একটি লোহার তাল। এতক্ষণে ইহার ঢিপ করিয়া নাচে পড়িয়া যাওয়া উচিত ছিল, ইহা যে এখনও স্বস্থানে আছে, তাহাও এই প্রেতলোকের কীর্ত্তি। হঠাৎ বোতলটি স্খলিত হইয়া আমার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল ও ছিপিটা খুলিয়া যাওয়ায় অভ্যন্তরস্থ মাল মৃদু শব্দ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। অমনি যেন অস্থিমুণ্ডের দল আমার পায়ের তলার মাটি শুষিতে লাগিল। বারে! আমিই শুধু বঞ্চিত হইব আর তোমরা স্ফূর্ত্তি করিবে, এত বোকা পাও নাই আমাকে! আমিও মাটিতে মুখ দিয়া শুষিবার চেষ্টা

করিলাম, কিন্তু দেখি প্রেতনিঃশ্বাসে মদ্যও জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। আমার ঠোঁট রগড়ানোই সার হইল, একটুও গলা ভিজিল না। অথচ আর উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি নাই, অগত্যা বোতলটাকে উপাধান করিয়া লম্বা হইয়া পড়িলাম, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করিয়া দরদী বন্ধুগণ কিছু জায়গা ছাড়িয়া দিল। চক্ষু বুজিয়া দেখি, মরি মরি, কি বাহার! কে বলে যে আলোই সুন্দর আর কালো কুৎসিৎ! এত বড় মিথ্যা কথাটা কিরূপে এতদিন জগতের লোক মানিয়া লইয়াছে? মনে হইল গোঁফের চুল কালো, কালো কয়লায় জাহাজ চলে, কালো গরুতে বেশী দুধ দেয়, কালো বেরালের পয় আছে, কালো ছাগলের চর্ব্বি বেশী, কালো মেয়েমানুষের গা ঠাণ্ডা, তবে একটু বোট্‌কা গন্ধ, তা হোক। গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিলাম—

হায় গো কালো মন্দ কিসে
বিচার ক'রে দেখলে পরে
কালোই ভালো হয়গো শেষে।

মাথার কাছে ছুঁক ছুঁক আওয়াজ শুনিয়া চাহিয়া দেখি, ওরে বাবা, এযে সেই ভেলি কুকুর—যাহার সহিত কুললক্ষ্মীর বিবাহ হইয়াছিল! কি বিষম কালো ইহার রং! এমন সময় কোত্থেকে এলে বাবা! সে তাহার কৃষ্ণ জিহ্বা বাহির করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ চাটিয়া দিল, আমিও প্রত্যুপকারস্বরূপ তাহার গাত্র চাটিয়া দিব মনে করিয়া মাথাটা তুলিয়া দেখি আমিও যে ভয়ঙ্কর কালো হইয়া গিয়াছি! একেবারে সয়তানের মত ঘুটঘুটে কালো। কেবল রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মত আমার ভিতরকার লাল জল একটি রক্তিম আভা বিকীরণ করিতেছে, ঠিক কালো বোতলের মদ আলোর পাশে ধরিলে যেমন দেখায়। বেশ বাবা, শেষকালটা বোতলত্বপ্রাপ্তি হইল! একরকম মন্দ নহে, যাদৃশী ভাবনা যস্য

সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। সত্যই ত আমার মাথাটা ছিপির আকার ধারণ করিয়াছে, হাত পা গলিয়া বোতলের উদর ও তলদেশ হইয়াছে। শেষে কি ভূতভায়ারা আমাকেই ধরিয়া চুমুক দিবে?

কিন্তু মাথায় হুড় হুড় করিয়া জল ঢালে কে? চোখ মেলিয়া দেখি, প্রভাত হইয়াছে, আমি একটি গরুর গাড়ীর মধ্যে শুইয়া আছি এবং আমার মাথার নিকট দাঁত বাহির করিয়া বসিয়া আছে কচুরি বাই। তাহাকে মুখ ভ্যাঙাইয়া আমিও একবার দাঁত দেখাইয়া দিলাম। সে বলিল, "একেবারে বেহুঁশ হ'য়ে শ্মশানে পড়েছিলে, আমি গাড়ী থেকে দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে এলাম। সুস্থ হ'লে নাবিয়ে দেব, এখন চোখ বুজে ঘুমোও দেখি।"

তাহার স্বরের অনুকরণ করিয়া মুখভঙ্গি সহকারে বলিলাম—"চোখ বুজে ঘুমোও দেখি।"

গরুর গলার ঘন্টি অবিরাম কানে বাজিতেছিল—ঠুং ঠুং ঠুং—যেন পেয়ালায় পেয়ালায় নিরন্তর ঠোকাঠুকি চলিতেছে, উৎসবের আর শেষ নাই। জড়িত স্বরে বলিবার চেষ্টা করিলাম, "বাবা কচুরি, একটি পেয়ালা মুখে ঢেলে দাওনা বাবা, আর যে সইতে পারি না।" কিন্তু বলিতে পারিলাম না, গলা দিয়া শুধু খানিকটা আওয়াজ ঘড় ঘড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল। (ক্রমশঃ)

—শ্রীপূর্ণগ্রাস

"বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে, কি খুঁজছ ভাই?" "স্বামী খুঁজছি।" "কিন্তু তোমার ত একজন আছেন!" "আমি তাঁকেই খুঁজছি।"

পুরাতন পঞ্জিকা

শ্রীযুত সজনীকান্ত সদা নির্ব্বিকার
সার্থক সজনী নাম ! শত জনে তার
সদাই করিছে খোঁজ ; তিনি অনুক্ষণ
অন্তরের ভাবলোকে দেন সন্তরণ।
কেবলি তো ভাব নহে, জটিল হিসাব
(কোন্ ভাব সনে বল নাহিক অভাব !)
অমুকের কাছে এত, অমুক তারিখে,
—সুন্দর কবিতা বটে—যেতেছেন লিখে
ডায়ারির পাতে পাতে। সম্পাদক আছে ?
কিরণ যাওনা ভাই দেখ গিয়ে কাছে
কবি কিম্বা ক্রেডিটার। গল্প এনেছেন ?
মাঘ মাসে একবার সন্ধান নেবেন।
—পড়ুন পড়ুন গল্প ; আবার কে ডাকে ?
যাও ভাই দেখে এসো ড্যাশ লোকটাকে
কবি কিম্বা ক্রেডিটার ? আছে নাকি গোঁফ ?
আছে ? বড় ? একেবারে খেজুরের ঝোপ ?
তবে বুঝি সেই বেটা ! উদিল স্মরণে
গুম্ফযুক্ত একশত ক্রেডিটারগণে !
তাই বল রামবাবু ! চেয়ার ! চেয়ার !
—ক্রিং ক্রিং হ্যালো হ্যালো···আজ্ঞে···নমস্কার।

তবুও সজনীবাবু, সজনে বিজন ;
শীতের মধ্যাহ্ন-স্তব্ধ অন্তর-অঙ্গন
নাহি সেথা জনপ্রাণী। পাতা পড়িবার
এতটুকু শব্দ ক্ষীণ, পাখি নড়িবার
মৃদু মন্দ উস্‌খুস্‌, সব যায় শোনা
বনের নিশ্বাস স্পন্দ যায় যেন গোনা
এমনি নিভৃত সেথা। মন যেন তাঁর
আপন আলোয় বসি ছবি দেখে কার,
দেখে আর শোনে যেন একান্ত নির্ব্বাক
নিভৃতের বাণীরূপ স্তব্ধ ঘুঘু-ডাক।

কে ওই চেয়ারে মগ্ন নাহি ধারে ধার ?
চৌদ্দ বর্ষ পুরাতন সাব্ এডিটার।
নেহাৎ মানুষ তাই, নাহি হ'ল নাম,
ঘৃত হলে এতদিন বেড়ে যেত দাম
ষোল টাকা সের আহা !···কা'কে খোঁজা হয় ?
তুমি ও আপনি গুলি, রায় মহাশয়
যতনে এড়ায়ে যান। গল্প ? ওই খানে।
না, না, আমি সাব্ এডি···তার কিনা মানে···
সজনী বা—নির্ব্বাচন, সব ইচ্ছা ওঁর।
বাঁচা গেল, গুড গড্ লোকটা কি bore !
বক্রহাস্য তবু তাহা জোনাকীর মত
স্মিত স্নিগ্ধ আলো দেয় নাহি করে ক্ষত।

ক্ষতির যা কিছু ভার নিখিল দাসের
খিল ভাঙা কিল চড়ে বিষম ত্রাসের

যখন সঞ্চার করে ! অমৃতে গরল
অসম্ভব নহে বুঝি ! মুখে খল খল
অবিরাম হাসি আর হাতে চলে কিল
বহু দ্বন্দ্ব এ জীবন, এই তো নিখিল ।

বড় সাহেবের কণ্ঠ, চেহারায় বড়,
টেলিফোঁ-ভাষণে তিনি সব চেয়ে দড়,
চাপা হাসি, আধ কথা, yes, yes,
—আজিকার কাজকর্ম্ম দেখি নিয়ে এস ।

কে এলে বাড়ায় সবে নিজ নিজ হাত
ভবিষ্য-ভাষণে কেবা দেব জগন্নাথ ?
অতিদূর ভবিষ্যৎ, সুদূর অতীত
এ দুটোয় স্পেশালিষ্ট ; কে আছে পতিত-
পাবন এমনতরো ! পারেন সুরেশ
সকলি বলিয়া দিতে নাহি ভ্রম লেশ
নাহি কোনো দাবী দাওয়া, নাহি কোনো ফিস্
চাহি গো চব্বিশ শুধু ঘণ্টার নোটিস্ ।

দু'ভ্যলুম ডান হাতে, দু'ভ্যলুম বামে
দু'ভ্যলুম ফেলে রেখে পথে কিম্বা ট্রামে
আলু থালু কেশ পাশ, কে দাঁড়ালো আসি
স্খলিত চাদর ওই বেদনা-বিলাসী ?
দুঃখেরে কে আর্টরূপে করেছে অভ্যাস
সদাই নয়নে কার সন্ধ্যার আভাস ?

বেদনার বৈতরণী-তরণী নাবিক
বিরহের অনলের কে মহা সাগ্নিক ?
আপনারা নাম বিনা একে চিনিবেন
স্বনামা পুরুষ ধন্য ইনি শ্রীনৃপেন।

অতি ব্যস্ত গতিত্রস্ত মুখে চোখে কথা
ঝট্ করে দ্বার খুলে ভাঙি নীরবতা
অজস্র খবর বহি বাক্য-নায়েগারা
হতভম্ব দর্শকেরে করে দিশেহারা
কে সেই সুতন্ব (?) বীর ! সব তাঁর জানা,
ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, বন্দুক ও ছানা,
বিশ্বের যাবৎ তথ্য আছেন শিখিয়া
চতুর্দ্দশ সংস্করণ সাইক্লোপীডিয়া।
কেবল আকার ছোট, বলে মোর মন
ইণ্ডিয়া কাগজে ছাপা পকেটেডিশন।
কিন্তু তাঁর বেদ জেনো, বিস্তারে অলম্,
ষ্টেস্‌ম্যান কাগজের ধাঁধার কলম।

তোমারে ভুলিনি বন্ধু, তুমি জীবনের
অতিদীর্ঘ রসহীনে আছ লবণের
মত। তোমারে দেখিয়া মনে পড়ে যায়
কার কোথা কাজ আছে আজিকে সন্ধ্যায়;
উস্‌খুস্ করে সবে, উঠিতে নাচার
কেবলি অর্ডার গেছে সাত কাপ চা'র।

—'আজকে আশ্চর্য্য কাণ্ড পথে যেতে দেখি,'—
"দেখ ভাই আধুলিটা, সাঁচা বিম্বা মেকি ;"
"রেডিওতে গান আছে আমি উঠিলাম ;"
"আমারে কিনিতে হবে ওরিএন্ট বাম ;"
"পোস্তায় চলিনু আমি কিনিবারে ঢেঁকি ;"
তবুও—'আশ্চর্য্য কাণ্ড পথে যেতে যেতে দেখি।'
বহুবার শ্রুত ওই বিরাট কাহিনী
শিবের বিবাহে বর-যাত্রীর বাহিনী
কখনো ট্রেনেতে ঘটে, কখনো শ্মশানে,
কল্কে-পোড়া দাগ দেয় শ্রোতাদের প্রাণে।
শুনিতে না চায় কেহ, তুমি ছাড়িবে কি ?
'আজিকে আশ্চর্য্য কাণ্ড পথে যেতে দেখি !'
চেষ্টা কর, চেষ্টা কর, হে বীর পুরুষ
গল্প কথনের তুমি হে রবার্ট ব্রুস।

দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ কোট, দীর্ঘতর বাণী
শ্রীমৎ অতুলানন্দ ভারতী-ইরাণী।
উভয় ধর্ম্মেতে তিনি দিয়েছেন জোড়,
আগামী রিফর্ম্মে ভাই বড় মজা ওঁর।
বৃক্ষ শাখে দুই পাখী, হস্তে এক ঢিল,
একটু খুলিয়া বলি, ভেঙে দিয়া খিল
রূপকের। লিখেছেন একখানি বই
সাংসারিক উন্নতির অতি উচ্চ মই।
কম্যুনাল রিবার্ডের যাই হোক ফল
শ্রীমান অতুলানন্দ হবেনা নিষ্ফল।

ঠুক্ ঠুক দ্বারে শব্দ ; দেখি ফাঁক দিয়ে
সুপুষ্ট মসৃণ পায়ে দুইখানা ইয়ে
(মিলের খাতিরে ওটা) দুইখানা জুতা।
'আসুন আসুন।' 'আরে স্বাগত খুদুদা!'
'কে আজ খাওয়াবে চা ? মোর টাকা নাহি।'
এত বলি মনিব্যাগে হস্ত অবগাহি
তুলিলেন তিনখানা শ' টাকার নোট
খুচরা কয়েকখানা, এই আছে মোট।

বিশ্ববাণী বাসা বাঁধে কার ভিত্তি গায়
হিব্রু হ'তে হিন্দুস্থানী কোথা লটকায়
দেয়ালের ধারে ধারে ? সংস্কৃতি-জেল
কাহার প্রাসাদ বল নবীন ব্যাবেল ?
ভাষাতত্ত্বে সেকেন্দার ভারতী-বাণীর
সুযোগ্য কে প্রতিনিধি ? কাহার গভীর
বচনের বাঁকে বাঁকে নবীন বিস্ময়
সুনীতিকুমার তিনি, অন্য কেহ নয়।
যাঁর সনে আলাপনে অর্দ্ধঘণ্টা কাল
আপনারে মনে হয় নেহাৎ বাঙাল
কিম্বা ইস্কুলের ছেলে! গর্ব্বমুক্ত মন
মূর্খতম পার্শ্বিকেরে গ্রীক কোটেশন
অসঙ্কোচে বলে যান। বিদ্যা ভরপুর
তবু কার ভাল লাগে ছোলা, চানাচুর,
শাস্ত্র হ'তে এ জীবন বড় কাছে যাঁর
সুবিখ্যাত অধ্যাপক সুনীতিকুমার।

ভবিষ্যৎ বাঁধা দিয়া দিলাম দাদন
পুস্তক রচনা কালে রবে কি স্মরণ ?

বাসাহারাদের লাগি কে মরেন কেঁদে ?
ভ্রমিছেন পথে পথে চাঁদা সেধে সেধে ?
কার বাসা ? কারা তারা ? হরিজন নাকি ?
কত টাকা প্রয়োজন, কত টাকা বাকি
তাহাদের নাম কিবা শুধায় সবাই,
বৈজ্ঞানিক গোপালদা বলে হায় ভাই
তাদেরি লাগিয়া মোর যাহা কিছু শিখা
হতভাগ্য ভগ্নবাসা ক্ষুদে পিপীলিকা।

'এথিক্সের' জয় বার্ত্তা করিল ঘোষণা
মাণিক বিকালে যবে, ভাবিলাম অনা-
চার ক্রমে দেশ হতে হইবেক দূর
প্রত্যাসন্ন স্বর্ণ যুগ ; চিত্ত ভরপূর
দেখে যাব সভ্য যুগ, দেরী আছে থোড়া।
শুনিলাম শেষে সেটা রেস-জয়ী ঘোড়া।

মাপা-তালে পা ফেলিয়া কে করে প্রবেশ
দীর্ঘ গাত্রে বিলম্বিত কাশ্মীরি সরেশ
শাল এক ? কিবা নাম সে শালীবাহন
পটুয়ার ? কার আঁকা শিল্প-বিজ্ঞাপন
মাসিকের পাতে আর বিস্কুট কৌটায়
চতুর্ব্বর্গ সার্থকতা ধরি শোভা পায়।

সব জানা হাসি কার, আলাপের শূল
যেন তিনি ধরেছেন বিধাতার ভুল!
ক্রেডিটার তাড়ানিয়া বিশ্বস্ত কুকুর
কার দ্বারে পাহারায় সারাটি দুপুর?

শিল্পের আদর্শ লোকে জ্যোতিষ্কের মত
ভাব হতে ভাবান্তরে কেবা অবিরত
নিরন্তর ঘুরে মরে? কে সেই রকেট,
কাটিবারে চায় কেবা ইন্দ্রের পকেট
তার কিছু কম নহে, নাহি কোনো দৈন্য
শুধু কাণ্ড জ্ঞান ছাড়া, নাম শ্রীচৈতন্য।

মফঃস্বল হ'তে কার চলে যাওয়া-আসা
কলমে অলস্ নাহি, মুখে নাহি ভাষা
কে লেখে অমর গ্রন্থ আয়ু চিরকাল
না পড়িয়া উপন্যাস কন্‌তিনাতাল।
রাই-কমলের সূর্য্য (কুয়াশা-মলিন)
ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট কায় দেহখানি ক্ষীণ।
নাম নাই করিলাম। (নাহি মেলে ছন্দে)
সকলে জানে তাঁরে খ্যাতির সুগন্ধে।

গাই নন, তবু তিনি ভাগলপুরের;
শাল-কর নন, তবু হৃদয়-পুরের
কে শালীবাহন রাজ? উদ্ভিদ নহেন,
বটানিক আখ্যা তবু স্বনামে বহেন;

বৃন্দাবনে ছিল জোর নাম ডাক তাঁর,
বীজাণুবিজয়ী তিনি প্রসিদ্ধ ডাক্তার।
হাসিতে মধু-টি যার, কবিতায় হুল,
কাব্য-আগাছার গাছে যিনি বনফুল।
সাহিত্যিক সান্নিপাতগ্রস্ত ওগো দাদা,
তব ব্যবহার লাগি রচিনু এ ধাঁধা।
নামটি সাথেই দিনু, খুঁজে দেখো ভাই,
এক ছেড়ে দুই বার হয়েছে বলাই ॥

জানিতাম জল নাই সাঁতারের বেশী,
সে সাঁতারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোদের 'তিবেশী *
নেমেছেন এসে আজি কাব্য-সরসীতে,
বাণীর মরালগুলি হাসিতে হাসিতে †
যদিই বা উড়ে যায়, তাতে কিবা ক্ষতি,
মানস মরাল স্থলে দেবী সরস্বতী
মানুষ-মরাল পাবে ; যদি কভু দেবী,
আধুনিক সাহিত্যের উগ্র সুরা সেবি'
ঢলিয়া পড়েন জলে, শান্তি পাল তাঁরে,
তুলিবেন জল হতে সুচিৎ সাঁতারে ॥

খ্যাতি আর অপখ্যাতি একত্রে জড়িত,
দূর চাঁদমারি সম : মধ্যভাগে স্থিত

---

* প্রতিবেশী (দৈলিপী প্রয়োগ) সুনীতিবাবু, নোট করিয়া লউন

† আমরা অবগত আছি, সাধারণ হাঁস তো দূরের কথা, স্বয়ং সরস্বতীর হাঁসও হাসে না। কিন্তু কি করিব, মিলের অনুরোধে বড় কবি mill (বাসন্তী) খুঁজিয়া পান কিন্তু ছোটরা বাধ্য হইয়া হাঁসকে হাসায়।

ওই কালো বিন্দুটার নাম হল খ্যাতি,
আর যাহা চারিদিকে, যদিও বা জ্ঞাতি :
ওই কালো বিন্দুটার, ছেড়ো লোভ তার,
হে নবীন কবি, তুমি ; হেথা প্রতিভার
বহু শত্রু ; খুলিও না বোতলের মুখ,
হয়তো বাহির হবে নাশি সব সুখ
আরব্যোপন্যাসী দৈত্য, রেখো প্রতিভায়
চরিত্রের চালে ঝোলা সংযম-শিকায়।
আর যত তাড়াতাড়ি পারো করো বিভা,
নতুবা তুমিও যাবে, যাইবে প্রতিভা।
অন্তরে বিঁধিবে শুধু বহুস্মৃতি-শেল,
বুধবারে শনিবারে ড্যা-ড্যাশ হষ্টেল।

পুরান পঞ্জিকা ব্যাখ্যা কত করি আর
সজনী-জগৎ গ্রহ যেন অবতার
জুটেছেন এক সাথে। এঁদের জীবন
লিখিবারে বহুদিন ব্যস্ত মোর মন।
থাকিত আমার যদি তেমন মগজ
তারো চেয়ে বেশি আহা ডিমাই কাগজ !
লিখিতাম মুক্তহস্ত দিবস প্রহর
এখনো লেখার পরে বসে নাই কর।
বসে নাই ট্যাক্স বটে, ডাকের মাশুল
(পত্রজীবী বিরহীর হৃদয়ের শূল)
তাহারে কেমনে ভুলি ? তাই থামিলাম
সম্মিলিত পদযূথে অনেক সেলাম।
পড়িবেন আগাগোড়া, অন্তরে সন্তোষ
শুধু ছাড়ি দিয়া মোর বর্ণাশুদ্ধি দোষ ॥

ইতি

কস্যচিৎ ?

আর্টিষ্ট্

যা-হোক একটা কিছু করবার জন্যেই মানুষের জন্ম; কিন্তু পুলকেশ পালধি জন্মেছিল একেবারে আর্টিষ্ট্ হবার জন্যে।

আর্টিষ্ট্ নানা জাতীয়; গায়ক, ভাস্কর, অভিনেতা, সার্কাসওয়ালা ইত্যাদি। কিন্তু পুলকেশের ললাটে ছিল চিত্র-শিল্পীর ছাপ মারা।

সাবালক হতে না হতেই সে লম্বা চুল রাখতে আরম্ভ করেছিল, পুরো সাবালক হয়েই গোঁফ দিল উড়িয়ে। তারপর ঘটা করে জুল্‌পিও দিল বাড়িয়ে; তদুপরি গায়ে চড়ল খাটো-ঝুল পাঞ্জাবী আর পরনে বাহান্ন ইঞ্চি ধুতি। এই সময়ে ম্যাট্রিক ফেল হয়ে সে লেখা-পড়া সাঙ্গ করল এবং বছর খানেক ধরে' যাচ্ছি যাব করতে করতে একদিন একটা ছোট কারখানায় ঢুকে পড়ল। পুলকেশ হ'ল শিক্ষানবীশ সাইন-পেইণ্টার-রূপে।

এই ভাবে তার আর্টের হাতে-খড়ি আরম্ভ হল।

আর্টিষ্টদের স্বভাবজাত শক্তি তার যতই থাকুক না কেন, কেবল খাটুনি আর খাটুনি। হোক খাটুনি—সিঁড়ি সে পেয়েছে, স্বর্গ যায় কোথায়? প্রতি মুহূর্ত্তেই সে অনুভব করতে লাগল বড় হতেই হবে।

এই ভাবে বছর চারেক কাট্‌বার পর পুলকেশের হৃদয় একদিন গান গেয়ে উঠল—"আমি চলব—আমি চলব বাহিরে।"

পুলকেশ সত্যই বাহিরে চলে এল! এই হল তার স্বাধীন জীবনের সুরু।

কিন্তু তার প্রথম কাজটার ভাগ্যে সুফল জুটল না—একটা ছাতো মেরামতের বদলে সেখানা হাত-ছাড়া করতে হল; প্রথম কাজে এমন অবস্থা অনেক বিশ্ববিখ্যাত আর্টিষ্টদের বেলায়ও হয়েছে—পুলকেশ এ-কথা জান্‌ত বলে' কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হল না। একটা ছাতার দোকানের গায়ে পুলকেশের এই প্রথম প্রচেষ্টা লট্‌কান আছে; সেটিতে রঙের বাড়াবাড়ি মোটেই নেই, কেবল লাল অক্ষরে লেখা আছে—'ছাদের মত মজবুত ছাতা।'

এর পর সে দ্বিগুণ উৎসাহে রং তুলি চালাতে লাগল। এই সময়কার প্রথম দিকে আঁকা তার 'চপ্‌ ও কাট্‌লেট'-খানা ছিদাম মুদির লেনের একটি চা-ঘরের দেওয়ালে আঁটা আছে। এই সময়ে সে কতকগুলি প্লেটে ফিনিশিং টচ্‌ও দিয়েছিল, যেমন, একখানা 'No admittance except on business' (১৩২৯); একখানা 'রাস্তা বন্ধ' (১৩২৭); এবং দু'খানা 'বাটী ভাড়া' (১৩৩১) ও আরও কয়েকখানি—আর্টের ইতিহাসে তাদের বিশেষ মূল্য নেই বলে' নামোল্লেখ করলাম না।

এই সময়ে সে এমন একটা দুঃসাহসিক পরীক্ষায় ব্যাপৃত হল যে যে-কোনও সত্যিকারের আর্টিষ্টের পক্ষেই তা গৌরবের; এর দ্বারা সে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপনের একটা সুযোগও পেল। তার এক মামা ঘর সাজাবার জন্যে নিজের এক বন্ধুর কাছ-থেকে একখানা ছবি নিয়ে এসেছিলেন। ছবিখানির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এই: সন্ধ্যার আবছায়ায় একখানা জীর্ণ বাড়ীর সামনে দু' ঘোড়ায় বাহিত একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, বাড়ীখানার বারান্দা থেকে একখানা সাইন্‌-বোর্ড ঝুলছে, অনেক চেষ্টা করলে তাতে অস্পষ্ট অক্ষরে এই লেখাটি পড়া যায়—'ভোজনাগার।' ছবিখানি দেখে পুলকেশ অজ্ঞাতনামা

আর্টিষ্টকে তার অদূরদর্শিতার জন্যে উপহাস করল, তারপর রঙ ও তুলি নিয়ে সেই জায়গাটুকু সংশোধন করে' উজ্জ্বল করে' দিল। সকলে তখন সমস্বরে বলতে লাগল, "উঃ, পুলুর কী চমৎকার হাত! লেখাগুলো জলজলে হওয়ায় এখন ছবিটার মানে বোঝা গেল।"

একমাত্র তার মামাই কেবল গণ্ডগোল করলেন; তিনি যে পুলকেশের আর্টের সমঝদার নন এতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর, প্রথম থেকেই পুলকেশের আর্টিষ্ট হওয়ায় তাঁর মত ছিল না, তিনি তাকে পাটের দালালীর কাজে ঢোকাবার চেষ্টা করেছিলেন।

যা হোক, এ-সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে' সে বিরাট জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হবার জন্যে সত্যিকারের প্রতিভাবানদের মত এক-নিষ্ঠ সাধনা করতে লাগল।

সুখের বিষয়, গত বছরে সে একটা সুযোগ লাভ করেছিল—এবং তার বহুদিনের সঞ্চিত আশা সে-দিন অল্প-বিস্তর পূর্ণ হয়েছিল;—অর্থাৎ আর্ট্ একজিবিশনে তার একখানা ক্যান্ভাস গৃহীত হয়েছিল! পুলকেশ এই সময়ে ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল যে 'সবুরে মেওয়া ফলে' কথাটা আর্টিষ্ট-শ্রেণীর লোকের জন্যেই উচ্চারিত। Black and white বিভাগ থেকে বেরুবার দরজার কাঁধেই চৌকা ফ্রেমে বাঁধান ক্যান্ভাসখানা পুলকেশ পালধির; সাদা পট-ভূমির উপর কালো রঙে আঁকা সেখানি কারও দৃষ্টি এড়ায়নি; 'REFRESHMENTS', এর শেষের দিকে আধখানা হাত একটা আঙুল প্রসারিত করে' নির্ভুলভাবে একটা দিক্ নির্দ্দেশ করছে।

বড়দিন ও নব-বর্ষের ক'দিন হাজার হাজার নর-নারী পুলকেশ পালধির আঁকা সেই ক্যান্ভাসখানি নিশ্চয়ই দেখেছে, বিনা কষ্টে অর্থ বুঝেছে এবং, হয়ত, মনে মনে কত লোক সেখানির প্রশংসাও করেছে।

অথচ, প্রদর্শনীর যখন সমালোচনাদি কাগজে কাগজে বেরুল তখন দেখা গেল পুলকেশের নামে কেউ কিছু লেখেনি! নতুন এবং তরুণ প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের দেশের সমালোচকরা যে চিরকালই হিংসুক ও শত্রুভাবাপন্ন—সে বিষয়ে এর পর আমাদের একটুও সন্দেহ রইল না। পুলকেশ নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে এমন দিন নিশ্চয়ই—এবং অনতিবিলম্বেই আসবে যখন শিল্প-জগতে সে তার যথার্থ আসন দখল করে' সকলের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করবে।

এর জন্যে কিন্তু তাকে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হল না। গত সপ্তাহে 'বেঙ্গল এ্যাকাডেমী অব আর্টে'র তত্ত্বাবধায়ক স্যর চতুর্দোল চাকলাদার একটি ক্ষুদ্র, অথচ অতিশয় ভদ্রতাপূর্ণ পত্রে পুলকেশকে জানিয়েছেন যে গবর্ণমেণ্ট তাকে একটি কাজের অর্ডার দিয়েছেন। গড়ের মাঠে এ্যাকাডেমীর নব-নির্ম্মিত ভবনে পুলকেশের শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় চিরস্থায়ী ভাবে রাখা হবে।

যাক্, অবশেষে বাস্তবিকই তার সুবিচার করা হল দেখে আমরা সুখী হলাম।

পূর্ণ পাঁচ রাত ও পাঁচ দিন ধরে' পুলকেশ কাজ করতে লাগল; শিল্পীর এই একাগ্র সাধনার সামনে ক্ষুধা-নিদ্রাও, বোধ করি লজ্জিত হল।

যা হোক, পেইণ্টিং শেষ হবার পর যখন পুলকেশ দেখল যে তাতে কোনও খুঁৎ নেই তখন ক্যান্‌ভাসের ডান দিকে নীচের কোণে সে নিজের নাম স্বাক্ষর করে দিল, মনে মনে সুর করে বলতে লাগল; 'And, at last, towards immortality.' তারপর পাঁচসিকে খরচ করে সেখানিকে সুন্দর একখানা ফ্রেমে বাঁধিয়ে এ্যাকাডেমীর আফিসে দিয়ে এল।

স্যর চতুর্দ্দোল পুলকেশের এই ক্যান্‌ভাসখানির সমুচিত সুখ্যাতি করে' তা গ্রহণ করেছেন। তবে, তাঁর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পুলকেশ ক্যান্‌ভাসের কোণ থেকে নিজের নামটি মুছে ফেলতে বাধ্য হয়েছে।

তোমরা যদি কখনও এ্যাকাডেমীতে যাও ত' দরজা পার হতেই পুলকেশ পালধির আঁকা লাল ফ্রেমে বাঁধান এই ক্যান্‌ভাসখানি দেখতে পাবে; 'ছাতা ও ছড়ি এইখানে রাখুন!' বুঝতে কষ্ট হবে না, কেননা ইণ্ডিয়া আর্টের মতই তাহা লম্বা এবং ভঙ্গিমাময়।

—বি-কু-বড়াল

নাম্নী

শ্যামলী

সে যেন শহুরে নদী
বহে নিরবধি—
অবিশ্রান্ত কলকলে;
তরঙ্গের ভঙ্গী আর নর্ত্তনের ছন্দ নিয়ে চলে;
নুয়ে পড়া তনুলতা, চুপ্‌সানো চেহারা বিকট,
বয়স বিশের থেকে বেশী-কম ত্রিশের নিকট।
থাকে কোনো লেডীজ্‌ হষ্টেলে
নিত্য তার বার্ত্তা আসে জরুরী পোষ্ট্যালে

আসলে লোকাল চিঠ
ডিলীশাস্, প্রিটি,
কারণ সেগুলি লেখে—কে লেখে তা না-ই বলিলাম
লেখক এবং আমি একই মেসে কদিন ছিলাম
তারি লাগি, অন্য তার নাম
উহ্য রাখিলাম ;
এখন আসল কথা ; তরুণীও কলেজে পড়েন
বাসে " চড়েন ;
কলেজেতে গতায়াত হেতু,
সে সময় মুগ্ধ মীনকেতু
দিয়েছে নজর,
তারি ফলে ওর
প্রেমে পড়েছেন সেই বিশিষ্ট তরুণ,
যা হোক্ তাহারা ছু'য়ে যা কিছু করুন
তাতে কারো ক্ষতি কিছু নেই।
আমরা কেবল যাহা দেখে ফেলি তা-ই লিখিতেই—
মনস্থ করেছি, তাই ভাষাহীন ভাবনায় মন মোর ভরে
প্রেমিকের অব্যক্ত মর্ম্মরে।
সায়াহ্ন সমাপ্ত হলে মিলে দুজনায়
সিনেমাতে যায়
না হয় নতুন কোনো দেশী রেস্তঁরায়
Vimto চালায়।
স্ক্রীন-বীথিকার বাঁকে
পাশাপাশি ঘেঁসে বসে থাকে।

ফাঁকে ফাঁকে
দেখি আর মনে মনে বলি,
নাম কি শ্যামলী ?

কাজলী

প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে আঁখি তার নত
স্তম্ভিত মেঘের মত,
ভাষাহারা,
তৃষার্ত্ত-চাতকীপ্রায় বিরহিণী প্যাটার্ণ্ চেহারা।
'সে যেন গো তমালের ছায়াখানি ;
অথবা বনানী
নিশীথ জ্যোৎস্নায়,
পুরানো পাতারে যবে ঘনীভূত কালো দেখা যায়
সে কালের সে যেন তমাল
কালো তার কাণ্ডসহ দুটি বাহু-ডাল।
তাতে দুটি চক্ষু যেন ফুটন্ত মল্লিকা
স্নিগ্ধ তবু তার মাঝে লুক্কায়িত বিদ্যুতের শিখা ;—
এ গেল ভূমিকা
এখন লিখিব মোরা মূলকাব্য সহ তার টীকা।

পোষ্ট গ্রাজুয়েট্ ক্লাসে পাঠরতা তরুণী মোদের,
এঁর
কাহিনী এখনো কিছু হয় নাই জানা,

পাইনি ঠিকানা ;—
বর্ত্তমানে লিখিছেন চাটুজ্জের ফিললজি নোট
এবং তাহার সাথে যার পানে চাহিছেন সে নহে 'রিমোট'
বসিয়াছে মুখোমুখি হয়ে,
কি হবে তা ক'য়ে !
তারি সাথে ইদানিং জমিয়াছে ভাব ;
রসেতে পৌঁছেনি শুধু চলিতেছে অনুভাব এবং বিভাব ।
ফুটন্ত মল্লিকা মাঝে বসিয়াছে ঘনকৃষ্ণ অলি
সে কেবলি
উড়ে যেতে চায়
যেথায়
সে তরুণ নীরবে বসিয়া
কটাক্ষ উত্তর শুধু জানাইছে দীর্ঘ নিঃশ্বসিয়া
তা' হেরে মল্লিকা ছুটি ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে উজলি'
নাম কি কাজলী ?

হেঁয়ালী

যারে সে বাসেনি ভালো তারে সে নাচায়,
প্রেমের খাঁচায়
ক্ষণে ক্ষণে বদ্ধ করি' রেখে দেয় তারে,
আলো-অন্ধকারে
সংশয় বাধায় ;
অলক্ষ্যে হাসিয়া ফেলি' প্রেমিকেরে কেবলি কাঁদায় ।

বিবাহিতা

আধুনিক সীতা

অযোধ্যা ছাড়িয়া হালে আসিয়াছে নব-বিদ্যালয়ে
নতুন রোমান্স আর পরচর্চ্চা লয়ে
কাটাবে কদিন,
এবং তাহার সাথে জীবনের বীণ
যদি কোনো নব-তারে পারে সে বাজাতে
যা'তে
সুশ্রী ধনী যুবা কোনো ভুলি' তার নারী-ইন্দ্রজালে
যদি ঢালে
তার পায়ে সিনেমা ও রেস্তরাঁর টাকা
ফাঁকি দিয়ে কিছু কাল ভরি' তার হৃদয়ের ফাঁকা
কাটাবে সুখেতে—
মুখেতে
না বলি' কিছু।
তারপরে যদি সেই হতভাগ্য ধরে তার পিছু
তবে শেষ বেলা
পাগল হওয়ার তার এলোমেলো খেলা
সুরু হবে, সে যুবক নারিবে বুঝিতে
যে দিকে চালাতে যাবে চলিবে সে তারি বিপরীতে
তারপরে পুনরায় অন্য একদিন
নব-তারে বাঁধি নিয়ে হৃদয়ের বীণ
নতুন যুবক ধরি'
অগ্রসরি'

তারি পায় প্রাণ মন দেবে ঢালি',-
নাম কি হেঁয়ালি ?

—*—

খেয়ালী

মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে
বসি অন্য মনে
কি দেখে সে ফুটপাথে, অথবা ও পারে
নিরালা ছাদের নীচে দোতালার আধো অন্ধকারে,
যেখানে একটি ছেলে বসে আছে পুস্তক সমেত,
তারি সাথে চলেছে সঙ্কেত ;
হস্তে তার মেঘদূত, দৃষ্টি তবু কটাক্ষ হানিয়া
তরুণের হৃদয় ছানিয়া
কি যেন তুলিতে চায়, কি যেন কি ভাষা—
নহে সুনিবিড় প্রেম, নহে ভালোবাসা।
চুরি-করা চাহনিতে,
রিনি ঠিনি চুড়ির ধ্বনিতে
কেবল করিতে চায় তরুণেরে একটু চঞ্চল,
তারি লাগি খনে খনে উড়ায় অঞ্চল
অলস ঔদাস্য ভরে,
বক্ষ হতে সাড়ী খ'সে পড়ে ;
ইত্যাদি নানান উপাদানে
তারুণ্যে চঞ্চল করি' ভুলাতে সে জানে।

ক্ষণিকের কেলি শুধু, ক্ষণিকের ছল
আকুল বিহ্বল।
মনের খেয়ালে তা-ই করে,
অকস্মাৎ ক্ষণ পরে
নিজেরই খেয়াল মাঝে নিজেরে জড়ায়
বসি' নিরালায়
ওরি নামে
গুপ্তলিপি লেখে নীল খামে
লেখনীতে ভরি' লয়ে প্রচ্ছন্নের কাজলের কালী,—
—নাম কি খেয়ালী ?

কাকলী

কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ,—
নিত্য গর্জ্জমান
ভাষার কল্লোলে
জাগাইয়া তোলে
বারে বারে
গৃহিণীর বাতগ্রস্ত পঙ্গু-জড়তারে।
চীৎকারে তরঙ্গ তুলি'
কাংস্য-রবে ছোটে তার বাক্য-বাণ গুলি ;
গৃহিণীর অন্তরঙ্গ ঝি সে
বুঝাইব কিসে

স্থূলাঙ্গী করিণী রূপা গৃহিনীরই new edition
দেখিতে ভীষণ
রামায়ণ-প্রকীর্ত্তিতা রাবণ-ভগিনী,
অভাগিনী
ঝি-গিরি ছাড়া কি আর মিলে নাই অন্য কোনো কাজ!
এমন বেলাজ
কিছুতেই দমিবেনা, নড়িতে চড়িতে ছয় মাস
নিয়ত কোন্দল করা তার কাছে মধুর বিলাস।
কিছু বলিলেই দেখি পঞ্চমে সে চড়াইবে গলা;
এবং নির্জ্জলা
অনায়াসে বলে যাবে খাঁটি মিথ্যা কথা।
কিন্তু ভাবি, কি যে অপূর্ব্বতা
রহিয়াছে কণ্ঠেতে তাহার!
ইয়া মোটা গলা হতে কি চিক্কণ স্বর ক'রে বা'র
চিক্কণ এবং তাহা চড়ানো সপ্তমে;
আর ক্রমে ক্রমে
ঝগড়ার শেষ ভাগে ক্লাইমেক্সে চড়ে,
মনে হয় বুঝি ভেঙে পড়ে
দেয়াল চৌচীর হয়ে,
ভেঙে যাক্, তবু বলি চুপে চুপে (এবং সংশয়ে)
গৃহিণীর উচ্চ কণ্ঠ আজ কাল কমই শোনা যায়;
এতদিন যার লাগি বাড়ীতেই টেকা হতো দায়!
তিনি যে কেমনে
নৈঃশব্দ্যেরে বরিলেন মনে

তাহা আমি কিছুতে বুঝিনা।
তবু হায় ভয়েতে খুঁজিনা
ইহার কারণ,
ঝির সাথে হেরে যদি মোর সাথে সুরু হয় রণ ;—
দাদা, এই বেশ আছি,
ঝিয়ের কল্যাণে আমি হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচিয়াছি।
বুঝিলাম সার,
একমাত্র সেই পারে বিচূর্ণ করিতে মোর গিন্নীর power,
প্রতি নিমেষেই
শুন্‌ছি শুয়েই
বার বার,
বিরক্ত গিন্নীর কণ্ঠ জয় করি' ঝিএর ঝঙ্কার
সারা বেলা উঠিছে চঞ্চলি',—
—নাম কি কাকলী ?

নাগরী

রঙ্গ-সুনিপুনা
বাহিরে রয়েছে কাঁচা, অন্তরেতে হয়ে গেছে ঝুনা
ঝুনা নারিকেল সম ; কটাক্ষ বর্ষণ মাঝে
নির্দ্দয় বিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্ম্মে এসে বাজে।
টর্পেডো সমান
যাহারে সে বিদ্ধ করে সে তরীকে করে খান খান ;

যুনিভার্সিটির মেয়ে
তারো চেয়ে
রহিয়াছে নানাবিধ অন্য পরিচয়।
বিগত কলেজ যুগে করিয়াছে গোটা পাঁচ ছয়
ছেলেরে ঘায়েল,
না না না পেয়োনা ভয়, মিছে কেন হও তুমি 'পেল্'
ঘায়েলের মানে তুমি অন্যভাবে লইয়াছ বুঝি';
অর্থ তার বোঝো সোজাসুজি—
ছয়টি ছেলের সঙ্গে এক সাথে চালায়েছে প্রেম!
আমিও ছিলেম
তাহাদের একজন।
কিন্তু হায় অবশেষে দেখা গেলো মেয়েটির মন
আমরা পাইনি কেউ!
তাহার প্রেমের ঢেউ
চলিয়াছে সাগর পারায়ে
সেথা কোন্ মিস্টার রায়ে
হরিয়াছে সে মেয়ের মন;
সে এসে যখন
আই-সি-এসের দলে ভিড়িবে বে-বাক্
তখন বিবাহ হবে, যাক্—
বর্ত্তমানে শ্রীমতীর রহিয়াছে অন্য ইতিহাস,
সেই দিন 'ফারপো'তে কিছু তার পেলাম আভাস;
হেরিলাম প্রসাধন-সাধন-চতুরা
ঢালিতেছে আরক্তিম সুরা

ডিকেণ্টার পরিপূর্ণ করি' !
হরি হরি
তার পাশে বসে আছে ইংরেজীর নব্য অধ্যাপক
বিলাতের ডিগ্রীধারী দুই দিকে দুজন স্তাবক !
ওদেরে চিনিনা,
বুঝি নাই cousin বা অন্য কিছু কি না।
জাদুকরী বচনে চলনে
গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে।
অকপট লালসারে সোম-রসে করিয়া মধুর
'ভাবী'র বিরহ বুঝি করিতেছে দূর
অধ্যাপক-পুঙ্গবে খেলায়ে,
আকস্মিক কটাক্ষের ঘায়ে
তাহারে ঘায়েল করি',
জানে সে সময় এলে যাবে অগ্রসরি'
অতীতে পশ্চাতে ফেলি' ;
পশ্চাতের কেলি
রহিবে পশ্চাতে !
বিবাহের নবীন প্রভাতে
রাত্রিশেষ জ্যোৎস্নার মতন
অবাস্তব প্রেম আর স্বপ্নে ভরা মন
রেখে যাবে মৃত্যুহীন অমিতের হাতে
শেষ-কবিতাতে।
তারপরে
নূতন বাসরে
শোভনলালের বক্ষে মধু-নিশি রহিবে জাগরি'—
—নাম কি নাগরী ?

—কলেজ বয়

———

নূতন কাগজের প্ল্যান

সম্পাদক মহাশয়,

দোহাই আপনার, নূতন কাগজগুলির বিরুদ্ধে কিছু লিখিবেন না, তাহা হইলে আমার ব্যবসাটি মাটি হইবে। কিরূপে তাহা শুনুন। বেলা এগারোটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আদালতে থাকি, কিন্তু তবুও সপরিবার অনাহারে মারা যাইতে বসিয়াছি। প্র্যাকটিস্ নাই। গানের গলা ছিল, উপায়ান্তরহীন হইয়া তাহারই সাহায্যে কিছু রোজগার করিয়া খাইতেছি। আপনারা সন্ধ্যার পর মুখে নকল দাড়ি বাঁধিয়া, রং মাখিয়া, নীল চশমা এবং যাত্রার দলের পোযাক পরিয়া যে লোকটাকে নাচিয়া এবং গাহিয়া দাঁতের মাজন বিক্রয় করিতে দেখেন এবং দেখিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন—সে লোকটা আর কেহই নহে, আমি। আমিই সারাদিন শ্রীপরাশর শর্ম্মা বি-এল, এবং সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত বিপিন কবিরাজের দাঁতের মাজন বিক্রেতা "বহুরূপী"! বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত বিপিন কবিরাজও আমি স্বয়ং। কিন্তু ইহাতেও পয়সা হয় না। আপনারা আমার নাচ গানে হাসেন, রহস্য করেন কিন্তু এক পয়সার একটা প্যাকেটও কেনেন না। নিরুপায় হইয়া মাসিক পত্রের এক প্ল্যান আবিষ্কার করিয়াছি, এবং তাহাই বেচিয়া বর্ত্তমানে কোনো রকমে সংসার চালাইব মনে করিয়াছি। আমি আজ দুই বৎসর হইল জার্ম্মানি ও জাপানের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিয়া তবে আমার প্ল্যানে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, এবং আপনারা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এদেশের বাজারে জাপানি ও জার্ম্মান মাল ছাড়া আর কিছু বড় একটা চলে না। ইহাতে আমার মনে হয়,

কোনো জাপানী বা জার্মান যদি বাংলা শিখিয়া বাংলা ভাষায় মাসিকপত্র ছাপাইয়া এদেশে পাঠাইতে পারে তাহা হইলে তাহাদেরও খুব লাভ হইবে, এবং আমিও তাহার সোল-এজেন্সি লইয়া লাভবান হইতে পারিব। কারণ উহাদের চেয়ে দেখিতে ভাল এবং শস্তা মাল পৃথিবীর আর কোনো জাতি দিতে পারে না। আমি জার্মানিতে যখন প্রথম চিঠি লিখি, তখন জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার হের-গাইস্‌ল্যার তাহার উত্তরে লেখেন, মহাশয়, আপনার প্রস্তাব উত্তম কিন্তু আমিও ভারতের বাজার হইতে একটি দ্রব্য এদেশে চালাইতে চাই। আপনি যদি মাল আদান-প্রদানে ব্যবসা করিতে রাজি থাকেন, তাহা হইলে আমার পক্ষে খুব ভাল হয়। আমি আমার একজন কর্ম্মচারিকে আপনার প্রস্তাব-মত বাংলা শিখিবার জন্য আপনার নিকট পাঠাইব; সে যতদিন আপনার নিকট থাকিবে ততদিন আপনি আমার নিকট প্রতি সপ্তাহে এক টন করিয়া মুরগীর ডিম পাঠাইবেন। জার্মানিতে যেরূপ নারী-প্রগতি এবং নারী-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আমাদের দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে। মহাশয় বলিতে লজ্জা হয়, এই আন্দোলন মুরগী সমাজেও প্রবেশ করিয়াছে এবং ফলে ডিমের দর অসম্ভব চড়িয়া গিয়াছে। এখনই এই, ভবিষ্যতে আরও কি হয় কে জানে! আমরা একমাত্র হাঁসের ডিমের উপর ভরসা করিয়া আছি। হাঁস খুব নিরীহ এবং রক্ষণশীল। কিন্তু এতগুলি ভক্ষণশীল উদরের দাবী একা হাঁস মিটাইতে পারিবে কেন? তাই মহাশয়ের নিকট অনুরোধ, মহাশয় আমার এই প্রস্তাবে রাজি হইয়া কার্য্য আরম্ভ করুন।

আমি ত চিঠি পাইয়া অবাক! জার্মানির পাল্লায় সেবার গোটা য়ুরোপ কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, আর আজ এই-হের-গাইস্‌ল্যারের পাল্লায় পড়িয়া আমি কাবু হইবার উপক্রম! একটি জার্মানকে আমার

কাছে রাখিতে হইবে, তদুপরি সপ্তাহে একটন ডিম! রাজি হইতে পারিলাম না।

তখন জাপানে চিঠি লিখিলাম। অনেক চেষ্টার পর জাপান আমার প্রস্তাবে রাজি হইয়াছে। এখন দেশে মাল বিক্রয় করিতে পারিলে উভয় দেশেরই মুখরক্ষা হয়। যে জাপানীটি বাংলা শিখিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া গিয়াছে, তাহার চিঠি পাইয়াছি। আমি তাহাকে একটি নমুনা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম, তাহা অনুসরণ করিয়া সে নিজে একখানি পত্রিকা সম্পূর্ণ করিয়াছে। কাগজখানি চল্লিশ পৃষ্ঠার হইয়াছে। দুইখানি রঙিন ও দশখানি একরঙা ছবি আছে। উহাতে চারিটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগে দুইটি প্রবন্ধ, (১)দেশ সেবা (২)আর্ট ফর আর্ট্স সেক। দ্বিতীয় বিভাগে কবিতা, সংখ্যা তিন। তৃতীয় বিভাগে একটি সম্পূর্ণ গল্প ও একটি ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাস। চতুর্থ বিভাগে সাময়িক মন্তব্য। পত্রিকার মূল্য এক পয়সা। আমার বিশ্বাস, কিছুদিনের মধ্যে দেশী কাগজগুলি জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাইবে, কারণ এরূপ উৎকৃষ্ট ছাপা কাগজ এক পয়সা মূল্যে আর কেহই দিতে পারিবে না। প্রত্যহ নূতন কাগজ বাহির হওয়া ব্যাপারে আপনারা যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেছেন, তাহাও আর দরকার হইবে না। আমার এই কাগজখানি বাজারে নূতন বাহির হইল বটে কিন্তু অতঃপর আর কোনো নূতন কাগজ বাহির হইতে পারিবে না। মাসিক খানা চালু হইলেই সাপ্তাহিক কাগজও জাপান হইতে আসিবে। চারি সপ্তাহের কাগজ একই সঙ্গে একই জাহাজে আনাইব—ইহাতে দাম খুবই কম পড়িবে। এই গরীবের দেশে আট আনা এক টাকা দিয়া মাসিকপত্র কেনা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। আমরা জাপানী কাগজের বিজ্ঞাপন হিসাবে কিছু নমুনা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম প্রবন্ধ

দেশ সেবা

দেশসেবা করিতে, চাই আত্মত্যাগ, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার এবং তেল। কিন্তু এই কথা প্রচার করিবার জন্য আমরা জাপান হইতে মাসিকপত্র ছাপাইয়া প্রচার করিতেছি কেন? কারণ, প্রচার করাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর প্রশ্ন উঠে না। আমরা চাই স্বদেশী ব্যবহারের বার্ত্তা ঘরে ঘরে প্রচারিত হউক। স্বদেশী কাগজে স্বদেশী যন্ত্রে ইহা ছাপা যায় বটে কিন্তু প্রচার হয় না। আমাদের এক পয়সার এই সুবৃহৎ মাসিক বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রবেশলাভ করিবে, সুতরাং আমাদের বাণীও ঘরে ঘরে প্রচারিত হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে তাহা হইলে উপায় লইয়া ভাবা অনুচিত। বাঙালী জাতির উদ্দেশ্যের ঠিক নাই। উদ্দেশ্য যদি খদ্দর প্রচার হয় তাহা হইলে খদ্দরই প্রচার করা চাই—উদ্দেশ্য যদি সাহিত্য প্রচার হয় তাহা হইলে সাহিত্যই প্রচার করিতে হইবে—পরিবর্ত্তে অন্য কিছু চলিবে না। চালাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমাদের মনে হয় খদ্দর প্রচার করিতে হইলে জাপান কিংবা জার্ম্মানি কিংবা ইংলণ্ড হইতে শস্তা খদ্দর প্রস্তুত করাইয়া আনা প্রয়োজন। এরূপ ভাবে যদি এক জোড়া খদ্দর আট আনায় পাওয়া যায় তাহা হইলে বাকী দুই টাকা আমরা দেশের অন্য কাজে ব্যয় করিতে পারি। কথা একই। এক জোড়া দেশী খদ্দর আড়াই টাকা দিয়া কেনার অর্থ ঐ আড়াই টাকা দেশীয় লোককে দেওয়া। আমরা যদি আট আনায় বিদেশী খদ্দর কিনিয়া দুই টাকা দেশীয় লোককে দান করি তাহা হইলে দান করাও

হয়, অথচ দেশও কাপড় তৈয়ারীর খাটুনি হইতে নিষ্কৃতি পায়। দেশ সেবার এই নূতন ভঙ্গিটি সকলকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

এইরূপ কোনো বক্তা যদি মদ না খাইলে বক্তৃতা দিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে মদ খাইতে দেওয়াই সমীচীন। বক্তৃতাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে বক্তৃতার গন্ধ শুঁকিতে যাওয়া অন্যায়। কোনো বাগ্মী সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বক্তৃতা দিয়াছেন বলিয়া এপর্য্যন্ত শুনি নাই। (এতৎ-প্রসঙ্গে বলিতে চাই যে জাপানী বিয়ার খুব শস্তা।) প্রত্যেকটি কাজই উদ্দেশ্যমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বহু উদ্দেশ্য এক সঙ্গে জড়াইয়া ফেলা আবার বহু বিবাহের মতই বর্জ্জনীয়। প্রকৃত দেশসেবা মাসিক পত্র এবং তেলের কলে যতটা হয় শুধু মাসিকপত্রে বা শুধু তেলের কলে ততটা হয় না। উভয়ের উদ্দেশ্যই এক। বাজার হইতে তেল তুলিয়া দিলে মাসিকপত্রও উঠিয়া যাইবে, আবার মাসিক পত্র তুলিয়া দিলেও তেল উঠিয়া যাইবে। কিন্তু এইখানে প্রশ্ন উঠে, তেল কয় প্রকার? বেঙ্গল কেমিক্যাল ইহার উত্তর খানিকটা দিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ দিতে পারেন নাই। সরিষার তেল তাঁহাদের প্রসাধন তালিকায় স্থান পায় নাই; এবং এই কারণেই বেঙ্গল কেমিক্যাল কোনো বাংলা মাসিকপত্র বাহির করেন নাই। করিলে বুঝিতে পারিতেন, সরিষার তেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতে পূর্ব্বে যে সমৃদ্ধি ছিল তাহার মূলে সরিষার তেল। এই সমৃদ্ধির মূল খুঁজিতে গেলেও সরিষার তেলের প্রদীপ চাই। আজ বিদ্যুতের আলো জ্বালিতেছি বটে, কিন্তু পিছু হটিতে আরম্ভ করিলে একশত বৎসরও যাওয়া চলিবে না, মাঝপথে বিদ্যুতের আলো নিভিয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের এই জাপান হইতে মুদ্রিত কাগজও প্রধানত সরিষার তেল বিষয়ক হইবে। ইহার প্রধান কারণ, সরিষার তেল উদ্দেশ্য-মূলক;

ইহাতে আলো জ্বলে, আলু পটল ভাজা হয়, গাত্রে মর্দ্দন করা যায়—এমন কি ইহা দেব পূজাতেও লাগে।

কিন্তু সরিষা নামক বস্তু তেল প্রদান করে কেন? এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া যায় না। এই কথার উত্তর দিবার জন্যই এই স্থানটি নির্দ্দিষ্ট রহিল—এক বৎসর ধরিয়া ইহার মীমাংসা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটি কথা বলা আবশ্যক। আপনারা সকলেই জানেন সরিষা এক প্রকার গাছের ফল। কিন্তু এইক্ষণে জানিয়া রাখুন ইহা কর্ম্মফল। ইতি প্রথম পর্ব্ব। —শ্রীপুরুষকার।

কবিতা বিভাগ

আদাওয়ালা

আদা বেচে খেত' আদার ব্যাপারী নাম কড়মড় ভয়ঙ্কর,
আসল নামটা বাদ দিয়ে তাই লোকে নাম দিল শ্রীনটবর।
ভাগ্যে ডাঙায় উঠে আসে মাছ
আঙুল ফুলিয়া হয় কলাগাছ
ভাগ্যে নটুর টাকার বটুয়া—ক্রমে স্ফীত হয় তার উদর।
ক্রমে বটুয়ার পেট ফুলে ঢাক্
টিকি ঘিরে তার দেখা দিল টাক্
দেশের লোকের লেগে গেল তাক্—গোঁফে দেয় পাক্ শ্রীনটবর।
কিন্তু তবুও মনে রয় জ্বালা
সকলেই বলে নটু আদা ও'লা—
কানে দিলে তুলা লোকে ডেকে বলে—কান-ফুটো ন'টো আদা কি দর?

পঁচিশ বছর ভেবে নটবর শেষে একদিন করিল স্থির—
জাহাজ একটা কিনিয়া এবার জাঁকায়ে তুলিবে ব্যবসা ঘি'র।
যুগ যুগ হ'তে ভেজাল খাইয়া
দেশ জুড়ে হ'ল ডিসপেপ্‌সিয়া
দেশহিত ব্রত, খাঁটি গাওয়া ঘৃত দিব আমি, নটু করে জাহির ॥
এ নহে ব্যবসা লাভের জন্য
দেশের দুঃখে রোচে না অন্ন,
টাকা নগণ্য, তাই পত্তন-দান লিমিটেড কোম্পানির ॥
—শ্রীঅদৃষ্ট

হিতোপদেশ

পুরুষ বলিয়া যারে জানিতাম এতদিন
বীর্য্যহীন আচরণ তার।
ব্রাহ্মণ বলিয়া যারে ভেবেছিনু, দেখি আজ
বণিক সে নব সভ্যতার।

কুসুমের সুষমায় মুগ্ধ লুব্ধ মধুকর
কাছে গিয়া দেখে এ কি ভুল!
ছদ্মবেশে মিথ্যারূপে ভুলাইল তারে আজি
অতি ক্ষুদ্র কাগজের ফুল।

লক্ষ্মীর আরতি করি ভারতীর কৃপাকণা!
অঙ্কুশ হইতে কিশলয়!

ময়ূরের ডিম্ব ভেদি বাহিরায় সর্পশিশু ?
বিস্ময় যে হল বিষময়।

বিষ্ণুশর্ম্মা ডাক দিয়া কহিলেন, "ওরে বৎস
ভুলিস্ না পুরাতন পাঠ—
নীলবর্ণ শৃগালেতে পরিপূর্ণ এ সংসার
ভুলিলেই ঘটিবে বিভ্রাট !"

"লীলাময়"

গল্পবিভাগ

রক্তপথের যাত্রী

যক্ষ্মা হাসপাতাল। প্রকাণ্ড দোতালার ঘর, চারিদিক খোলা। ঘরের মাঝখানে পার্টিশন। পার্টিশনের উচ্চতা ছয় ফুট; উপরে ফাঁকা, হাওয়া খেলিবার সুবিধা। পার্টিশনের একদিকে পুরুষ, অন্য দিকে স্ত্রীলোক, সকলেই রোগী।

সুধাংশু আজ তিন মাস এখানে পড়িয়া আছে। রক্ত উঠা বন্ধ হইয়াছে। সন্ধ্যায় এখনো জ্বর হয়,—চক্ষু কোটরগত, দেহে কঙ্কালের উপরে একখানি চামড়ার আবরণ। বুকখানা ঠেলিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। খক্—খক্—খক্। মাথা ঘুরিয়া যায়—সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠে, সুধাংশু সমস্ত দিন বিছানায় পড়িয়া থাকে।

সুলেখা আসিয়াছে তিন দিন। সুধাংশুর হৃদযন্ত্র তিন দিন হইতে একটু দ্রুত চলিতেছে।

সুধাংশু সকালে একটু একটু ঘুরিয়া বেড়ায়। হাসপাতালই তাহার

পৃথিবী। এই পৃথিবীর বাহিরে যে একটা বৃহত্তর পৃথিবী আছে তাহা তাহার প্রায় ভুল হইয়া গিয়াছে।

যক্ষ্মার বীজাণু এতগুলি নরনারীকে একত্র আনিয়া মিলাইয়াছে!

দেয়ালের ওপার হইতে মেয়েদের কথাবার্ত্তার টুকরা এপারে ভাসিয়া আসে। বাহিরের ফুলের বাগান হইতে কখনো একটা মৃদু গন্ধের প্রবাহ বহিয়া যায়। সুধাংশু মনে করে, হায়রে দেয়াল!

সুধাংশু দুর্ব্বল। তদুপরি বিশ্রাম তাহার ব্যবস্থা।

—ডাক্তারবাবু, একটু চলাফেরা না করলে ত আর শুয়ে শুয়ে থাকা যায় না।

—সকালে বাগানে বেড়াচ্ছেন; তার বেশি এখন চলবে না।

২

পার্টিশনের অপর পার্শ্ব।

—ডাক্তারবাবু, আমার বিছানাটা দয়া করে এখান থেকে সরিয়ে দেবেন? সুলেখা বলে।

—কেন?

—দেয়ালের ওপাশ থেকে রাত্রে একটা পুরুষের মাথা যেন উঁচু হয়ে ওঠে—হয় ত স্বপ্ন হবে—কিন্তু রোজই দেখছি।

ডাক্তারবাবু শুনিয়া হাসেন, বলেন, ও কিছু না, দুর্ব্বলতাটা কেটে গেলেই আর কেউ মাথা দেখাবে না।

৩

সাত দিন পরে।

রাত্রি ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। সুধাংশু এবং সুলেখা বারান্দার এক কোণে বসিয়া।

এতদিন পরে আবার সুধাংশুর কাসিতে রক্ত দেখা দিয়াছে।

—সুলেখা, আমরা মিলেছি যুদ্ধক্ষেত্রে।

—কিসের যুদ্ধ ?

—যক্ষ্মার সঙ্গে মানুষের। এ রক্তপাত কি ব্যর্থ হবে ?

—হয়ত হবে, কিন্তু আজ আর যুদ্ধ নয়। আমরা রক্তপথে যাত্রা করেই মিলেছি—এই পথকে আজ নমস্কার করি।

—কিন্তু তোমার সীথিঁতে যে রক্ত-রেখা জ্বল জ্বল করছে—পথ যে বড় ভয়ানক।

সুলেখা চমকিয়া উঠিয়া বলে—ঐ চীনে সিঁদুরের মূল্য আধ পয়সাও না। বল ত এখুনি ধুয়ে ফেলি।

—তুমি কি বিবাহকে সম্মান কর না ?

—আজকের দিনে ঐ জীর্ণ সংস্কারটার কথা বলে আমার মন খারাপ করে দিও না। আমি ত সংস্কারের প্রাচীরেই মানুষ হয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ স্বামী হলেন সাহিত্যিক, বাড়িতে বসল মাসিক পত্রের আড্ডা। তারপর একদল কবির আমদানি হল—স্বামী রইলেন মাসিক নিয়ে, তারা এল আমার দিকে। বুঝিয়ে দিল, মানুষ বিবাহের চেয়ে বড়। এক বছর না ঘুরতেই হল যক্ষ্মা। সামলাতে পারি নি। স্বামী আমায় ত্যাগ করেছেন, কবিরা সরে পড়েছে—আমি আজ একা—এই বিশ্ব সংসারে একেবারে একা।

সুলেখা সুধাংশুর পায়ের কাছে বসিয়া পড়ে। বলে, আজ তুমি আমাকে নাও। আমি এগার জনকে আত্মদান করেছি—কেউ নেয় নি। আমার ফুসফুসের পরিচয় তারা জেনে ফেলেছিল। হতভাগারা হৃৎপিণ্ডটাকে তুচ্ছ করল।

—কি, চুপ করে রইলে যে?

সুধাংশু চুপ করিয়াই থাকে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ মুক্ত আকাশে হাসে, নীচে বাগান হইতে হাস্না হানার উগ্র গন্ধ নেশা ধরাইয়া দেয়—সেই চাঁদের আলোয়, ফুলের গন্ধে, সুধাংশু এবং সুলেখা বসিয়া বসিয়া ফুসফুস হইতে রক্ত ছিটাইতে থাকে।

সুধাংশু বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে—তাহার কথা বলিবার ক্ষমতা নাই।

সুলেখার চোখ জলে ভরিয়া উঠে; টপ টপ করিয়া তাহা সুধাংশুর পায়ের উপর ঝরিয়া পড়ে। সুধাংশু পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া পা দুখানি ঢাকিয়া দেয়।

সুলেখা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—ওগো আমার নিবেদন কি ব্যর্থ হবে?

সুধাংশু গম্ভীর ভাবে বলে, খুব সম্ভব।

—কেন?

—আমিই তোমার স্বামী, আজ এক বছর ইনফেকশন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—তুমি? কি সর্ব্বনাশ, অন্ধকারের পরিচয়, অন্ধকারে ঢাকা রইল না! যক্ষ্মার চেহারা—কেউ কাউকে চেনে না, ফিসফাস ভাষা, মৃদু স্বর, মৃদু কাসি। কিন্তু তোমাকে আমি মিথ্যা পরিচয় দিয়েছি—আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি তোমার স্ত্রী অনিলা নই, আমি তোমার কবি-বন্ধু তরুণ সেনের স্ত্রী—সুলেখা।

সুধাংশু আবেগ ভরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠে, তুমি আমায় বাঁচালে সুলেখা, তুমি আমায় বাঁচালে।

প্রবন্ধ বিভাগ

আর্ট ফর আর্টস্ সেক্

কথা উঠিয়াছে, আর্ট আর্টের জন্য চর্চ্চা করিতে হইবে না সাংসারিক উন্নতির জন্য চর্চ্চা করিতে হইবে? যাঁহারা বলেন আর্টের নিজের কোনো সত্তা নাই, তাঁহারা ভুল বলেন। আবার যাঁহারা বলেন আর্টই আর্টের পরিচয় তাঁহারাও ভুল বলেন। আমরা বলি, আর্ট সাংসারিক উন্নতিরও সোপান নহে, আর্টেও আর্টের পরিচয় নাই। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে। অর্থাৎ কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করিবে। শ্রীকৃষ্ণকে ভাষান্তরিত করিলেই "আর্ট ফর আর্ট্স্ সেক্" কথাটি পাওয়া। গীতা আমাদের ধর্ম্মপুস্তক, গীতার নির্দ্দেশ অমান্য করা চলে না। কিন্তু ফল না চাহিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে ইহা দেশপ্রেমিক মানেন না। তাঁহারা বলেন যাহাই করিব তাহাতেই দেশের কাজ কিছু অগ্রসর হওয়া চাই। এমন কি যদি কাঁদিতে হয় তাহা হইলেও তুলসী তলায় বসিয়া কাঁদা উচিত। ইহাতে কাঁদাও হয়, গাছও কিঞ্চিত জল পায়। সুতরাং যাঁহারা আর্ট ফর আর্টস্ সেক্-এর বিরোধী তাঁহারা হিন্দু নহেন।

কিন্তু আমরা মনে করি দুইটি বিরোধী দল একই বস্তুর দুইটি দিক লইয়া তর্ক করিতেছেন। কোনো এক দল একসঙ্গে দুইটি দিক দেখিতে পাইতেছে না। মনে করা যাউক আর্টিষ্ট এমন একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যাহা দেখিতে সুন্দর কিন্তু সংসারের কোনো কাজে লাগেনা। ঠিক যেন গোলাপ ফুল। দেখিতে ভাল, গন্ধ আছে, কিন্তু ভাজিয়া

খাওয়া যায় না, পিষিলেও তেল বাহির হয় না। এখন এরূপ চিত্রকে অনুমোদন করিব কিনা। অর্থাৎ ইহাকে দেশের মধ্যে প্রচার করিব কিনা। প্রচার করিব। এবং প্রচার করিবার পর যদি কেহ বলেন, "ইহা আর্ট ফর আর্টস্ সেক, অতএব ইহা আমরা মানিব না," তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিব, এই চিত্র প্রচার দ্বারা বহু লোকের অন্ন সংস্থান হইয়াছে, বিনা পয়সায় প্রচার হয় নাই। হাজার লোক ইহা কিনিয়া না হয় একটু খুশী হইয়াছে, ইহার বেশি কেহ কিছু লাভ করে নাই, কিন্তু যত লোকের পরিশ্রমে ইহার প্রচার হইয়াছে তাহাদের লাভটা কি ধর্ত্তব্যই নহে? এইটুকু স্বীকার করিলে, আর্ট যে জন্যই হউক, তাহাতেই যে দেশের কিছু লাভ হয় একথা না মানিয়া উপায় নাই। * * *

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয় বিভাগে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। সত্য সত্যই যাহা বলা উচিত তাহা তৃতীয় বর্ষে বলিব। প্রথম দুই বৎসর একটু বিশ্রাম করিতে চাই। তবে বিশ্রাম করিতে করিতে যাহা বলা যায় তাহাই বলিব। আমাদের শেষ কথা হইবে কৃষি বিষয়ে—কিন্তু বর্ত্তমানে সিনেমা সম্বন্ধে কিন্তু না বলিলে চলিবে না। আমরা হিন্দু, মায়ের নাম স্মরণ করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করিব। সিনে-মা শব্দটি মাতৃ-গর্ভ এবং সেই কারণেই ইহা আমাদের যাত্রারম্ভে আশীর্ব্বাদের মত কার্য্য করিবে। আমরা দেখাইব ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্-এর ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে তাহা ন্যান্সি ক্যারলের টাকার সহিত তুলনীয় নহে। ইহা আমরা প্রমাণ করিব। পাঠকগণ নিরাশ হইবেন না। সিক্রেট অব মাডাম

ব্লাঁশ বইতে যে শিশুটি অভিনয় করিয়াছে সে এক বৎসর বয়সে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবে, এবং আজীবন পেনশন পাইবে। গ্রেটা গার্ব্বোর পরিত্যক্ত গাউন ভারতবর্ষের এক ধনী ব্যক্তি ক্রয় করিবেন বলিয়া গুজব শুনা যাইতেছে। মালে নে ডীট্রিশ গত জানুয়ারি মাসে তিন দিন হোটেলে খাইয়াছেন। ফ্রেডরিক মার্চ রাত্রিতে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া থাকেন। মে ওয়েষ্ট অর্দ্ধ মাইল হাঁটিয়া বেড়াইয়াছেন। চার্লি চ্যাপলিনের মাসিক আয় এক ডলার বৃদ্ধি পাইয়াছে। জ্যানেট গেনর ভারতবর্ষের নাম শুনিয়াছেন। আইরীন ডানের বিবাহ হইয়াছে, তিনি শীঘ্রই দাঁত scraping করাইবেন।

আমরা এই জাতীয় সংবাদ প্রতিমাসে সচিত্র ছাপিব। এ সংখ্যায় আমাদের পত্রিকার সংক্ষিপ্ত নমুনা দিলাম; আশা করি পাঠকগণ আমাদের কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিতেছে। আব দেরী করা উচিত হয় না। আমাকে এখনি মুখে রঙ এবং দাড়ি লাগাইয়া নীল চশমা পরিয়া দাঁতের মাজন বিক্রয়ের জন্য পথে বাহির হইতে হইবে। আরো দিনকত এ কার্য্যটি করিব, তাহার পর, আশা করিতেছি মাসিক খানা শীঘ্রই দাঁড়াইয়া যাইবে। ইতি

শ্রীপরাশর শর্ম্মা

"Did your friend completely recover from his accident ?" "No, complications set in" "Really ? how ?" "He married the nurse."

"পড়ে ফার্সী বেচে তেল্
দেখো তক্‌দির্‌কা খেল"

নব্য গৌড়ের অর্ব্বাচীন অচল-আয়তন-এর অন্তেবাসীকে প্রশ্ন করা গিয়াছিল—"মশায়ের কি করা হয়?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"আজ্ঞে, বী-এ পরীক্ষা দিয়া থাকি।"

"কি করেন?"—এই প্রশ্নের উত্তরে আমিও বলিতে পারি—"আজ্ঞে, বেকারি করিয়া থাকি।"

এই গেল গল্পাণু'র ভূমিকা।

শহরে গিয়াছিলাম—বংশী-বদন কটন মিল্‌স্‌-এ একটা চাক্রী খালি আছে—এই খবর পাইয়া। গিয়া খবর পাইলাম, চাক্রী-ই বটে, তবে 'আছে' নহে, 'ছিল'।

বাড়ি ফিরিতেছিলাম। বাড়িতে আছেন সবাই, নাই শুধু ভাত।

পাঞ্জাবির দুই পকেটে দুইটি পয়সা যুযুৎসু রাজ্যদ্বয়ের মতো নিষ্ফল আক্রোশে glum (গুম) হইয়া রহিয়াছে—মাঝখানে আমি buffer state-এর মতো দাঁড়াইয়া আছি কি না—তাই। যাহাই হৌক—শেষ পর্য্যন্ত উহাদের মিলন ঘটাইবার জন্যই বোধ হয়—দুই পয়সার মুড়ি কিনিয়া খাইয়া ফেলিলাম। দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল—পেটে। কোনো Fire-Insurance Company-র কর্ত্তৃপক্ষই নাকি এ-জাতীয় case-কে বীমা-যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না।

যাহা হউক—অর্দ্ধ-ঘটি জলের সাহায্যে আগুন নিবাইলাম। আগুন নিবিল সত্য, জ্বালা কমিল না।

* * *

কোনো বড় লোকের বাড়িই হইবে। তিন চারিটা কুকুর পরম আনন্দে ভাত-মাছ গিলিতেছে, চিবাইবার ফুরসৎ-ও নাই। নিতান্ত আঁস্তাকুড় বলিয়াই উহাদের দলপুষ্টির উদীয়মান ইচ্ছাটি দমাইয়া ফেলিলাম।

* * *

বছর দুই কাটিয়া গিয়াছে—কিন্তু একটা সমস্যার জবাব মিলিতেছে না :—কোন্ দুষ্কৃতি-বলে কুকুরগুলি কুক্কুর-জন্ম পাইল, আর কোন সুকৃতির ফলে চৌরাশি-লক্ষ-যোনি-ভ্রমণ-অন্তে আমি সুদুর্লভ মানব-জন্ম পাইয়াছি ? কোন্ পত্রিকা পড়িলে ইহার জবাব পাওয়া যাইবে ?

—দণ্ডপাণি উপাধ্যায়

Wife (to husband at 2 a.m.) : "This is the last I will stand. From now on, every time you get drunk, I shall refrain from speaking to you for a week."

Husband : "Make it a month, dear. You know I'm not a heavy drinker."

পুরাতন পঞ্জিকা ঃ একশত বৎসর পরে

মরিয়াও স্বস্তি নাই, কি জানি কখন
গবেষণা-চশমিত তাঁহার নয়ন
পুরাতন নথি ঘেঁটে করে আবিষ্কার
এত খানি জল ছিল এত দুধে কার।
এই ধর জানিতাম শ্রীরামমোহন
উপনিষদের গাভী করিয়া দোহন
ধর্ম্মিলেন * ব্রাহ্মধর্ম্ম, তিনি নব্য ব্যাস
কে জানিত তার মাঝে ছিল এত ড্যাশ!
একবার যদি তাঁর কুষ্ঠী খানা পাই
ফুটপাথে বসা কোনো গণকে দেখাই—
হয়তো দেখিব আছে যশোহানি তাঁর
মৃত্যুর শতাব্দী পরে। এর চেয়ে আর
বড় কি প্রমাণ আছে, বল দেখি মন,
মরিলে যে ফুরায় না মনুষ্য-জীবন!

---

* "Michael thou shoulds't be living at this hour.
Poets have need of thee!" তোমার নজীর না থাকিলে কি ক্রিয়া কর্ম্মের উপর এমন নিরঙ্কুশ হইতে পারিতাম? বিশেষত, এটা Radio-activity-র যুগ, এক পদার্থ অন্য পদার্থে (অপদার্থে?) রূপান্তরিত হইতেছে, শব্দ তো দূরের কথা! তুমি বাঁচিয়া থাকো, তোমার উপরে হস্তক্ষেপ করিলে আমরা ব্রজেনদার উপরে হস্ত প্রক্ষেপ করিব, কিন্তু অন্য অতি-হস্তের (super-hand) জা'মিন হইতে পারিব না।

কল্পনায় দেখিতেছি, নন্দন সভায়
অমর বাঙালী সবে উদ্বিগ্নের প্রায়
চেয়ে আছে সশঙ্কিত পরিষদ পানে
গ্রন্থাগারিকের দিকে, হ'ল তার মানে।
সংবাদ-পত্রের রাজ্যে হে পরশুরাম
তব হস্তে ধ্বস্ত হল কত না সুনাম।
সাহিত্য-পরিষদের তুমি হিট্‌লার;
মাথায় খাড়াই হবে ছয় ফীট যার;
গবেষণা-সাহিত্যের পিরামিড সম
আকৃতি ও প্রকৃতিতে, তোমা নমো নমো।
হয়তো শুনিব স্বর্গে রথ হ'তে নামি
হয়ে গেছে সুপ্রমাণ, ছিলাম না আমি।
পাছে অপ্রমাণ হই সেই ভয়ে এই
গুণ তব গাহিলাম সরস পদ্যেই,
কিছু গুণ গাহিলাম বাকি ব'ল উহ্যে
নাম তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ব্রজেন বাঁড়ুয্যে

———

"কিছুই মনে থাকছে না, এ কথা আজ ডাক্তারকে বলেছি।" "ডাক্তার কি বল্লেন?" "তাঁর ফীটা অগ্রিম চেয়ে নিলেন।"

—

নিবেদন

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস পুনরায় শনিবারের চিঠির পরিচালনাভার গ্রহণ করিলেন। গত দুই বৎসর 'চিঠির' সম্পূর্ণ ভার আমার একার উপর পড়ায় আমাকে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল সজনীবাবু পুনরায় ইহাতে যোগদান করায় সেই সব অসুবিধা দূর হইল। এখন হইতে 'চিঠি' যাহাতে সকল বিষয়ে চিত্তাকর্ষক হয় আমরা সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।

শনিবারের চিঠির পরিচালনা-অফিসের নূতন ঠিকানা হইয়াছে। টাকা কড়ি এবং গ্রাহক-সম্পর্কিত যাবতীয় চিঠি দাস এণ্ড কোং বি-৩ ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (ভিক্টোরিয়া হাউসের নিকট) কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সম্পাদকীয় অফিস ২৫।২ মোহনবাগান রো, ঠিকানাতেই রহিল।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

সংবাদ-সাহিত্য

পৃথিবী এককালে বাষ্পাকার ছিল। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সেই বাষ্প জমাট বাঁধিয়া প্রথমত জল, তারপর জল হইতে বহু রূপান্তরের পথে বর্ত্তমানের এই জটিল রূপ। একটিমাত্র কোষদ্বারা গঠিত প্রাণী আজ বহু-কোষে অভিব্যক্ত হইয়া অবশেষে বিশ্বকোষ এবং মহাকোষে আসিয়া ঠেকিয়াছে; অপরং কিং বা ভবিষ্যতি!

—

বিশ্বপৃথিবীর অভিব্যক্তির এই ধারাটি বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যাহা ছিল অত্যন্ত সরল, তাহাই পরিণামে অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে, এবং এই পরিণামের পথে চলার নামই অভিব্যক্তি। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ একটি প্রশ্ন মনে আসিল। এই যে প্রতি মাসেই বাংলা দেশে নূতন নূতন পত্রিকা বাহির হইতেছে, ইহার বীজ এতদিন কোথায় লুকাইয়া ছিল? ইহা কি কোনো নিয়মিত অভিব্যক্তির ধারা বাহিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে না. কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়া কোনো-কিছুর সূচনা করিতেছে? ইহার উত্তর নাই।

—

বর্ত্তমান ফেব্রুয়ারি মাসেও এই শহরে একখানি মাসিক ও অন্তত দুইখানি সাপ্তাহিক নূতন প্রকাশিত হইল। খুব কমই মনে হইতেছে। কারণ বাঙালী মাত্রেরই বলিবার মত যত কথা আছে তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নহে। কোটি কোটি কণ্ঠের কলরব ত কেবল হাওয়ায়

একটু তরঙ্গ তুলিয়াই মিলাইয়া যাইতে পারে না। তাহা পত্রে পত্রে মুদ্রিত করিয়া না যাইতে পারিলে ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনা হইবে কিসের দ্বারা? বেশি নহে, দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যদি বাংলা দেশে পত্রিকা বাহির করিবার রীতি প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির করিবার জন্য এরূপ গলদঘর্ম্ম হইয়া মরিতে হইত না।

—

পুরাকালে মানুষের ভাষা পাষাণে খোদিত হইয়াছে, কিন্তু সে পাষাণ পথে পথে ফেরি করিবার উপায় ছিল না, তাহা ডাকে পাঠানো যাইত না, তাহার পুনর্মুদ্রন হইত না। দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পাষাণ-লিপি ছিল না। যাহা প্রস্তুত হইত তাহা এক বারের জন্য এবং চিরকালের জন্যই প্রস্তুত হইত। সে যুগের প্রকাশ ছিল কাল-নিরপেক্ষ। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা কালাতীতকে বিশ্বাস করি না, আমরা বর্ত্তমানকে লইয়াই ব্যস্ত। অদ্যকার দিনে যদি পাথুরে পত্রিকা বাহির করিতে হইত তাহা হইলে এক বাংলাদেশের দাবী মিটাইতে হিমালয়ের মত পর্ব্বতও প্রথম মাসেই ফুরাইয়া যাইত। আর যদি বর্ত্তমান-সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ঠিক হয়, তাহা হইলে ত পাথরে কিছু খোদাই করিবারই আবশ্যকতা হইত না, লক্ষ লক্ষ প্রস্তর-খণ্ড সাহিত্যিকগণ পরস্পরের শিরে নিক্ষেপ করিত, এবং তাহারই নাম হইত আধুনিক সাহিত্য।

—

আমরা কিন্তু আধুনিক সাহিত্যকে কেবল মাত্র মাথা ফাটাইবার কাজে নিযুক্ত বলিয়া মনে করি না। ইহার উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার। মানুষ যাহা বলে তাহাই ভাষা এবং তাহাই সাহিত্য। মানুষ নহে, বাঙালী।

বাঙালী ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে, তাহার বাগযন্ত্র হইতে যাহা কিছু বাহির হয় তাহাই inspired. সুতরাং কোনোরকমে গোটা কুড়ি টাকা সংগ্রহ করিয়া রীম পাঁচেক কাগজ কিনিয়া ফেলিতে পারিলেই মার্ দিয়া! অলিতে গলিতে, গৃহে গৃহে বাঙালী তাহার বাণী ছাপাইয়া ফেলিতেছে—না ছাপাইলে তাহা যে কেবল বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গ তুলিয়া অনন্ত শূন্যে মিলাইয়া যায় ইহার ক্ষতিপূরণ করে কে?

—

ভাই বাঙালী বহু ঠকিয়া চতুর হইয়াছে। চতুরতার অর্থই—স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগরিত হওয়া। প্রত্যেক লিখন-পঠনক্ষম বাঙালী সর্ব্ববিষয়ে এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা। যত বাঙালী তত inspiration—এবং তত মাসিক পত্র। অতঃপর হয়ত বঙ্গশিশু মাতৃগর্ভ হইতে পাণ্ডুরোগের সহিত মাসিক পত্রের পাণ্ডুলিপি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইবে।

—

বুক্ অব জেনেসিস্-এর গল্প মনে পড়িতেছে। ব্যাবেলবাসী স্বর্গ ডিঙাইবার যে দুঃসাহসিক মতলব আঁটিয়াছিল বিধাতা বাগ্‌বিভ্রম ঘটাইয়া তাহা ব্যর্থ করিয়া দেন। আমাদের বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ। খুব সম্ভব ব্যাবেলে প্রবাসী-বাঙালীর একটা দল ছিল, এবং তাহারা তথায় মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিল। বাংলা-দেশে এতদিনে এই দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কলরব করিতেছে, প্রত্যেকেই মনে করিতেছে বাণী ছড়াইবার কাল সমাগত।

—

এই দুর্দ্দশায় পৌঁছিবার জন্য কোনো স্বর্গে উঠিবার দুঃসাধ্য চেষ্টা করিতে হয় নাই, কোনো ভগবানকেও কোনো কারণে ভাষাগত গোলমাল সৃষ্টি করিবার জন্য স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে হয় নাই, বাঙালী যাহা করিয়াছে তাহা সে নিজগুণেই করিয়াছে। এখন কেবল বাকী রহিল নিজেদের ফোটোগ্রাফ বাজারে বাহির করা। বাণী মূলবান, রূপও মূল্যবান। এ দিকটায় এখনো কাহারো দৃষ্টি পড়ে নাই কেন বুঝা যায় না। আশা করি শীঘ্রই বাণীর সঙ্গে রূপ যুক্ত হইয়া রূপ-বাণীরূপ পূর্ণতা লাভ করিয়া বাংলাদেশ ধন্য হইবে।

—

আমাদের এই বিভাগের "সংবাদ-সাহিত্য" নামটির জন্য নিজে-দিগকেই ধন্যবাদ দিতেছি। ইহা যদি "সাহিত্য-সংবাদ" হইত তাহা হইলে কি মুস্কিলেই না পড়িতাম! কারণ বঙ্গ-সাহিত্যের কোনো সংবাদ নাই, মৃত্যু-সংবাদের জেরটানাতেও কিছু লাভ নাই, তাই উল্টা পথ ধরিয়াছি।

—

গীতা-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বলা হইয়াছে, বেদান্ত, গোধেনু; গীতা, দুগ্ধ; ভোক্তা, সুধীজন। আধুনিক গোষ্ঠী-সাহিত্য বেদান্তেরই ভিন্নরূপ। ইহাই সাহিত্যের গোষ্ঠরূপ। শিং বাঁকাইয়া, পুচ্ছ তুলিয়া সাহিত্য-ধেনু গৃহস্থকে উৎপীড়িত করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ বেদান্ত-ধেনু দোহন করিয়া যেমন সুধীজনের জন্য গীতা-দুগ্ধ বাহির করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনি আধুনিক সাহিত্য-ধেনুর দোহন কার্য্যে লাগিয়াছি। কিন্তু এ ধেনু জাত-ধেনু নয়, তাই আমাদের দুগ্ধ সাহিত্য-নিষ্কাসিত অকৃত্রিম দুগ্ধরস নহে, ইহা যৌগিক বা

synthetic দুগ্ধ। অর্থাৎ সাহিত্যের সংবাদ আমরা বহন করি না, সংবাদের পায়েই আমরা সাহিত্যের ঘুঙর বাঁধিয়া দিই। ইহা যথাস্থানে যথারীতি বাজে এবং আশানুরূপ ফল প্রসব করে।

—

ফেব্রুয়ারিতে 'উন্মোচন' নামক নূতন মাসিকপত্র বাহির হইয়াছে। নামটি বড় ভয়ানক। পাপ মোচনের কথা মনে আসে। এদিকে পাতায় পাতায় আশীর্ব্বাদের ছাপ। দেখিয়া মুক্তি সুদূরপরাহত নহে বলিয়াই ত মনে হইতেছে। কিন্তু মাসিকপত্র বাহির করিতে আশীর্ব্বাদ কেন? সোজা লেখা চাহিলেই হইত। কিন্তু ইহাতে আশীর্ব্বাদকারীর কোনো দোষ নাই। এদেশে যিনি একবার লেখায় নাম করিয়াছেন, তাঁহার উপরে সমগ্র দেশের দাবী। লিখিতেই হইবে। মন ভাল না, তথাপি লেখ; শরীর অসুস্থ, হউক, লেখা চাই; লিখিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে, কিছু যায় আসে না, লেখ। এই ভাবে লিখিতে লিখিতে যখন মৃত্যু আসন্ন, কথা বলিবার ক্ষমতা লুপ্ত, তখনো উৎসাহী মাসিক-চালক কানের কাছে টাকার থলি বাজাইতে থাকে।

—

মৃতপ্রায় লেখক টাকার শব্দে চোখ তোলেন, বলেন আশীর্ব্বাদ দেব? প্রার্থনাকারী বলে, ঠাকুর যাহা হয় দাও, কম্পোজিটর বেকার বসিয়া আছে। আশীর্ব্বাদী রচনার ইহাই ইতিহাস। রস নিষ্কাসিত হইয়া গেলেই আশীর্ব্বাদের ছোবড়া লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। আরো মজা এই, যাহাদের রস কোনোকালেই ছিল না, তাহারাও এই সুযোগে আশীর্ব্বাদকের শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে।

—

আশীর্ব্বাদের পন্থাটি আবিষ্কার না করিলে রবীন্দ্রনাথ হয়ত এতদিন বাঁচিতেন না। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, মাসিকপত্র বাহির করিয়া এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার কি সার্থকতা আছে? রবীন্দ্রনাথ ত পৃথিবীর সকল প্রতিষ্ঠানকেই আশীর্ব্বাদ করিয়া রাখিয়াছেন, সেইটুকু স্মরণ করিয়া কাজে নামিলেই হয়! তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলে ত ভক্তের উপযুক্ত হয় না! অনেকে আবার এই আশীর্ব্বাদের জন্য টাকা দিতেও রাজি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদে আর সর্ব্বসিদ্ধি কবচে কোনো ভেদ নাই!

কিন্তু আশীর্ব্বাদ লইতেই হইবে! ট্রেনের একটি দরজা খোলা পাইলে যেমন যাবতীয় যাত্রী সেখানেই ভীড় করে—কদাপি অন্য দরজা খুলিতে চায় না, মাসিকপত্রের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার বেলাতেও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে। রবীন্দ্রনাথকে প্রাণান্ত করিতে করিতেও তাঁহার আশীর্ব্বাদ চাই—না হইলে ফ্যাশন হইতেছে না। কিন্তু আশীর্ব্বাদেও যে মাসিক পত্র চলে তাহা এক বাংলাদেশই প্রমাণ করিল। ফলে সাহিত্যের যাহা দুর্দ্দশা হইতেছে এক শতাব্দীর চাবুকেও হয়ত তাহা মোচন হইবে না।

—

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বলিতেছেন—"তোমরা আমার কাছে চেয়েছ আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ করবার আমার অধিকার আছে, কারণ প্রথমতঃ,—তোমাদের মতে আমি একজন প্রবীণ সাহিত্যিক।" আশীর্ব্বাদ দিবার সময় প্রবীণ সাহিত্যিকগণও যে এরূপ গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা ত আমরা জানিতাম না! তরুণ সাহিত্যিক

নিজে নিজকে তরুণ বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হয় এইটুকু জানা ছিল, এখন হইতে প্রবীণ সাহিত্যিকও নৃত্য সুরু করিলেন জানিয়া ধন্য হইলাম!

—

চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন—

> প্রতি সাহিত্যিককেই নিজ চেষ্টায় আত্ম-বলে সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে, অপরের উপুড় হস্ত বা চিৎহস্তের সাহায্যে নয়। প্রতি সাহিত্যিকই একলা।—দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ—এমন কথা কোনো সাহিত্যিকের মুখেই শোভা পায় না।

কিন্তু এই পুরাতন কথাটাই এতকাল পরে নূতন করিয়া বলিবার দরকার হইল কেন কিছুতেই বুঝিতেছি না। প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। কথাটা চৌধুরী মহাশয়েরও ভাল লাগিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের একটা গল্প মনে পড়িতেছে। বলা বাহুল্য গল্পটি গুলিখোরের আড্ডা হইতে প্রচারিত। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। এক গুলিখোর বলিয়া উঠিল "তিনটে বাজলো।" তাহার বন্ধু পাশেই ছিল—সে বলিল—"দুশ্‌শালা, ওতো তিনবারই একটা বাজলো!"—এই তিনবার একটা বাজাকেই যে তিনটা বাজা বলে ইহাও কি চৌধুরী মহাশয়কে শিখাইতে হইবে? প্রতি সাহিত্যিকই যে একলা ইহা কিরূপ আবিষ্কার?

—

কেহই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন নাই যে মহাভারত এক ব্যক্তির রচনা। অথচ সকলেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়া থাকেন যে মহাভারত

সাহিত্য। এক ব্যক্তির রচনা হইলে তিনিও যেমন একলা, আর যদি একাধিক ব্যক্তির রচনা হয় তাঁহারাও তেমনি একলা কিন্তু এরূপ না বলিয়া চৌধুরী মহাশয় যদি বলিতেন যাহারা একলা তাহারাই সাহিত্যিক, তাহা হইলে লজিক ভুল হইত বটে কিন্তু কথাটা নূতন হইত। বীরবলের রসিকতা আর নাই, থাকিলে তিনি সহজেই দিনকে রাত করিতে পারিতেন। রসিকতা আসে না বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করিতে হইয়াছে !

—

রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়" নামক সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের নানারূপ সমালোচনা হইতেছে। তন্মধ্যে একটি সমালোচনা উল্লেখ-যোগ্য। রামানন্দবাবু মাঘের প্রবাসীতে বলিয়াছেন—

> "যখন রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় গল্পটি পড়া শেষ করেন, তখন শ্রোতাদের মন এরূপ অভিভূত হইয়াছিল যে কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। একা আবার পড়িয়া মনের অবস্থা সেইরূপই হইল। * * যখন পড়া শেষ করিলাম, তখনকার মনের অবস্থা প্রকাশ করিবার মত কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

আমাদের অবস্থাও সেইরূপ, কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় কথা খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

—

তিনি আশীর্ব্বাদ প্রবন্ধে বলিতেছেন—

> * * নূতনত্বের সাক্ষাৎ আমরা কিশোর লেখকের লেখাতেও পেতে পারি, বৃদ্ধ লেখকের লেখাতেও পেতে পারি। একটি উদাহরণ দিই। রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত

> গল্প "চার অধ্যায়" কি প্রবীণ-সাহিত্য না তরুণ-সাহিত্য? অনেকে প্রথম বয়সেও মৃত, শেষ বয়সেও তাই। কেউ কেউ আবার অল্প বয়সেও বাচাল, এবং বেশী বয়সেও বাচাল হন। অবশ্য এ উভয়ের কেউই সাহিত্যিক নন।

ইহা পড়িয়া কি বলিব কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

—

বীরবল "চার অধ্যায়" লইয়া রবীন্দ্রনাথের উপর এরূপ মার-অধ্যায়ী হইলেন কেন বুঝিতেছি না। অথবা নিজের রসিকতার জালে নিজেই আটকাইয়া পড়িয়াছেন! এরূপ pun বড় মারাত্মক। ভাবিয়া দেখিলাম, প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ই ঠিক বলিয়াছেন, কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরাও বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি, অজ্ঞাত কবি, নীরব কবি, এবং অকবির মধ্যে নীরব কবিই শ্রেষ্ঠ।

—

নূতন মাসিকপত্র-চালকের আর একটি লক্ষণ এই যে পৃষ্ঠা পূর্ণ করিবার জন্য যে-কোনো ব্যক্তির পৃষ্ঠ-পোষকতা ইহারা মহানন্দে বরণ করিয়া লন। সম্প্রতি আশীর্ব্বাদের অনুরূপ আর একটি জঞ্জাল মাসিকের পৃষ্ঠায় দেখা যাইতেছে। ইহার রচয়িতা এবং পত্রস্থকারী এতদুভয়েরই রুচি-জ্ঞানের সীমা নাই। লজ্জা ত বহুদিন হইতেই লজ্জায় পলাইয়াছে—কাণ্ডজ্ঞানও অন্তর্হিত। এক দিকে আশীর্ব্বাদ, অন্য দিকে ব্যক্তিগত চিঠি। কবে ইহারা নিজেদের জমাখরচ ও ধোপার হিসাব, সাহিত্য বলিয়া চালাইবেন তাহা দেখিবার অপেক্ষায় রহিলাম।

—

'রঙ্গী-ভঙ্গী-তর্কী'—রচনার শিরোনাম দেখিলেই সন্দেহ হয় লেখকের মাথায় ছিট আছে, পরক্ষণেই যখন চোখে পড়ে, লেখক আর কেহ নয় স্বয়ং দিলীপকুমার রায়—তখন আর কোনো সংশয় থাকে না।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে রসিকব্যক্তি ছিলেন তাহার কিছু নজির হাসির গানে রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরম রসিকতা বোধ হয়—পল্টা জগা। উত্তরাধিকার সূত্রে সেও রসিক হইবে মনস্থ করিয়াছে। কিন্তু আধুনিক তরুণ-সাহিত্যিকের হাতে পড়িয়া রসিকতার সুর এত চড়িয়া গিয়াছে যে সে-আসরে সহজ ভব্য রসিকতা আর জমে না। বাপ্‌কে শালা না বলিলে কেহ হাসে না। তাই বুদ্ধিমান জগাই ফরাসী ভাষায় pun করিয়া বলিতেছে—হালা ডি এল্ রায়!

ব্যস! আর যায় কোথা! তরুণ মহলে হাসির হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে। বীরবল নিশ্চয় বীরবলী ভঙ্গিতে বলিতেছেন—সাবাস! আর যে হতভাগ্য গণিতের ছাত্র, মাপ জোক করিয়া দিলীপের ছন্দের ভুল ধরিতে বসিয়াছিল, সে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে।

হায় ৺ ডি এল রায়! তোমার এই চরম রসিকতাটিকে পৃথিবীতে না আনিলে কি চলিত না? বিজ্ঞ ব্যক্তি হইয়া তুমি কেন এমন দুষ্কার্য্য করিলে?

—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা ভাল; বারবার পুনরাবৃত্তিতেও দোষ নাই। কিন্তু মিষ্টার টমাসের ছবি? উহাও কি সমপর্য্যায়ভুক্ত? দেখিলে হৃদয়ে আধ্যাত্মিক রসের উদয় হয়?

গত দুই বৎসর যাবৎ মাসিক বসুমতীর প্রতি সংখ্যায় একই

নারীমূর্ত্তির বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া দেখিয়া অতি বড় নিঘিন্নে দর্শকেরও দর্শনলালসা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এবার একটু মুখ বদলের ব্যবস্থা করুন না। না হয় ফোটোগ্রাফ নাই হইল; ছবিতে স্তন থাকিলেই আমাদের আর কোনো নালিশ থাকিবে না।

—

প্রবাসী ওঁরাও-ভকতের গান তর্জ্জমা করিয়া দিয়াছেন—'মহিষের জীবন আর মানুষের জীবন একই জীবন। মহিষ শাবকের জীবন আর মানুষের জীবন একই জীবন। এইরূপ গোরু বাছুর ইত্যাদি।'

অসভ্য আদিম ওঁরাও-ভকত যাহা অনেক দিন আগে বুঝিয়াছিল, বাঙালী এত দিনে তাহা শিক্ষা করিতেছে। শিক্ষাগুরু এক দিকে ইংরেজ, অপর দিকে কংগ্রেস।

—

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—

—'কে জানে কোথায় বসি বিধাতা লেখেন বিধি লিপি।' ঠিকানা ত সাবিত্রীবাবুর জানা আছে। সেখানে বিধাতার হংসপুচ্ছের ঠেলায় মূক বাচাল হইতেছে, পঙ্গু গিরি-লঙ্ঘনের অভিযান করিতেছে; সাবিত্রীপ্রসন্নেরও পুরুষত্ব জাগিয়াছে। সেখানে—

কিন্তু যাক—

সাবিত্রীবাবু এবার একটি বিবাহ করুন।

—

আশীর্ব্বাদ-সাহিত্যের কথা বলিয়াছি, কিন্তু শেষ হয় নাই; আবার কতগুলি কথা মনে পড়িল। যৌবনে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।" ইহা শিশুদের উদ্দেশ্যে

লেখা। সেই সব শিশু রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াছে, কিন্তু কবির চোখে এখনো তাহারা শিশু। সেই অতীত যুগের শিশু আজও তাহার দাবী ছাড়িতেছে না। কেহ ময়দার কল খুলিয়া, কেহ কাপড়ের কল খুলিয়া, কেহবা মাসিকপত্র বাহির করিয়া কবির আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। কবি এবং অন্যান্য যাঁহারা আশীর্ব্বাদের কারবার খুলিয়াছেন তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার মত কেহই জীবিত নাই ইহাই দুঃখ।

—

একখানি ছবি কল্পনা করিতেছি। মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ, উভয় পার্শ্বে অন্যান্য শ্রদ্ধেয় আশীর্ব্বাদক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী উপবিষ্ট। নীচে লেখা আছে—"(এখন) ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।"

—

অবস্থা এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। যিনি এতকাল বঙ্গদেশের লেখকগণকে এবং কলকারখানার মালিকগণকে সার্টিফিকেট দিয়া আসিলেন, তাঁহার নিজের জন্য এতদিন পরে সেই সকল সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে চিনিলাম না বলিয়া আমাদিগকে তিনি যতই মন্দ বলুন, আমরা সার্টিফিকেট পাইয়া তাঁহাকে চিনিব এরূপ দুর্দ্দশা যেন আমাদের কোনোদিন না হয়। রবীন্দ্রনাথকে আমরা বাস্তবিকই চিনি নাই। "তোমায় চিনি বলে মোরা করেছি গরব লোকের মাঝে।"—এখন সে গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে।

—

বাংলাদেশ তাঁহাকে চেনে নাই, ইহা আর প্রমাণ করিতে হইবে না। বর্ত্তমানে পাঞ্জাব তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া মনে

হইল। ৪ই ফেব্রুয়ারি হইতে 5th Punjab Students' Conference-এ রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কে এবং তাঁহার মূল্যই বা কি, ইহা না জানিলে টিকিট বিক্রয় হইবে না আশঙ্কায় কন্‌ফারেন্স হইতে একখানি সচিত্র বিজ্ঞাপন বিলি করা হয়। এই বিজ্ঞাপনে মহাত্মা গান্ধী, জন বোয়ার হইতে তারকনাথ দাস, হরিসিং গৌর প্রভৃতি অনেক মহাপুরুষেরই সার্টিফিকেট ছাপা হইয়াছে।

—

মোট নয়টি সার্টিফিকেট আছে!

১। * * I owe much to Rabindranath Tagore * *
M. K. GANDHI.

২। Rabindranath Tagore is India bringing to Europe a new divine symbol, not the Cross, but the Lotus. * * *
JOHN BOJER.

৩। Dr. Rabindranath Tagore has long been acclaimed as the world's greatest living poet. * *
SONYA RUTH DAS.

৪। * * * Rishi Rabindranath made a very substantial contribution to the cause of Indian freedom. * * *
TARAK NATH DAS.

৫। * * * The voice of Tagore has been the voice of a Messiah preaching in the wilderness * *
(SIR) HARI SINGH GOUR

৬। * * Creative energy, incessant and wide-spreading etc
E. B. HAVELL.

৭। Tagore the teacher takes rank with Tagore the poet and philosopher. (Rev.) J. H. HOLMES,

৮। In a few centuries mankind will realise that Rabindranath Tagore means very much the same to India as Homer to Europe. * *
H. KEYSERLING

৯। * * * the songs of Tagore are resounding in our hearts as a beautiful call for liberation.
P. S. KOGAN.

টিকিটের মূল্য পাঁচ টাকা হইতে চারি আনা। ইহার পরেও যদি কেহ বলে, পাঞ্জাব রবীন্দ্রনাথকে চেনে নাই, তাহা হইলে তাহাকে ধিক।

মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে নন্দকিশোর দাসের 'রস-কলিকা' নামক প্রবন্ধের ভূমিকায় লেখা আছে—

> খুঁজিতে খুঁজিতে বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রের একখানা বাঙ্গালা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। যতদূর জানি, পুঁথিখানি অজ্ঞাত। অজ্ঞাত এই হিসাবে যে, গ্রন্থখানি ছাপা ত হয়ই নাই, ইহার বিবরণও অন্য কোনও পত্রিকায় এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই।

গোলমালে পড়িলাম। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (৮ম ভাগ ১৮৭ পৃঃ) যে পাণ্ডুলিপির কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা কিসের পাণ্ডুলিপি?

ভারতবর্ষের এক কবির 'তেরে' পর্য্যন্ত উন্নতি হইয়াছে—আরো কয়েক ধাপ শীঘ্রই হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

তে— সোনালী ধানেতে…
গেলো বছরেতে…
দুখেতে পরাণ ফাটে…
তোমারে ছাড়িয়া মাঠেতে আমার…
তোমার বুকেতে…
বেড়ার ফাঁকেতে…
চাষীর প্রাণেতে
জ্যোছনা আলোতে…

রে— খড়গুলি সব বুধিরে খাওয়াবো…
তোমারে সাজাবো…
তোমারে না দেখি…
তোমারে ছাড়িয়া মাঠেতে…
তবুও তোমারে…
তোমারেই ভালবাসি…
তোমারে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না…
রাতেরে করিছে ভোর…
নীরব বধূরে…

কবিতা চেষ্টা না করিয়া তবলার বোল বাজাইতে অভ্যাস করিলে দ্রুত উন্নতির সম্ভাবনা।

—

"আজকাল" পত্রিকায় একটি গায়ক গায়িকা তালিকা দেখিলাম। লম্বা তালিকা—

গায়ক	গায়িকা
নরেশচন্দ্র রায় ১ বার	আঙ্গুরবালা ১ বার
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ১ বার	ইন্দুবালা ২ বার
কৃষ্ণচন্দ্র দে ২ বার	রাধারাণী ৩ বার
উমাপদ ভট্টাচার্য্য ১ বার	ফুল্লনলিনী ১ বার
শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ১ বার	আশালতা ১ বার
ধীরেন দাস ২ বার	আভাবতী ১ বার
হরিদাস ব্যানার্জ্জি ১ বার	হরিমতি ১ বার
পঙ্কজ মল্লিক ১ বার	প্রভাবতী ১ বার
শৈলেশ দত্তগুপ্ত ১ বার	কমলবালা ২ বার
	ইত্যাদি ইত্যাদি

বসিয়া বসিয়া গণিল কে ?

স্ত্রীজাতি পৃথিবীতে সন্তানপালন ছাড়া যে আর কোনো মহৎ কাজই করিতে পারে না, ইহা প্রতিদিন প্রমাণ করিয়া লাভ কি ? জানি একথার উত্তরে অনেকে কতকগুলি ব্যতিক্রমের নজির দেখাইয়া তর্ক করিতে আসিবেন। ব্যতিক্রম কোথায় নাই ? সুতরাং সে কথা না তোলাই ভাল। স্ত্রী, পুরুষের অনুকরণে অনেক কিছুই করিয়াছে, এমন কি কবিতাও লিখিয়াছে কিন্তু অনুকরণ কখনো সজীব হয় না, অধিকাংশ সময়েই তাহাতে বিকার দেখা দেয়—এবং স্ত্রীজাতির প্রতি স্বাভাবিক করুণা-বশে পুরুষ তাহা সহ্য করিয়া থাকে।

মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের কৃপায় আমরা এইরূপ কয়েকজন স্ত্রী-কবিকে দেখিতেছি। স্ত্রীলোক একমাত্র পোষাক ছাড়া যে আর কিছুতে—(এমন কি আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও) অতি আধুনিক হইতে পারে না ইহা অন্তত বাঙালী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে। যাহা হইবার নয়, তাহাই হইতে হইবে বলিয়া ইচ্ছা করা হয়ত অন্যায় নহে, কিন্তু ইহাই সত্য যে হওয়া যায় না। ঘরের বধূকে রাস্তায় চলিতে দেখিয়া যেমন একদল লোক বলিয়াছিল যে উহারা আধুনিক হইয়াছে—এইরূপ কবিতা লেখা দেখিয়াও কেহ কেহ সেরূপ মনে করিয়া থাকিতে পারে। যাহারা এরূপ মনে করে তাহারা আধুনিকতার অর্থ জানে না।

—

আধুনিক হইতে যে সাহস দরকার বাঙালী স্ত্রীলোকের সে সাহস নাই। হয়ত আধুনিক হইবার সখ মনের মধ্যে কখনো কখনো উঁকি ঝুঁকি মারিয়াছে—হয়ত কখনো সে কল্পনা করিয়াছে, মেয়েদের পার্টিতে প্রেম করিবার মত একটি পুরুষ আসিয়া পড়িলে মন্দ হয় না—হয়ত ইহা লইয়া অক্ষর গুণিয়া গুণিয়া একটা ছড়াও লিখিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে আধুনিকতার সেই উগ্র ঝাঁজ কৈ? একপাল পুরুষের মধ্যে ঠাকুরঝি কাহার জন্য ফুলের তোড়া বাঁধিতেছে, কাহাকে খুশী করিবার জন্য সে বিবি হইয়াছে, এবং কোন্ যুক্তিতে চলিলে বহু প্রণয়ীর মধ্যে স্বামী হিসাবে একজন জুটিতেও পারে, বৌদি এসব তথ্য আলোচনা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু লেখিকার মনের মধ্যে যে বৌদিটি রহিয়াছেন তাঁহাকে কিছু বলিবার কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

—

ছদ্মবেশী সিরোলিনের বিজ্ঞাপন সহ্য করিতেছি সুতরাং বীণা লাইব্রেরির অবনীনাথ রায় মহাশয়ের বিজ্ঞাপনও হয়ত সহ্য করিতে পারিব। কিন্তু মানুষের কোন্ অবস্থায় এরূপ দুর্ম্মতি ঘটে তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থকারের নাম গ্রহণ করিয়া একজন মহিলার বিজ্ঞাপন প্রচারার্থ গায়ে পড়িয়া অপর একজন মহিলাকে অপদস্থ করিবার এই হীন প্রয়াস নিশ্চয়ই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের প্রভাবে ঘটে নাই। অবনীবাবু কচি খোকাটি নহেন, তিনি নিশ্চয়ই এটুকু বুঝিতে পারেন যে তাঁহার সাহিত্য-বিচার সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রামাণ্য নহে। তিনি ইহাও বুঝেন যে নিজেকে গ্রন্থকার হিসাবে পরিচিত করাইলেও লোকে তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া ছাড়া তাহার অন্য কোনো মূল্য নাও দিতে পারে। মীরাটে থাকিলেও বঙ্গদেশে কত লক্ষ গ্রন্থকার আছে তাহাও তাঁহার নিশ্চয়ই অজানা নাই। তবু তিনি এরূপ করিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজে না দিলে অপর কেহ দিতে পারিবে না।

—

আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি এই মহৎ কার্য্যটি করিয়াছেন—

<u>সাহিত্যক্ষেত্রে দুইজন আশালতা দেবী</u>

> মহাশয়, আপনার সর্ব্বত্র-পঠিত দৈনিকে আমার নালিশটুকু পত্রস্থ করিলে বাধিত হইব।
>
> ভাগলপুরের সুলেখিকা শ্রীযুক্তা আশালতা দেবী সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা। তিনি "মানসী" "অমিতার প্রেম" "অভিমান" প্রভৃতি উপন্যাস, ছোট গল্প এবং বহু

প্রবন্ধ লিখিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন আগে নাথ ব্রাদার্স "হে বন্ধু বিদায়" নামক একখানি উপন্যাস ছাপেন। এখানকার লাইব্রেরীতে আমরা উক্ত উপন্যাস-খানি আনাইয়া দেখি যে, উহা নিতান্ত কাঁচা হাতের লেখা। পরে ভাগলপুরের আশালতা দেবী জানান যে, উক্ত পুস্তক তাঁহার লেখা নহে। সম্প্রতি কাত্যায়নী বুক ষ্টল 'বিরহের অন্তরালে' নামক আর একখানি বই প্রকাশ করিয়াছেন। এখানিও ভাগলপুরের আশালতা দেবীর লেখা নহে। সর্ব্ব-সাধারণের ভ্রম অপসারণের জন্য ইহা প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করি। নয় ত আমাদের মত অন্য ক্রেতারাও বই কিনিয়া ঠকিবেন। ভাগলপুরের আশালতা দেবী ইহাতে ক্ষতিগ্রস্তও হইতেছেন।

গ্রন্থকার হিসাবে আমি নিজের পক্ষ হইতেও এই কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

শ্রীঅবনীনাথ রায়, বীণা লাইব্রেরী, মীরাট

—

মীরাট লাইব্রেরির পক্ষ হইতে কি না জানি না, অবনীবাবু একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন। লেখা মনের মত না হইলেই তিনি লেখককে (কিংবা বিশেষ করিয়া লেখিকাকে) চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহেন ইহা তাঁহার নিজের লেখা কি না। ইতিপূর্ব্বে অপরাজিতা দেবীর লেখাগুলি অপরাজিতা দেবীর না রাধারাণী দেবীর তাহা জানিবার জন্য কিছুদিন শিলংএর পথে পথেও ঘুরিয়াছেন! বড় মুস্কিল! ভাগলপুরের আশালতা

দেবীর ক্ষতিও অবনীবাবুর সহ্য হয় না, অপর পক্ষে "হে বন্ধু বিদায়"-এর লেখিকা আশালতা দেবীর বই বাজারে বিক্রয় হয় ইহাও সহ্য হয় না। অবনীবাবু করিবেন কি? নিজে ত গ্রন্থকার বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন, কি গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাই আপাতত বিক্রয়ের চেষ্টা দেখিলে ভাল হয় না কি?

অবনীবাবুর কর্ত্তব্য গুরুতর তাহা বুঝিতেছি। তাঁহার চক্ষুলজ্জা এবং কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান যে কিরূপ লঘুতর তাহাও বুঝিতেছি, কিন্তু উদ্দেশ্যটি এখনো বুঝিতে পারিতেছি না। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক উপরে লিখিয়া দিয়াছেন, "মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।"—কথাটি খুবই ভাল, কিন্তু উহা ছাপাইবার জন্য দায়ী কে? কম্পোজিটার নিশ্চয়ই নহে। কোনো গ্রন্থে specific কোনো অনিষ্টকর বিষয় থাকিলে সর্ব্বসাধারণকে তাহার বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া যায়; কিন্তু "নিতান্ত কাঁচা হাত" বলিয়া খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া তাহার বিক্রয় বন্ধ করিবার অধিকার কাহারো নাই। অবশ্য মুদ্রণ খরচ প্রকাশককে মনিঅর্ডার করিয়া দিলে হয়ত এরূপ বলিবার কিছু অধিকার জন্মে। আইন না জানিয়া ওকালতি?

বাঙালী জীবনের উদ্দেশ্যের ঠিক নাই। কেহ কাব্যতীর্থ পাস করিয়া ইলেকট্রিক্যাল মিস্ত্রী হয়, কেহ বী-এস-সী পড়িয়া স্কুলের হেড পণ্ডিত হয়, কেহ বা আর্ট স্কুল হইতে পাস করিয়া মুদির দোকান

দেয়। গল্পে আছে, জনৈক ব্যক্তি একদা ডায়েরি লিখিতে আরম্ভ করে। তাহার ডায়েরির প্রথম দুই পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিতেছি—

১লা জানুয়ারি—সৎকার্য্য করিব সঙ্কল্প করিলাম।

২রা জানুয়ারি—সঙ্কল্প টিকিল না।

উপরের দুইটি উদাহরণে প্রথমটায় আমরা কয়েকটি জীবন দেখিলাম, দ্বিতীয়টায় দুইটি দিন দেখিলাম। এইবার, কাগজের এক সংখ্যাতেই কিরূপে উদ্দেশ্যের গোলমাল হইয়া যায় তাহা দেখাইতেছি।

—

স্বদেশ নামক মাসিক, বর্ত্তমানে মাসে চারি কিস্তিতে প্রকাশিত হইতেছে। অর্থাৎ মাসিক সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখিতেছেন—

বাংলার মর্ম্মের বাণী স্বদেশের বলিবার কথা; বাংলার নবনীত কোমল হরিত দুর্ব্বায়, গঙ্গার তরল রজতধারায়, পদ্মার কূলে কূলে, আম-কদলী (?) ছায়া শীতল পল্লীর স্নিগ্ধ কল্যাণশ্রীতে যে কথা মুখরিত হইতেছে, স্বদেশের বলিবার কথা তাই। সেকথা রাজনীতির কচায়ন নয়, হিন্দুমুসলমানের ক্ষুদ্র স্বার্থের হানাহানি নয়, বিদেশী গিল্টি করা স্বরাজের ব্যর্থ ধুয়া নয়। সে কথা সমগ্র মানবজীবনের পূর্ণতার কথা, সুসমঞ্জস কল্যাণের গায়ত্রী, মানবে দেবত্বের ওঙ্কারনাদ।

প্রথম পৃষ্ঠায় উদ্দেশ্য বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

—

কিন্তু নবম পৃষ্ঠায়—

—যাকৃগে—তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলি শোন। সেই ছেলেটি ক্রমে জুতো রেখে আমার কাছে সরে এল। আমি

যেন ঘুমিয়ে আছি। সে কাছে এল। হাঁটু দুটোকে ফোল্ড
ক'রে নিয়ে আমার দেহের উপর সে ঝুঁকে পড়েছে—পড়ে,
দুই চোখ দিয়ে আমার শরীরটাকে গিলছে।

অর্থাৎ নবম পৃষ্ঠাতেই আমরা ফোল্ডিং হাঁটুর সাক্ষাৎ পাইলাম।

—

জানি শেষ পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দেওয়া ছাড়া তরুণদের অন্য গতি নাই। মেঝে এবং ফরাস ভাসাইতে ভাসাইতে জীবনটাকে যতদূর ঠেলিয়া লওয়া যায়! শুনিয়াছি পেঁচি-মাতাল নাকি মদ দেখিলেই নেশাগ্রস্ত হয়, কিন্তু কথার মাদকতায় ভাসাইয়া দেওয়া এই প্রথম শুনিতেছি। শিখণ্ডী-কবি বলিতেছেন,

দিনটা আজ নরম মেঘে ভিজে
কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কি যে!
এই তো কথা, ভাসায়ে দিই নিজে
আবেশ বশে, কথায় মাদকতা! (Hic—)

পরিচয়ের আভিজাত্য বুঝি আর টেকে না।

—

না টিকিবার আরো লক্ষণ আছে। শুনিয়াছি অভিজাত সম্প্রদায় সাধারণ গৃহস্থের মত বাজার খুঁজিয়া সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মাল শস্তায় কিনিয়া ব্যবহার করে না। করিলে আভিজাত্য নষ্ট হয়। কিন্তু পরিচয় এবারে চোর-বাজারের পুরাতন মালে ঘর সাজাইয়াছেন। ১৩৪০ সালের ভাদ্র সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া টিপ্পনি করা হইয়াছিল সেই কবিতাটি ১৩৪১ সালের মাঘের পরিচয়ে স্থান পাইয়াছে। শিখণ্ডী-কবি রচিত "প্রকৃতির ছায়ে

বনভোজন"এর কথা বলিতেছি। খুব সম্ভব নামটা বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্ব নাম আমাদের স্মরণ নাই।

—

কবিতাটি নানা দিক দিয়াই মূল্যবান, বিশেষত পরিচয়ে ইহার মূল্য আরো বেশি। কারণ—

যদিচ মামুলি তবুও ট্রেনে
মিলিব উভয়ে—কি বলো তুমি?
মা-কে তো ভোলাবে বুলাকে এনে?

সুধীন দত্ত মহাশয় কিসে ভুলিলেন?

—

পরিচয়ের একই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং উক্ত শিখণ্ডী-কবি—উভয়ে মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের travesty করিয়াছেন। কাহাকেও আনিয়া কাহাকেও ভুলাইতে হয় নাই।—শম্ভু ভোলানাথের ভ্রান্তি ক্ষমার্হ কিন্তু সুধীন দত্ত মহাশয় কিসে ভুলিলেন?

—

আমরা চুরির পৃষ্ঠ-পোষকতা করি না, চোরের ত নহেই। চোরের পৃষ্ঠের উপরে সাধারণের একটা চিরন্তন নৈতিক দাবী আছে; সাধারণকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা অন্যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার কথা উঠে কোন সূত্রে! চোর চুরি করে পেট-পোষণের জন্য; শুনিয়াছি পেটে খেলে পিঠে সয়; কাজেই তাহার পৃষ্ঠ-পোষণ অনাবশ্যক; শুধু অনাবশ্যক নয়, অন্যায়ও বটে, কারণ ইহাতে পেট ও পিঠের মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়।

—

কিন্তু আমরা সাহিত্যিক-চুরির (সাহিত্যিক-চোরের নয়) পরম পৃষ্ঠ-পোষক; তার কারণ, সাহিত্যিক চুরিতে কদাচিৎ পেট-পোষণের কাজ চলে। কাজেই আমরা সমালোচক ও সাধারণের উদ্যত বাহু হইতে সাহিত্যিক-চুরি অপরাধীকে রক্ষা করিব।

—

আমরা যে শুধু সাহিত্যিক চুরি পছন্দ করি তাহা নয়, সাহিত্যিক চুরির একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক (অর্থ ও পরমার্থ) আবশ্যকতা অনুভব করি। বাংলাদেশে যাহাতে সাহিত্যিক চুরি সংক্রামক হইয়া উঠে তাঁহার জন্য আমরা অতঃপর কায়মনোবাক্যে প্রচার আরম্ভ করিব।

—

জনৈক পাঠক জানাইয়াছেন, শ্রীপুষ্পরাণী সিংহ নানক জনৈকা লেখিকা সম্প্রতি এইরূপ একটি চুরি করিয়াছেন। আমরা উহা দেখি নাই, কিন্তু শুনিবামাত্র বিশ্বাস করিয়াছি। তাঁহাকে আমরা ইহার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি। তিনি নব চৌর-কবিদলের অগ্রণী; পুরুষের পক্ষে ইহা গৌরবের, নারীর পক্ষে গর্ব্বের বিষয়। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে নবতর উপায়ে অধিকতর পারদর্শিতার সহিত এই দুরূহ শিল্পে আরো বেশি কৃতিত্ব অর্জ্জন করিবেন।

—

কেবল একটি অনুরোধ আছে। তাঁহার রুচির প্রশংসা করিতে পারিলাম না, হাত এখনো কাঁচা। অখ্যাতনামা কবির সর্ব্বহারা নামক কবিতা চুরি না করিলেই ভাল হইত। সর্ব্বহারার মধ্যে চুরির মত কি থাকিতে পারে? বোধ করি নামটাই (নাম দুই প্রকার সুনাম ও দুর্নাম) তাহার একমাত্র সম্বল ছিল; তাহা চুরি না করিলেই ছিল ভাল।

—

চুরি করিতে হইলে ধনীর গৃহেই সিঁধ দেওয়া উচিত; সে জন্য রবীন্দ্রনাথ আছেন, বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন আছেন; বিদেশী বহু বিখ্যাত লেখক আছেন। ছোট ঘরে কেন?

—

হায় আমাদের রুচির কি অধোগতি! আজকাল তস্করেও ছেঁড়া নেকড়ার বেশি অন্য কোনো পদার্থ চুরি করিতে চাহে না! আধুনিক যুগে মৃত্যুর পক্ষে একটি দু'আনা দামের বন্দুকের গুলি যথেষ্ট! আমরা তো অস্ত্রহ্রাসের ঘোর বিপক্ষে! মরিতে হয়

অজাগর কামানের গোলাতে মরিব, যাহার একটি গোলা-ক্ষেপের ব্যয় বহু সহস্র পাউণ্ড! যদি চুরি করিতে হয় শেকসপীয়র আছেন (তাঁহার কপি-রাইট নাই, আমার মনে হয় কপিরাইট অন্যান্য সম্পত্তির মত বংশগত হওয়া উচিত, কারণ প্রতিভা উত্তরাধিকার স্থত্রে পাওয়া যায় না শেলি-রবীন্দ্রনাথ আছেন। হে ভবিষ্যতের চৌর-কবির দল, তোমরা চুরি করিও, হে সরস্বতীর নব সাধক সম্প্রদায়, নিজেদের কদর্য্য রচনা না ছাপিয়া চুরি করিয়া পরের লেখা ছাপিও, কেবল এই অনুরোধ, যেন সে লেখা পাঠ্য হয়, সুন্দর হয়, তোমাদের সুরুচির পরিচায়ক হয়; এবং পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া চৌর-অমরতা লাভ করিতে পার।

শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২৫।২ মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ সংখ্যা]　　চৈত্র, ১৩৪১　　[৭ম বর্ষ

বর্ষশেষ

(শনিবারের চিঠির নহে)

বাংলা দেশের আর একটি বৎসর শেষ হইল। কিন্তু ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, বৎসর যাওয়া এবং বৎসর আসা পৃথিবীর জন্মাবধি ঘটিতেছে। পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ নিয়মিত ঘুরিয়া চলিতেছে, পৃথিবীবাসী প্রাণীবৃন্দ বংশ হইতে বংশান্তরে পদনিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিতেছে।

কেহ বলেন অগ্রসর হইতেছে তাহার প্রমাণ কি?—হয়ত পিছাইয়া যাওয়াকেই আমরা অগ্রসর হওয়া বলিয়া ভুল করিতেছি।

এরূপ আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রবৃত্তি নাই। বহুকাল ধরিয়া কোনো দিকে নিয়মিত চলাকেই আমরা সম্মুখে চলা বলিব। কেননা ভৌতিক জগতে এক শান্টিং ইঞ্জিন ছাড়া পশ্চাতে চলিতে আর কাহাকেও বড় একটা দেখা যায় না। সুতরাং মোটামুটি

ভাবে বিশ্বজগৎ এবং বাঙালীজাতি অগ্রসর হইয়া চলিতেছে এরূপ ধরিয়া লইতে কাহারো আপত্তি হইবে না।

কিন্তু আমরা চলিতেছি কোথায় এবং কেন? ইহা আমরা কেহ বুঝি না; বুঝিবার কোনো উপায় আছে বলিয়াও মনে হয় না। মনে হয় মানুষের চলার ইতিহাস, ধারাবাহিক ভাবে চলিবার চেষ্টার ইতিহাস। আমরা ইহারই জন্য প্রাণপণ করিতেছি। ভবিষ্যৎ মানুষ এই ধারা বাহিয়া মানব-বংশকে কোনো এক পরিণামে উত্তীর্ণ করিবে; মানবজীবনের সার্থকতা কি, সেই দিন তাহা উপলব্ধি করা যাইবে; কিন্তু তাহা কি, আজিকার দিনে তাহার আভাসও মিলিতেছে না।

যুগের সহিত যুগ গাঁথিয়া, কার্য্যের পূর্ব্বে কারণকে স্থাপন করিয়া, ব্যক্তের সহিত অব্যক্তের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছি। যে সকল যুগ বর্ত্তমান হইতে মধ্যপথে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহাকে বিধিমত কর্ষিত করিয়া, তৎপূর্ব্ব এবং তৎপরবর্ত্তী যুগের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণের অমানুষিক চেষ্টা করিতেছি। (ইহারই নাম প্রাত্নতত্ত্বিক গবেষণা।)

অভিব্যক্তির ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়া যাওয়াই হয়ত সকল যুগের মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। যেখানে যুগধারা যোগভ্রষ্ট হইয়াছে তাহা কোনো মানুষের অবহেলায় ঘটে নাই, প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে ঘটিয়াছে। ধারাবাহিকতার মাঝে মাঝে, অংশবিশেষের চিহ্ন নাই; এই চিহ্ন খুঁজিয়া পাইলে মানুষের তৃপ্তি। না পাইলে যেন অগ্রসর হওয়ায় কোনো সার্থকতা থাকে না। যাঁহারা বলেন অতীতটাকে উড়াইয়া দিয়া আজ হইতে নূতন জীবন আরম্ভ কর, তাঁহারা হয়ত ভুলিয়া যান যে মানুষের স্বধর্ম্ম তাহা নহে। ছিন্নমালা পুনরায় গাঁথিবার জন্য প্রত্নতত্ত্বের গবেষণাই মানব ধর্ম্ম। যেন সমস্ত গ্রন্থিগুলি বাঁধিতে

পারিলেই চলার পথে সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু না পারিলেও তাহাকে চলিতে হইবে, কেননা চলায় তাহার হাত নাই। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে প্রত্যেকটি শিশু, কৈশোর-যৌবন অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধত্বে উপনীত হইতেছে এবং যথাসময়ে ইহলীলা সাঙ্গ করিতেছে। আবির্ভাব এবং তিরোভাব ইহাতে মানুষের হাত কোথায়? সমস্ত প্রাণী-জগৎ এই দুর্ব্বার নিয়মের অধীন। কে আমাদিগকে পরিচালনা করিতেছে (শনিবারের চিঠির পরিচালককেও) জানি না। আমরা চলিবার পথে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছি বটে—"কোথায় চলিতেছি?"—কিন্তু সেজন্য ক্ষণকালের জন্যও চলা থামাইতে পারিতেছি না।

এই চলার পথে এক যুগ আর এক যুগকে এই প্রশ্নটি হস্তান্তর করিয়া যাইতেছে। যত দিন মানুষ থাকিবে তত দিন ঐ প্রশ্ন থাকিবে—শেষ প্রশ্নের সময় আসে নাই—উহা শেষ মানুষের শেষ নিঃশ্বাসের সহিত উচ্চারিত হইবে। তাহার পর আর এ পৃথিবীতে মানুষ থাকিবে না। (শরচ্চন্দ্র ততদিন বাঁচিয়া থাকুন)।

প্রশ্ন হস্তান্তরিত হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে একটি যুগও আর একটি যুগের হাতে গিয়া পড়ে। বৎসরকে বৎসরান্তরে, যুগকে যুগান্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়াই মানুষের প্রথা। বিশ্বমানব একটি বৎসরকে পরবর্ত্তী বৎসরে বহন করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু এক তারিখে নহে। চৈত্রশেষে আমাদের বাঙালীদের এক বর্ষ শেষ হইল, এইবার নববর্ষ আরম্ভ হইবে। কিন্তু ১৩৪১ সাল, বাঙালীর কোন কীর্ত্তি এবং কৃতিত্বে সমৃদ্ধ হইয়াছে? দৃষ্টিপাত করিলে কিছু দেখা যায় না, হাত বাড়াইলে কিছু স্পর্শ করা যায় না। অর্থাৎ কৃতিত্ব বা কীর্ত্তির ভাগে শূন্য—বাঙালী তাহার অপকীর্ত্তিতে বৎসরকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে—সেই বোঝা সে এখন ১৩৪২ সালের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে আসিয়াছে।

ঐতিহাসিক ধারা বজায় রাখিবার পক্ষে ইহা শুধুই একটা "সাময়িক" বিস্তার—তাহার অধিক গৌরব ইহার কিছু নাই। হয়ত এই কুকীর্ত্তির বোঝা বহন করিতে করিতে একদিন আমরা সত্যকার নববর্ষের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিব, কিন্তু আজিকার এই গভীর অন্ধকারে সে শুধুই স্বপ্ন মাত্র।

বাদল রাতে

আজ সারারাত বাদলের ধারা বিশ্রাম নাহি মানে।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝর ঝর ঝর ঝরে গগনের কোটি নির্ঝর,
নিখিল মুখরি' উঠে একস্বর উদাস আকুল তানে।
নিদ্রাবিহীন নিশীথ শয়নে শুনিয়া সে ধ্বনি—কি জানি কেমনে
মন ছুটে যায় ধারাবারিসনে কে জানে সে কোন্ দেশে?
কোন্ বনতলে গহন আঁধারে, সুবিজন পথে কোন্ জলধারে,
কত গিরি মরু প্রান্তর পারে— সে কাহার উদ্দেশে?
যেন মনে হয় ভরা জ্যোৎস্নায় সুধার সাগর জেগেছে কোথায়,—
দুলিছে ফুলিছে—আপন কথায় আপনি উঠিছে মাতি;
যে সুখে সে হ'ল উতলা অধীর সে সুখ বিলাবে বিরস বধির
ধরার ধূলায়—তাই জলধির ঘুম নাই সারারাতি।
যেন সে ডাকিছে দূরে বহুদূরে, কোথা হ'তে কে তা' জানে!
কোন্ সাগরের কল গর্জ্জন আজি পশিতেছে কানে!

অকূল সিন্ধু ডাকেরে আজিকে, উতলা সিন্ধু ডাকে !
ডাকে অবিরাম, ডাকে অনিবার ! ডাকে দ্বারে দ্বারে বন্দীজনার—
নিখিলের প্রতি-সলিলকণার নিদ্রিত আত্মাকে !
তা'রি অশরীরী আহ্বান আসে সিন্ধু সুরভি ছড়ায়ে বাতাসে,
পুলকে উলসি উঠে উল্লাসে নিখিল বসুন্ধরা ।
শুক্লা শশীর আলো করি চুরি গগনে গগনে ঝরে ফুলঝুরি
ধরণীর বুকে প্রাণের মাধুরী কূলে কূলে তাই ভরা ।
তারি ডাক শুনে শ্রাবণের মেঘে যত জল ছিল ছুটে এল বেগে,
বন্যার স্রোতে নদী উঠে জেগে উদ্দাম—তারি ডাকে ।
রুদ্ধ দুয়ারে শুনি কান পেতে দূর গিরিশিরে উঠিয়াছে মেতে
শত নির্ঝর নিভৃত নিশীথে পাষাণ পথের পাকে !
কোনোখানে কেহ রহিবেনা স্থির কেহ রহিবেনা বাকী ।
আজি জয়ভেরী মহাজলধির নিখিলে ফিরিছে ডাকি !

ওরে, গৃহকোণে আপনার মনে কে আছিস্ হেন রাতে ?
আহ্বান আজি উঠিয়াছে বাজি' দেবতার দামামাতে ।
ঊর্দ্ধগগনে নব নব বেশে—কে কোথা ফিরিছ আজি দেশে দেশে ?
কে কোথা ঘুমাও অলস আবেশে কোন্ সরসীর বুকে ?
গিরিকন্দরে শিলাবন্ধনে কে কোথা কাঁদিছ কলক্রন্দনে ?
ভাঙো ভাঙো কারা—জয় বন্দনে জলধির, চলো সুখে ।
কে কোথায় তৃণপল্লবকোলে জলিছে দুলিছে বায়ুহিল্লোলে ;
কনক-কলসে কঙ্কণরোলে কে কোথা ঘুমাও আজি ?
ওগো জাগো,—আর নাই অবসর, ঝরিছে বাদল ঝর ঝর ঝর,
শ্যামল করিয়া মরু প্রান্তর উৎসবে চলো সাজি ।
আজি নিশিরাতে পরাণ বিবশ,—কেমনে বুঝাব হায় !
দেহ হ'তে প্রতি শোণিত কণিকা ছুটে চলে যেতে চায় !

মাইকেল মধুসূদন

গোল দীঘির ধারে, হিন্দু কলেজের সম্মুখে একদিন টিফিনের ছুটিতে দুটি বালক আলাপ করিতেছিল। দুজনের বয়স সমান; একজন গৌরবর্ণ, একজন কালো। গৌরবর্ণ ছেলেটি নীরবে নতমুখে বিষন্নভাবে বসিয়া, আর কালো ছেলেটি তাহার কাঁধে হাত দিয়া দণ্ডায়মান। কালো ছেলেটি বলিল—তুমি নাকি পড়া ছেড়ে দিচ্ছ? গৌর বালকটি উত্তর করিল, জানো তো ভাই কত মাইনে বাকি পড়েছে, বাবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমানুষ, এত টাকা দিতে পারবেন না, কাজেই—

প্রশ্নকারী তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, আমি তো অনেক টাকা পাই, আমার কাছে থেকে তুমি নাও না কেন? টাকা শব্দটি উচ্চারণের সময় বালকের জিহ্বা সরস হইয়া উঠিল, যেন সে মনে মনে টাকা বস্তুটির স্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। আমরা যথা সময়ে দেখিব, বালকের পরবর্ত্তী জীবন এই টাকার কেন্দ্রেই আবর্ত্তিত হইয়াছে, কিংবা তাহার পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-জীবনকে মনে রাখিলে বলিতে ইচ্ছা করে তাহার আধ্যাত্মিক জীবনকে সে বলিদান দিয়াছে—এই টাকার ক্রস্‌-কাষ্ঠে।

এমন সময়ে আর একটি বালক সেখানে আসিল; সে কালো ছেলেটির চুল লক্ষ্য করিয়া বলিল, একি মধু, এ কেমন ধারা চুল ছাঁটা? মধুসূদন যেন আজ সারাদিন এই কথাটি শুনিবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল, সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হাঁ ভাই, এ সাহেবী ধরণে চুল ছাঁটা—এক মোহর লেগেছে। গৌর বর্ণ বালকটি এতক্ষণ তাহার নূতন কেশ বিন্যাস দেখে নাই, এবার দেখিয়া বলিল,-মধু এ তোমার

উপযুক্ত হয় নাই। তুমি জিনিয়াস্; তুমি সাহেবদের বৃথা অনুকরণ না করে' একটা নূতন ধরণে চুল কাটবে, এইতো আমরা আশা করি। মধু ইহাতে মোটেই দমিল না। কোথা হইতে কোন্ জিনিষটি (অবশ্য টাকা সর্ব্বত্র হইতে) লইতে হয় তাহা সে জানিত। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন পায়ের তলার মাটি পাইলে তাহার উপরে সমস্ত শক্তি দিয়া দাঁড়ায়, মধু তেমনি এই ভর্ৎসনার মধ্যে জিনিয়াস্ শব্দটির উপরে আপনাকে স্থাপনা করিয়া সঙ্গীদের অপেক্ষা নিজেকে উচ্চতর মনে করিতে লাগিল। সে নবাগত বালককে লক্ষ্য করিয়া বলিল—গৌরদাস, আমি একজন মহাকবি হ'ব, তুমি আমার জীবনী লিখবে। আমি জানি নিশ্চয়ই মহাকবি হ'ব; তার পরে একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কেবল যদি ইংলণ্ড যেতে পারি। এই বলিয়া সে হাত নাড়িয়া বলিল—I sigh for distant Albion's shore. সে ইতিমধ্যেই ইংরেজি বাচনভঙ্গী যতদূর সম্ভব ইংরেজের মত বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই বালকের পূরা নাম মধুসূদন দত্ত, গৌরবর্ণ বালকটি ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আগন্তুক গৌরদাস বসাক।

মধুসূদনের রং কালো, শুভ্র চাপকান, ইজার পরাতে শাদা কালোর দ্বন্দ্বে তাহাকে কৃষ্ণতর মনে হইতেছিল। রং কালো হইলেও মুখশ্রী দেখিয়া মনে হয় ভিতর হইতে প্রতিভার দ্যুতি ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে, যেন কালোমেঘের তলে চাপা-পড়া সূর্য্য। চুল ঈষৎ কুঞ্চিত, মাঝখানে সরল সিঁথি। বড় বড় ভাসা ভাসা উদার অচঞ্চল চোখ দুটি যেন অত্যন্ত বিশ্বাসের সহিত নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহাতে সন্দেহের ছায়া মাত্র নাই। সবসুদ্ধ মিলিয়া তাহার রং, স্বাভাবিক কালো ও পোষাকের শাদা, বড়ই স্নিগ্ধ এবং তরল; সম্মুখের ওই দীঘির কালো জল শরতের শাদা মেঘের ছায়াপাতে যেমন স্নিগ্ধ এবং তরল।

মধুসূদন বালককাল হইতেই উদার এবং স্নব; স্নব-এর প্রতিশব্দ বোধকরি বাংলায় নাই, কারণ দেশে এতই আছে।

* * *

"আমি অবশ্যই মহাকবি হইতে পারি, আঃ কেবল যদি একবার বিলাত যাওয়া সম্ভব হয়।" মধু বিলাত গমনের সরল পথ আবিষ্কার করিলেন, গির্জ্জার মধ্য দিয়া। তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুয্যের নিকটে যাতায়াত সুরু করিলেন। মধু একসঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম ও বিলাত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, বাঁড়ুয্যে মহাশয় নিজে ভূতপূর্ব্ব হিন্দু, কাজেই অভূতপূর্ব্ব খৃষ্টানের মনস্তত্ত্ব বুঝিয়া পেকস্নিফের (Pecksniff) মত ঘরের কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সাংসারিক উন্নতির উপায়কে তিনি একসঙ্গে জড়াইতে রাজি নহেন। মধু কি উত্তর দিয়াছিলেন লিখিত নাই, কিন্তু বলিতে পারিতেন, সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দিবার আজ্ঞা তো স্বয়ং খৃষ্টের। বাঁড়ুয্যে মহাশয় ধর্ম্ম ও অর্থকে একত্র করেন না (অবশ্য নিজের কথা স্বতন্ত্র) কিন্তু ধর্ম্মের বিকল্পে যে কারাদণ্ড তাহা বেশ জানেন। একবার একটি দরিদ্র হিন্দুবালক তাঁহার নিকটে ভিক্ষার জন্য গিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, ভিক্ষা কর কেন, খৃষ্টান হও, সুবিধা হইবে, নতুবা তোমাকে জেলে পাঠাইব। বাঁড়ুয্যে মহাশয় পণ্টিয়াস্ পাইলেট না পেকস্নিফ? বোধ করি শেষোক্ত ব্যক্তির সঙ্গেই তাহার মিল বেশি, কেবল নৈতিক দাড়িটি ব্যতীত।

কয়েকদিন পরে মধুসূদন বাড়ী হইতে উধাও হইলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল পাদ্রীরা তাঁহাকে কেল্লায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, পাছে আলোক-আসন্ন বালকের মনকে আবার অন্ধকার আক্রমণ করে। খৃষ্টধর্ম্মের দীনতার পক্ষে দুর্গের দুর্গমত্ব আবশ্যক, যেমন আবশ্যক কচি লতার রক্ষার পক্ষে বেড়ার আবেষ্টন। নৈতিক শক্তিও শক্তি কিন্তু তাহার

সহিত কামান জুড়িয়া দিলে তাহা একেবারে অব্যর্থ। প্রেম প্রচারের জন্যই বারুদের সৃষ্টি।

গৌরদাস মধুসূদনের সহিত কেল্লায় দেখা করিতে গেলেন। মধু নবধর্ম্মের বিষয় অনেক আলোচনা করিলেন, কুসংস্কারের ক্রোড় হইতে কেমন করিয়া হঠাৎ তাঁহার কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাহাও বলিলেন, কিন্তু মূঢ় গৌরদাস আলোকের চিহ্নমাত্র মধুসূদনের কোনো-খানে দেখিতে পাইলেন না, না তাঁহার মুখে, না তাঁহার ভবিষ্যতে!

তারপরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি মধুসূদনের দীক্ষা হইল। দীক্ষাস্থলে আর্চ-ডীকন ডিলট্রি উপস্থিত, শুষ্কনাসা ও অস্থিবহুল মুখমণ্ডল লইয়া; কড়িকাঠে নিবদ্ধদৃষ্টি পেকস্নিফ বাঁড়ুয্যে মহাশয় উপস্থিত; আর দুই চারজন সহৃদয় ইংরেজ সপরিবারে উপস্থিত। মধুসূদন সগর্ব্বে দণ্ডায়মান সকলের মনোযোগের কেন্দ্রে ও নূতন পোষাকের পারিপাট্যে।

মধুসূদনের স্বলিখিত সঙ্গীত আরম্ভ হইল।

Long sunk in superstition's night,
By sin and Satan driven,—

* * *

I hasten'd to Eternity
O'er Error's dreadful sea!

মধু উপস্থিত ব্যক্তিদের উপরে তাঁহার গানের প্রভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; আন্তরিকতা অপেক্ষা অন্ত্যানুপ্রাসের প্রতি তাঁহার বেশি দৃষ্টি। এ দীক্ষা-সঙ্গীতের অর্থ সম্বন্ধে আর যাহার মনেই দ্বিধা থাকুক, বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের ছিল না! তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন—I hasten'd to Eternity, O'er Error's dreadful seaটা নিরেট রূপক;

Eternity অর্থ ইংলণ্ড, আর dreadful sea টা আধিভৌতিক সমুদ্র, তবে সেটা বঙ্গোপসাগর না ঝঞ্ঝাসঙ্কুল বিস্কে-উপসাগর! এই সঙ্গীতের তালে তালে অদূর ভবিতব্যের অশ্রুত কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে।" বাঁড়ুয্যে কড়িকাঠের অভিধান অনুসন্ধান করিয়া তাহা ভাবিতে লাগিলেন।

মধুসূদন খৃষ্টান হইলেন কেন? বিলাত যাইবার জন্য—অসম্ভব নয়; অবাঞ্ছনীয় বিবাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য খুব সম্ভব। কিন্তু আরো একটা কারণ আছে, মনে হয়। জাহাজ দেখিলে যাঁর ইংলণ্ডের কথা মনে হইত, সমুদ্র যাঁর কানে ইংলণ্ডের বাণী বলিত, যাঁহার শ্রেষ্ঠ কবির আদর্শ মিল্টন; বায়রনের জীবনী পড়িয়া যাঁহার মনে হয় বড় কবি হইবেন, ইংলণ্ড যাইতে পারিলেই যাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়, তিনি যে মিল্টন-বায়রন-ইংলণ্ডের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খানিকটা পরিমাণে তাঁহাদের সহিত একাত্মকতা অনুভব করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কবির মনে অজ্ঞাতসারে ইহা ছিল না কে বলিতে পারে।

বিশপস্ কলেজের নিকটে গঙ্গার তীরে একটি যুবক। যুবকের পরিধানে নূতনতম ফ্যাশানের সাহেবী পোষাক। যুবক নিঃসঙ্গ, নীরব। একখানি জাহাজ সমুদ্রের দিকে যাইতেছে—যুবকের লক্ষ্য সেই দিকে। সে ভাবিতেছে, এ জাহাজ যায় কোথায়? বোধ করি সেই ইংলণ্ডে! ডেকের উপরে সাহেব, মেম পদচারণা করিতেছে; যুবক ভাবিতেছে, ইহারা কত সুখী! সে জাহাজের নাম পড়িতে চেষ্টা করিল, Cand পর্য্যন্ত চোখে পড়িল, আসন্ন অন্ধকারে বাকি অক্ষর পড়া গেল না। যুবক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—"আঃ আমি যদি ইংলণ্ড যাইতে পারিতাম।" যুবকের নাম মাইকেল এম্, এস্, ডাট্, এস্কোয়ার। বিশপস্ কলেজের ছাত্র।

মধুসূদন দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, জাহাজ গঙ্গার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল; নদীর পরপার অস্পষ্ট হইয়া আসিল। তিনি খৃষ্টান হইয়া বিলাতের পথে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন? জর্ডান ও টেম্‌স যেখানে ছিল সেখানেই আছে, তিনি কেবল মাত্র গঙ্গাপার হইয়াছেন। বিলাত নিকটে আসিল না, ভারতবর্ষ বহু দূরে গিয়া পড়িল; ইংরেজ নিকটে আসিল না, হিন্দুরা বহুদূরে গিয়া পড়িল; আত্মীয় স্বজন দূরে গেল, পাদ্রীরা নিকটে আসিল না। মাঝে মাঝে পেকস্নিফ বাঁড়ুয্যে মহাশয় আসেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বাইবেল ও কড়িকাঠের মধ্যে নিঃশেষে বিভক্ত, অন্য দিকে তাঁহার মন দিবার অবকাশ থাকে না। কাজেই মধুসূদন এখন হিন্দু পিতার অর্থে বিশপ্‌স্‌ কলেজের ছাত্র হইয়া খৃষ্টানধর্ম্ম ও ঋণের চর্চ্চা করিতেছেন।

মধুসূদন নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। মনটা ভাল ছিল না। কলেজে একটা গণ্ডগোল চলিতেছিল। দেশীয় খৃষ্টানদের পরিধেয় পোষাক অকৃত্রিম খৃষ্টানদের পোষাক হইতে ভিন্ন। তিনি এই কুসংস্কারের প্রতিবাদকল্পে বৈদেশিকদের পোষাক পরিধান করাতে একটা উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি ঘরের জানলা খুলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইলেন। শানাইএর সুরে পূরবীর রেশ। খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের বাঁশী। সে দেশীয় খৃষ্টান দেখিয়া অত্যন্ত উপেক্ষার স্বরে বলিল—কিছু না সাহেব, হিঁদুদের দুর্গাপূজার বিসর্জ্জনের বাজনা। অকৃত্রিম বিদেশী পোষাকপরা কৃত্রিম হিন্দু-হৃদয়ের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই বাঁশীর করুণ আলাপ শুনিলেন। এক কানে শানাইএর সুর অন্য কানে ব্যঙ্গ কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল—

I've broken Affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake !

মধুসূদনের ইচ্ছা সেই গান আর একটু শোনেন, কিন্তু মাইকেল সশব্দে জানলা বন্ধ করিয়া একটানে বাইবেল খুলিয়া বসিলেন—বাইবেলের পাতার ফাঁক হইতে কোলের উপর খুলিয়া পড়িয়া গেল—একখানা মোটা অঙ্কের বিল, অপরিশোধিত।

সেদিন আহারের সময়ে এক গোলযোগ ঘটিল। মধুসূদন মদ্য চাহিলেন কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে দিয়া মদ ফুরাইয়া গিয়াছে। মধু বলিলেন, মদ চাই-ই ; ভাণ্ডারী বলিল, মদ নাই-ই। তখন তিনি ক্রোধে গেলাস প্লেট আছড়াইয়া ভাঙিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েকবার পদচারণা করিয়া পুস্তকের আলমারির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বায়রনের গ্রন্থাবলী টানিয়া লইতে গিয়া দেখেন, সে স্থান শূন্য। বইখানা কয়েকদিন হইল অন্যত্র গিয়াছে—পুরাতন পুস্তকের দোকানে। বিরক্ত হইয়া জানালা খুলিয়া দিলেন—কানে আসিল সেই শব্দ, দশমীর চাঁদের আলোয় বিসর্জ্জনের বাদ্য। চাঁদের আলো তির্য্যক ভাবে আসিয়া পড়িল টেবিলের উপরে, শূন্য বোতলের উপরে—শূন্য মদের বোতল। মধুসূদন দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত উঠিয়া পুনরায় পদচারণা করিতে লাগিলেন। বিসর্জ্জনের বাদ্য ও শূন্য মদের বোতল।

কলিকাতার একটি অট্টালিকার কক্ষে বসিয়া গৌরদাস বাবু একখানা চিঠি পড়িতেছিলেন। খামখানা পিয়নের করলাঞ্ছিত, অনেক দূরের পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। চিঠিতে এই জাতীয় ভাব ছিল :

আমার ক্যাপটিব লেডি প্রকাশে মাদ্রাজের সাহিত্য জগতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। যোগ্য সমালোচকেরা বলিতেছেন, ইহাতে এমন সব অংশ আছে, যাহা স্কট বায়রনের পক্ষেও গৌরবের হইত। গৌরদাস

হাসিলেন। মধু ঠিক তেমনি আছে। আবার পত্র, 'প্রশংসা যত আসিয়াছে, টাকা তত নয়।' গৌরদাসের বিস্ময়ের কারণ নাই। 'ক্যাপটিব লেডির মুদ্রাঙ্কণে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন, বারিষ্টার, অধ্যাপক, সম্পাদক এবং ছাপাখানার মালিক।' গৌরদাস বুঝিলেন শেষোক্তের উদ্দেশ্য কি! পত্র বলে, "দেখো শীঘ্রই আমার একখানা বই ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইবে।" গৌরদাস ভাবেন মধু এখনো বিলাত যাইবার আশা ছাড়েন নাই। আবার পড়িতে লাগিলেন—'দেখ, আমার একটি কন্যা জন্মিয়াছে, কি ভাবে বাংলায় এ সংবাদ পিতাকে লিখিতে হয় জানি না, কারণ বাংলা ভুলিয়া গিয়াছি।' গৌরদাস কল্পনায় যেন মধুর সগর্ব্ব হাসি দেখিতে পাইলেন। পত্র বলিতেছে—'একজন পুরাদস্তুর সাহিত্যিক হওয়ার পক্ষে মাসিক কয়েকশত টাকার একটি চাকুরি আবশ্যক। আমি শীঘ্রই একখানা মহাকাব্য লিখিব।' গৌরদাসের বিদ্রূপ করিবার মত মনের অবস্থা হইলে ভাবিতে পারিতেন, খণ্ডকাব্য লিখিতে যাহার মাসিক কয়েক শ' দরকার, মহাকাব্যে তাহার দরকার নিশ্চয় কয়েক হাজার! পত্রের শেষে ছিল মধুর মর্ম্মকথা—'পুস্তক বিক্রয়ের টাকা পাঠাইয়ো—ছাপাখানার দৈত্য দানবের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।'

মাদ্রাজের একটি কক্ষে মধুসূদন গৌরদাসের প্রেরিত পত্র ও সংবাদ পত্রের খণ্ড পাঠ করিতেছিলেন। হরকরা ক্যপটিব লেডির তীব্র সমালোচনা করিয়াছে। মধু ভাবিতেছিলেন—প্রশংসা কেউ স্বেচ্ছায় দেয় না, আচ্ছা আমি জোর করিয়া আদায় করিব। জনসাধারণের মতামত সাহিত্য বিষয়ে গ্রাহ্য নয়। কেবল যদি একটু সময় পাই—কন্তু ছাপাখানার তাগাদা!

গৌরদাসের পত্রের মধ্যে বেথুন সাহেবের উপদেশ! বাংলায়

লিখিতে হইবে! ইহা তো হরকরার গালিগালাজ নয় যে মধুসূদনের জেদ উপস্থিত হইবে! আচ্ছা গৌরদাসকে রামায়ণ, মহাভারত, পাঠাইতে লেখা যাক্! কিন্তু অবশেষে বাংলার মহাকাব্য······দরজায় পুনরায় আঘাত। ক্যাপটিব লেডির প্রশংসা, না বিল! মধুসূদন বাংলাদেশ হইতে আটশত মাইল দূরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন আবার কি ফিরিয়া যাইতে হইবে বাংলাদেশে ও বাংলা ভাষায়। এক হিসাবে তো ইংলণ্ডের কাছে আসিয়াছেন—সমুদ্রতীরে। মধুসূদন বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—

মহাকাব্য কতদূর!
ইংলণ্ড কতদূর!

———

আহারে বর্ব্বরতা

রন্ধনৈপুণ্য ও আস্বাদ-জ্ঞানের জন্য বাঙালীর একটা গর্ব্ব আছে। আমরা আদিম যুগের মানুষের মত অপক্ক ও অসিদ্ধ খাই না এবং বর্ত্তমান যুগের বহু অসভ্যজাতি অপেক্ষা রন্ধন-কলায় আমরা পারদর্শী একথা আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি। মুখ্যতঃ লজ্জানিবারণই বস্ত্র-ব্যবহারের উদ্দেশ্য হইলেও বয়নশিল্প যেমন নানাদিকে নানা প্রকারে উন্নতিলাভ করিয়াছে, সেইরূপ ক্ষুন্নিবৃত্তিই আহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও নানা দেশে নানা প্রকারে রন্ধনকলা উন্নতিলাভ করিয়াছে। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এবিষয়েও জাতিগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনরূপে রন্ধন-কলার উৎকর্ষ সাধনের মূল্য আছে। কিন্তু বস্ত্র যখন

লজ্জা নিবারণ না করিয়া বরং অধিকতর লজ্জা দেয় তখন শুধু বয়ন-কলার দোহাই দিয়া তাহার সমর্থন করা যায় না; তেমনি রন্ধন ও আহার যদি শরীর পুষ্ট না করিয়া রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে তাহা হইলে শুধু রন্ধননৈপুণ্যের প্রশংসা দ্বারা সে ক্ষতির পূরণ হইবে না। আমরা শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু রসনা-পরিতৃপ্তির জন্য অত্যধিক তৈল, ঘৃত, লঙ্কা ও অন্যান্য মসলা ব্যবহার করিয়া খাদ্যদ্রব্যকে কিরূপ দুষ্পাচ্য ও অপকারী করিয়া তুলি তাহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সমাজের অন্যান্য ত্রুটির ন্যায় এই ত্রুটিও আমাদের এমন মজ্জাগত ও সংস্কারগত হইয়া পড়িয়াছে যে ইহা সংশোধনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা আমাদের নাই। রন্ধন-নৈপুণ্য ব্যতীত আরো দুইটি বিষয়ে আমরা অতিশয় অসাবধানতার পরিচয় দিয়া থাকি। প্রথমতঃ আহারের যে নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আমরা উদাসীন। দ্বিতীয়তঃ আহারের পরিমাণ সম্বন্ধেও আমাদের কোন সংযম নাই। এই দোষগুলি শুধু ব্যক্তিগত নয়, আমাদের জাতিগত। এই দুইটি অভ্যাস সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য।

অফিসের কেরানী, হাইকোর্টের জজ, পাটের দালাল, গ্রামের চাষী, মোটর-চালক, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি সকলেই যে ঠিক এক সময়ে আহার করিতে পারে ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আমি, খোকা, খুকী, গৃহিণী, মা, পিসিমা, ঠাকুমা, কাকা, মেসোমশাই সকলেই এক সময়ে খাইব, এই প্রস্তাব করিলে আমাকে সকলে পাগল বলিবে। সমাজের ও দেশের নানাপ্রকার ব্যবস্থার জন্য হয়ত এখন এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু প্রত্যেকের পক্ষে নিজের আহারের

এক একটি সময় স্থির করিয়া লইয়া তদনুসারে চলা মোটেই অসম্ভব নয়। অথচ যাহার যখন খুসী এবং যখন সুবিধা তখন আহার করিব, ইহাই আমাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। সময়মত আহার করাটাও যেন জেলের কয়েদীর নিয়ম-পালনের ন্যায় বিরক্তিকর। যাহার অফিসের সময় রক্ষার জন্য প্রত্যহ দশটায় আহার করিতে হয়, তিনিও রবিবারে বা ছুটি পাইলেই এগারটা বারটা একটা বা দুইটা (বা তৎপরেও) যখন খুসী খাইবেন। অসময়ে খাওয়াটাই ছুটির দিন উপভোগ করিবার যেন একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ।

সংসারের ব্যবস্থাও অনুরূপ। যে বাড়ীতে দশ জন লোক, সে বাড়ীতে প্রথমে ছোট ছেলেপুলে, তৎপরে স্কুল কলেজের যাত্রী, তৎপরে হয়ত উকিলবাবু, তৎপরে মেয়েরা, তৎপরে গৃহিণী, তৎপরে বিধবা মা বা পিসিমা, তৎপরে ঠাকুর চাকর—ক্রমান্বয়ে আহার করিতে বসিবেন। ফলে নয়টা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত শুধু মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেই অতিবাহিত হইয়া যায়।

রাত্রি একটার গাড়ীতে কোন আত্মীয় আসিলেন। তখন আহারের সময় নয়। আহার যদি নিতান্ত করিতেই হয়, তবে অল্প লঘু আহারই যথেষ্ট। কিন্তু গৃহস্থ তখনই অন্ততঃ তিন চারি ভাগে রন্ধন করিয়া তাঁহাকে না খাওয়াইলে তাঁহার আতিথেয়তার ত্রুটি হইবে। হয়ত সেই অসময়ে আহারের ফলে আগন্তুক অসুস্থ হইয়াও পড়িতে পারেন। তাহাতেও ক্ষতি নাই।

বাড়ীতে রন্ধন শেষ হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে কোন আত্মীয় একটা বড় মাছ পাঠাইয়া দিলেন। সুতরাং টাট্‌কা মাছের কালিয়ার লোভ সংবরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ফলে বাড়ীসুদ্ধ লোকের আহারের সময় দুই ঘণ্টা পিছাইয়া গেল।

কলিকাতা ব্যতীত অন্য কোথায়ও নিমন্ত্রিতদিগের আহারের সময় বলিয়া কিছু নাই। শ্রাদ্ধাদির আহার দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে হইতে পারে। বিবাহোপলক্ষে আহার রাত্রি আটটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে হইতে পারে। এজন্য নিমন্ত্রিতদিগকে পূর্ব্ব হইতে কোন সঠিক সংবাদ দেওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং রীতি নাই।

বাড়ী হইতে একবার বাহির হইলে আহারের সময় সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। ট্রেনে, ষ্টীমারে, নৌকায় ত সময় বলিয়া একটা কিছুর অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় না। যখন ইচ্ছা খাইলেই হইল। কোন হোটেলে থাকিলে, সেখানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে—আহার পাইবার পক্ষে কোন অসুবিধা না থাকিলেও আমরা অসময়ে আহার করাটাই বেশি অনুমোদন করি। দার্জ্জিলিং-এ একটি ভাল হোটেলে অনেক বাঙালী থাকিতে চান না, তার কারণ সেখানে সময়মত খাইতে হয়। এরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না।

এই তো গেল আহারের সময়ানুবর্ত্তিতার অভাবের কথা। আহারের পরিমাণ সম্বন্ধেও আমাদের যে জাতিগত সংস্কার রহিয়াছে, তাহাও সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক কি না সে বিষয়ে সন্দেহের হেতু আছে। অধিক আহার করা এবং অধিক আহার করিবার শক্তি থাকা আমাদের কাছে—অতিশয় প্রশংসার বিষয় ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। যাহারা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না অথবা দিনে একবার বা দুইবারের অধিক শুধু ডাল ভাত বা তৎসহ একটা তরকারীর বেশি যাহাদের সংস্থান নাই, তাহারা পরিমাণে বেশি খাইবেই। আমাদের দেশের অধিকাংশ দরিদ্র পল্লীবাসীর এই অবস্থা। কিন্তু যাঁহারা পুষ্টিকর খাদ্য আহার করেন

এবং দিনে চারিবার বা পাঁচবার আহার করিবার সুযোগ পান, তাঁহারাও অধিক পরিমাণ আহারটাকে অতিশয় প্রশংসার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। আমাদের হিতের জন্যই বিধাতা আমাদের পাকস্থলীটাকে কঠিন না করিয়া অতি কোমল স্থিতিস্থাপক পদার্থে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহা না বুঝিয়া সেটাকে খাদ্যদ্বারা যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করিয়া উহাকে দুর্ব্বল ও রুগ্ন করিয়া ফেলি। এই যে বেশি খাওয়ার অভ্যাস ও ইচ্ছা ইহা শুধু রসনাতৃপ্তিজনিত ব্যক্তিগত দোষ নহে। ইহার পশ্চাতে আমাদের জাতির একটি মজ্জাগত সংস্কার বর্ত্তমান। বল, বুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় অধিক আহার করিবার শক্তিও (অর্থাৎ চাউলপূর্ণ বস্তার ন্যায় পাকস্থলীর পূর্ত্তি) আমাদের নিকট অতিশয় প্রশংসা ও গৌরবের বিষয়।

আমার পরিচিত এক ব্যক্তির একবার খুব জ্বর হয়। জ্বর ছাড়িয়া গেলে ডাক্তার একেবারেই ভাত ব্যবস্থা না করিয়া রোগীকে রুটি খাইতে বলেন। পরদিন আসিয়া শুনিলেন রোগী ছত্রিশখানা সাধারণ আকারের আটার রুটি পথ্য করিয়াছেন! ডাক্তারবাবু তাঁহাকে ঐরূপ লঘু পথ্যের পরিবর্ত্তে ভাত খাওয়াই বেশি উপকারী বলিয়া গেলেন।

যাঁহাদের সহিত স্নেহের সম্পর্ক, তাঁহারা বেশি করিয়া খাওয়াইয়া এরূপ তৃপ্তিলাভ করেন, যে অনেক সময়ে শুধু তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই আমাদিগকে অতিভোজন করিতে হয়। আহার্য্যের তালিকা না দিয়া, অথবা গোপন করিয়া, একটার পর একটা করিয়া আহার্য্য আনিয়া অনুরোধ উপরোধ করিয়া খাওয়ান শুধু যে স্নেহের নিদর্শন, তাহা নহে, এরূপ না করিলে নিতান্ত অসামাজিক ও অভদ্র বলিয়া পরিচিত হইতে হয়। নানারূপ সুখাদ্য আদরের সহিত খাওয়ান—ইহাতে দূষণীয়

কিছুই থাকিতে পারে না, কিন্তু পরিমাণজ্ঞানশূন্য হইয়া স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল পাকস্থলীর সম্প্রসারণ কখনই সুরুচি ও সভ্যতার অনুমোদিত হইতে পারে না।

এক ধনী ব্যক্তি ব্রাহ্মণভোজন করাইতেছিলেন। আকণ্ঠ ভোজনের পর সকলেই যখন আসনত্যাগ করিবেন, তখন তিনি বলিলেন যে যিনি এখন পাঁচটি মিষ্টান্ন ভোজন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে তিনি পাঁচটাকা পুরস্কার দিবেন। দেখা গেল দশজনের বেশি পুরস্কার প্রার্থী হইলেন না। ইহার পর ধনী পুনরায় ঘোষণা করিলেন, এই দশজনের মধ্যে যিনি আরো পাঁচটি মিষ্টান্ন ভোজন করিতে পারিবেন, তিনি দশটাকা পুরস্কার পাইবেন। এই পুরস্কার পাঁচজনে পাইলেন। পুনরায় ঘোষিত হইল এই পাঁচজনের মধ্যে যিনি আরো পাঁচটি মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে পারিবেন, তিনি পাঁচটাকা পুরস্কার পাইবেন। মাত্র একজন এই পুরস্কার লাভ করিয়া শেষ মিষ্টান্নটি কণ্ঠাগ্রে করিয়া ভোজন-সভা ত্যাগ করিলেন। এই গল্পটি নিতান্তই গল্প নহে। কারণ অনেক ছাত্রাবাসে যে ভোজন-প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে, কার্য্যত তাহা উক্ত গল্পেরই অনুরূপ। বন্ধুগণ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া ক্রমাগত ভাত, ডাল বা মিষ্টান্নদ্বারা পাকস্থলী-পূরণ করিয়া আনন্দলাভ করা এবং পানোন্মত্ত অবস্থায় পৃষ্ঠদেশে লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করিয়া চড়কগাছে পাক খাওয়ার আনন্দের মধ্যে মনোবৃত্তি-গত পার্থক্য বেশী নহে।

আমার পরিচিত এক মহাশয়-ব্যক্তি ছাত্রজীবনে খেজুরের রস ভালবাসিতেন। আকণ্ঠ পান করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইত না। সেইজন্য তিনি একবার আকণ্ঠ পান করিয়া সেটুকু বমন করিয়া ফেলিয়া দিয়া পুনরায় পান করিতেন। এইরূপে ক্রমাগত এক বা দুই কলসী পরিমিত রস পান না করা পর্য্যন্ত তিনি বিরত হইতেন না।

অত্যধিক আহার যে আমাদের নিকট কত প্রশংসনীয় তাহা স্বাস্থ্যবান্ বা দীর্ঘজীবী বৃদ্ধদের বাক্য হইতে প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা প্রায়ই বলেন, আমি বয়সের কালে একটা আস্ত পাঁঠা খাইতে পারিতাম, আমি একবার নিমন্ত্রণে পূর্ণ আহারের পরেও পঞ্চাশটা সন্দেশ খাইয়াছিলাম, আমি পাঁচটা ইলিশ মাছ একা খাইতে পারিতাম, আমি এক সময়ে আহার শেষ হইবার পর দুই হাঁড়ি দধি খাইয়াছি, আমি তিরিশটা বোম্বাই আম বৈকালে খাইয়া পুনরায় রাত্রিতে যথারীতি আহার করিয়াছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ আহার করিয়াও হয়ত অন্যান্য নানা কারণে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অসম্ভব হয় নাই, কিন্তু এইরূপ দুরন্ত লোভ ও স্বেচ্ছাচারের ফলে কত শত ব্যক্তি চিরজীবনের জন্য হজম-শক্তি হারাইয়া ও নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া জীবন্মৃত হইয়া আছেন, অথবা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহার সংবাদ রাখা আমরা প্রয়োজন মনে করি না।

আধমণি কৈলাসের কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি। তাঁহার নাকি আধমণ পর্য্যন্ত ভোজনদ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। পূর্ণ আধমণ না হইলেও তাঁহার যে অসাধারণ ভোজন-শক্তি ছিল এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শক্তিটিকে ব্যাধি না বলিয়া এই শক্তির অধিকারীকে প্রশংসা ও খ্যাতির দ্বারা পুরস্কৃত করিবার মনোবৃত্তি আমাদের জাতির মজ্জাগত। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে আমরা আহারের প্রশংসা করি না; যে স্বাস্থ্য থাকিলে অধিক আহারের ক্ষমতা থাকে, আহার উপলক্ষ্য করিয়া আমরা সেই স্বাস্থ্যকে এবং সেই স্বাস্থ্যের অধিকারীকেই প্রশংসা করিয়া থাকি সুতরাং আমাদের আহারের পরিমাণের প্রশংসার পশ্চাতে নিগূঢ়ভাবে

বল ও স্বাস্থ্যের প্রশংসাই নিহিত, কিন্তু একথা সত্য নহে। যাঁহারা অত্যধিক আহার করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই রুগ্ন না হইলেও এরূপ বলবান্ বা স্বাস্থ্যবান্ নহেন, যাহাতে দেখিলেই তাঁহাদের স্বাস্থ্য প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হইবে। উপরোক্ত আধমণি কৈলাস বিশেষ বলবান্ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন না। যে সকল বলশালী ব্যক্তি নিজের বল ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অধিক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করেন তাঁহাদের প্রশংসা ও খ্যাতি এবং আধমণি কৈলাসের খ্যাতি এক কারণে নহে। কয়েকদিন পূর্ব্বে এক বাড়ীতে বৈকালিক জলযোগের জন্য আহূত হইয়াছিলাম। সেখানে এক বন্ধু আঙুর, আপেল, খেজুর, আম প্রভৃতি ফল, সন্দেশ, রসগোল্লা, রাবড়ী প্রভৃতি মিষ্টান্ন, তাহার উপর দধি প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্য যাহা খাইলেন, তাহা যে-কোন বলবান্ ও স্বাস্থ্যবান্ লোকের প্রায় সমস্ত দিনের পক্ষে যথেষ্ট। অথচ তিনি ভোজনান্তে বলিলেন, আজ রাত্রে গুরুভোজন করিব না, চারিটা মাছের ঝোল ভাত অবশ্য খাইতেই হইবে! ইনি রুগ্ন না হইলেও তেমন বলবান্ নহেন। এবং তাঁহার এই অতি-ভোজন বল ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নহে—শুধু অভ্যাস বশতঃ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বেশি খাওয়া এবং বেশি খাওয়ান যে আমাদের নিকট অতিশয় তৃপ্তিকর, তাহা প্রচলিত অনেক রীতি এবং ছড়া ও গল্পেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোথায়ও নিমন্ত্রণ হইলে আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত ধরিয়া লই যে সেখানে অতিভোজন হইবে। সেইজন্য কেহ কেহ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকেন। কেহ নিমন্ত্রণের সময়ের পূর্ব্বে এক বেলা আহারই করেন না, কেহ কোন পাচক ঔষধ খান, কেহ নিমন্ত্রণের পর বাড়ী ফিরিয়া বমন করিয়াও ফেলেন; তবু নিমন্ত্রণ-রক্ষা করা চাই। স্নেহ-সম্পর্কিত নারীগণের "এটা খাও, ওটা খাও, আমার মাথা খাও"

ইত্যাদি অনুরোধ অতি-পরিচিত। এরূপ না করিলে তাঁহাদের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। স্নেহ-প্রকাশের অন্যান্য অসংখ্য পন্থা আছে, এ পন্থাটা বর্জ্জন করিলে যে অসামাজিক হইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। সুপক্ক, সুস্বাদু নানাবিধ আহার্য্য সম্মুখে আনিয়া দিয়া যাহার যেরূপ রুচি, ক্ষুধা ও শক্তি, তদনুসারে আহার্য্য তুলিয়া লইবার ভার যে খাইতেছে তাহার উপরই ন্যস্ত করা কর্ত্তব্য। আমরা কখন কখন বলি বটে "আপ্-রুচি খানা", কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করি কি?

খাইতে বসিয়া পাকস্থলী সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কোমরের কাপড়ের 'এক ঢিল, দুই ঢিল' ইত্যাদি দিবার রীতি হাস্যকর হইলেও অতিশয় সুপ্রচলিত। খাইবার পর আসন ত্যাগ করিবার সময় উত্থান শক্তির অপ্রতুলতা কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ব্যক্তিদের নিকট দৈনন্দিন ব্যাপার। এ সমস্তই অতি-ভোজনপ্রিয়তার নিদর্শন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে যথাসাধ্য আকণ্ঠ ভোজন করাইবার জন্য পরিবেশককে যে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে—

"হাঁ হাঁ দত্ত্বাৎ হুঁ হুঁ দত্ত্বাৎ দত্ত্বাচ্চ করকম্পনে।
শিরসঞ্চালনে দত্ত্বান্নদত্ত্বাদ্ ব্যাঘ্রঝম্পনে॥"

তাহা একেবারেই অতিরঞ্জিত নহে। কোন কোন স্থলে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু সে ব্যতিক্রম নিমন্ত্রিতদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে নহে, অন্য কারণে।

অত্যধিক আহার করিয়া, আকণ্ঠ উদর পূর্ণ করিয়াও অনেক সময়ে আমাদের আহারের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। এই সম্বন্ধে একটি সুপ্রচলিত গল্প বলিয়াই এই প্রসঙ্গের শেষ করিব। এক শ্রাদ্ধ বাড়ীতে কয়েকজন

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে স্থানাভাব বশতঃ পৃথকৃভাবে বহির্বাটিতে আসন দেওয়া হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে একজন ইহাতে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন, কারণ তাঁহার ধারণা জন্মিল যে যাঁহারা ভিতরবাটীতে বসিয়াছেন, তাহারা নিশ্চয়ই ইঁহাদের অপেক্ষা বেশি যত্ন পাইবেন। সেইজন্য তিনি আহারের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিষই চাহিয়া লইয়া খাইলেন, যাহাতে কিছুতেই যেন ভিতরবাটীর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা কোন বিষয়ে তাঁহার কম না থাকে। এইরূপে ক্রমাগত নানা আহার্য্যে উদরপূর্ণ করিয়া শেষ মিষ্টান্নটি কণ্ঠাগ্রে করিয়া উৰ্দ্ধমুখে বাহিরে আসিতেই একটি শায়িত গাভীতে পদস্পর্শ হইল। মুখ নীচু করিবার উপায় নাই, সুতরাং হাত দিয়া গাভীর উদরদেশ অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কে হে বাপু, খেয়ে এসেই শুয়ে পড়েছ, তুমি বুঝি ভিতর-বাড়ীতে বসেছিলে!'

পেটুক ও লোভী সব দেশে সব সমাজেই আছে এবং থাকিবে। দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই জ্ঞানী ও সংযমী হইবে ইহাও কেহ আশা করে না। কিন্তু দেশের আপামর সাধারণ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই একটি কুপ্রথা ও কদভ্যাসের দাস হইয়া থাকিবে, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

"এতখানি বাড়াবাড়ি মোটে ভাল নয়,"
পুষ্পিতা লতারে হেরি, অপুষ্পিতা কয়!

জীবন-যাত্রা

বঙ্গের চত্বরে
এসেছিল একদিন
'টিক্‌স্‌-এর ঘূর্ণি-বায়ু:
স্ব (দেশ)-হিতৈষণা-
ব্রতী নায়কের দল
চেতাইল সুপ্ত স্নায়ু।
সবুজিম যউবন-
সলিল-তরঙ্গের
ধাক্কা রুধিবে কার সাধ্য—
" 'Bonne' দে কেবল, মাগো"—
চেঁচায় তরুণ-যূথ
বর্জিয়া পানীয় ও খাদ্য।
নোকরি ছাড়িয়া কেহ
চক্রে সুত্র কাটে
সূতার তন্তু সম সূক্ষ্ম।
Bar-বনিতা স্রেফ
তালাকিয়া পুনঃ কেউ
গাউন শুকায়ে ভোলে দুঃখ।
চক্র-পন্থী দুই-
চারি মনু-সন্তান
ভণে এ তো অদ্ভুত মজারে—
সুতাই কাটিনু মোরা,
সূতা, হায়, নাহি কাটে
বঙ্গের পণ্যের বাজারে।

দেশ-নেতা উকিলের
উৎকট ঘূৎকারে
পীঠের পোড়োরা দিল সাড়া চট্,—
ঠিক্ কথা—স্বদেশের
কাজ কভু মুলতুবি
থাকিবে ? Education...tommy-rot !

*　　*　　*

ছেঁড়া কাঁথা-কম্বল
শুধু সম্বল করি'
ব্রতী অনাড়ম্বর লক্ষ,
দেশ-মাতৃকা-পায়ে
রুধির ঢালিয়া দিল
সহাস্যে ছিঁড়ি নিজ বক্ষ।
কর্ম্মী ও কর্ম্মের
নাহি ওর, শূন্যের
গড্ডল মিলিল পরার্দ্ধ—
লেকিন ক্ষুদ্র "এক" ?
হায়, কে আনিয়া দিবে
পাত্তা "এক"-এর তিল-অর্দ্ধ !

*　　*　　*

পড়োর দল　　বাণীর hall
ছাড়িয়া ধায়　　নেতার ছায়।
দু'দিন পর　　নেতার ঘর
রুদ্ধ-দ্বার　　টিকিটি তার
নিরুদ্দেশ।　　ছেলেরা শেষ
করিল ঠিক্　　ভূমিতে kick
করিয়া, চল্,　　যাত্রা-দল
খুলিয়া দি—　　তা' ছাড়া কিবা
করাই যায় !　　বঙ্গে, হায়,

আর তো ভাই কিচ্ছু নাই
যাত্রা গান অপিচ পান-
তামাক ভিন্ মনের বীণ
ত্যায় আওয়াজ ? সাজ রে সাজ্
পান-তামাক— বুঝায়ে ফাঁক ॥

—দণ্ডপাণি উপাধ্যায়

"প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ" *

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু [বি-এ (কলিকাতা) এম-এ (লণ্ডন) টীচার্স ডিপ্লোমা (লণ্ডন) টীচার্স সার্টিফিকেট (উইনেটকা, আমেরিকা)] নানা সাময়িক পত্রে শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। প্রবন্ধগুলি বিস্তারিতভাবে পঠিত হয় কিনা জানি না। "প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ" নামক তাঁহার একখানি ৫১ পৃষ্ঠার পুস্তিকা আছে, সেখানাও উপযুক্তরূপে প্রচারিত হইয়াছে কিনা জানা নাই। বইখানা হাতের কাছে আছে, পড়িয়া ফেলিলাম। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাই মনে আসিতেছে।

পৃথিবীতে বেকার সমস্যা আছে, এবং থাকিবে। ছোট-বড়, উচ্চ নীচ, ভাল-মন্দের পার্থক্য আছে এবং থাকিবে। জীবন ধারণের এবং সুখে জীবন ধারণের সমস্যা কখনো বাড়িবে কখনো কমিবে, কিন্তু এই সুলভ দার্শনিকতার সুযোগ লইয়া আমরা কি কোনো কিছুরই চেষ্টা

---

* প্রকাশক—শ্রীপঞ্চানন বসু, ই-৭৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

করিব না? মন্দ যখন থাকিবে তখন থাকুক, শিক্ষায় যখন বেকার সমস্যা ঘুচিতেছে না তখন কি হইবে শিক্ষা-সংস্কারে—ইত্যাদিরূপ সান্ত্বনায় কি আমরা তৃপ্ত হইয়া রহিব?

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এরূপ সান্ত্বনাও আমাদের নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ একটি যুক্তি খাড়া করিতেও মনের যতখানি সক্রিয়তা প্রয়োজন হয় তাহাও আমাদের নাই। অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি যে আমাদের পক্ষে কতখানি মারাত্মক তাহা বুঝিবার বা অনুভব করিবার মত ক্ষমতা আমাদের নাই।

এরূপ অবস্থায় অনাথনাথ বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ বা পুস্তিকা দেশের মধ্যে যে আশানুরূপ চাঞ্চল্য জাগাইবে না তাহা বলাই বাহুল্য। চাঞ্চল্য না জাগাইলেও যিনি এই বিরাট জড়ধর্ম্মী সুপ্ত দেশে চঞ্চলতা জাগাইবার প্রয়াস পাইতেছেন তাঁহাকে যেন আমরা অন্তত কিছু মূল্য দিতে কার্পণ্য না করি। এদেশে সহসা কিছু হইবে না, কিন্তু নিতান্তপক্ষে অভাব-বোধটাও যদি জাগে তাহা হইলেও অনেকখানি কাজ হইল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

অনাথবাবুর একটি মাত্র কথা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিতেছেন—

> (শিশুদের) বর্ণপরিচয় হইতেছে বটে, কিন্তু সে পরিচয় আনন্দরসে জীর্ণ না হওয়ায় তাহা জীবনে কার্য্যকরী হইয়া উঠিতেছে না।

হইবে কি উপায়ে? বাংলাদেশের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বা মধ্যইংরেজী স্কুলের শিক্ষক শিশুদিগকে যে বই পড়ায় সেই বই সম্বন্ধেই তাহার পূরা জ্ঞান থাকে না—কাজেই প্রকাণ্ড বেত, সামান্য বেতন এবং অজ্ঞতা যুক্ত হইয়া যে রস সৃষ্টি হয় তাহাকে বীভৎস রস ছাড়া আর কি

বলা যাইতে পারে ? পাঁচ সাত টাকা বেতনের মজুর কখনো শিশু-শিক্ষার ভার লইতে পারে ?

কিন্তু অনাথবাবু দেশসম্বন্ধে হয়ত এতখানি হতাশ নহেন সেই জন্যই সংস্কারের কথা তুলিয়াছেন। আমরাও সংস্কারে বিশ্বাসী কিন্তু দেশের শিশুশিক্ষার প্রচলিত রূপ দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ি। আমাদের দেশের অস্থিচর্ম্মসার লোলুপ পুরোহিতের মত লোলুপ শিক্ষক কখনো বিদ্যা-মন্দিরে আনন্দ পরিবেশন করিতে পারিবে না। এই জাতীয় শিক্ষককে একেবারে দূর করিয়া দিতে না পারিলে শিশুশিক্ষার নূতন বিধি প্রচলন করাও সম্ভব হইবে না। নূতন করিয়া গড়াকেই যদি অনাথবাবু 'সংস্কার' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাদের আপত্তি নাই। যে নামই দেওয়া হউক, যাহা আছে তাহাকে নষ্ট করিতেই হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের দেশে এরূপ বীভৎসরূপে বিকৃত বলিয়াই উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিসদৃশ অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা কাহারো চোখে পড়ে না। আমরা বহু প্রফেসরকে জানি যাঁহারা ছাত্রদের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর জানিয়াও নোটবই ছাপাইয়া ছাত্রদের কাছে বিক্রয় করেন। কলেজের মাহিনা খাইয়া যে পরিশ্রম ক্লাসের জন্য করা উচিত, তাহা না করিয়া, তাহা পুস্তক প্রকাশকের জন্য করেন। অনেক প্রফেসর বা স্কুল-শিক্ষক আছেন যাঁহারা সকাল বিকাল বীমার দালালি বা অন্য কোনো দালালি করিয়া থাকেন, এবং সুযোগ পাইলেই ছাত্রের অভিভাবককে বীমাপত্র বা অন্য কিছু ক্রয় করিবার জন্য বিব্রত করিয়া তুলেন। স্কুলে এমনও শুনিয়াছি, অভিভাবক শিক্ষকের নিকট হইতে বীমা না করিলে ছাত্র পাস করিতে পারে না। শিক্ষাদানও ব্যবসার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই এই দুর্দ্দৈব। যেখানে যেটুকু বিক্রয় করা যায়! প্রাইভেট

ট্যুইশন নামক একটি ব্যবসা বহুদিন হইতেই শিক্ষকদের ভিতর প্রচলিত আছে। এক শিক্ষকের বহু ছাত্র। মফঃস্বলে এক পুরোহিতের ঘণ্টায় দশটি কালীপূজার মতই ইহা একটি অর্থলাভের ফন্দীমাত্র। ইহাতে ছাত্রের ক্ষতি এবং শিক্ষকতার অপমান। অথচ ইহাকে আজও কেহ অন্যায় মনে করিতে পারেন নাই!

সুতরাং শিক্ষার আদর্শ কি তাহা জানা সত্ত্বেও (যদিও ইঁহারা তাহা জানেন না) শিক্ষকদের ভিতর হইতে এই ব্যবসাদারি মনোভাব দূর হওয়া প্রয়োজন, না হইলে সংস্কার হইবে না। মফঃস্বলে টিকাদারকে স্কুলের শিক্ষক হইতে দেখিয়াছি, হাতুড়ে ডাক্তার বা পোষ্টমাষ্টারকেও দেখিয়াছি। এমন অনেক শিক্ষক আছে তাহারা একেবারেই গণ্ডমূর্খ; তাহারা লেখা পড়া জানে বলিলে লেখাপড়াকেই অপমান করা হয়। জানে শুধু বেত মারিতে।

কিন্তু ইহা ত শুধু এই সব শিক্ষক নামধারী ডাকাতদেরই একমাত্র দোষ নহে। তাহারা যে অন্যায় করিতেছে এ বোধ তাহাদের নাই। যাহারা তাহাদের নিকট ছাত্র পাঠাইতেছে তাহাদেরও সে বোধ নাই। দেশের এই জড়ত্ব দূর করিবার কাজই বর্ত্তমানের কাজ। তাড়াতাড়ি সংস্কার করিবার উপায় নাই, ধীরে ধীরে কতদিনে হইবে তাহাও জানা যায় না—সুতরাং এই অক্ষম দেশে অনাথবাবুর 'শিক্ষার আদর্শের' মত মূল্যবান পুস্তিকার মূল্য কে দিবে? যদি আদর্শ জানিবার আগ্রহটাও দেশে দেখা দিত তাহা হইলেও অন্তত কিছু আশা করিবার কারণ ঘটিত। কিন্তু যাহাদের মধ্যে আগ্রহ জাগা উচিত বলিয়া মনে হয়, তাহারা প্রেমের গল্প ফেলিয়া কোনো প্রবন্ধপুস্তক পড়ে না।

———

টেলিগ্রাফ-অপারেটর

ক—ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমের উপর পা বাড়িয়েই দেখি বন্ধু খ—তাঁর গাড়ী নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। গাড়ীতে ব'সে একটা জরুরি কথা মনে পড়েছিল, প—সহরে তখনি খবরটা দেওয়া দরকার। কাজেই ক—তে পৌঁছেই প—তে একটা তার করে' দেবার জন্যে ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ অফিসে গেলাম। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে এখানে লেখার সাজ-সরঞ্জাম বলে' কিছুই ছিল না।

অনেক কষ্টে বহু খোঁজাখুঁজির পর একটা ভোঁতা কলম আর একটা ধূলোয় ভর্ত্তি দোয়াতের মধ্যে খানিকটা ফ্যাকাসে রঙের চট্‌চটে জিনিষ আবিষ্কার করলাম। প্রবল চেষ্টার সহিত আমার তারের কয়েকটা কথা তাই দিয়েই ফরমটার উপর ধেব্‌ড়ে দিলাম। একটি রুগ্ন গোছের স্ত্রীলোক অপ্রীতিকর মুখ-ভঙ্গীর সহিত সংবাদটা হাতে নিয়ে আমায় কত দিতে হবে—জানিয়ে দিলে। দামটা চুকিয়ে বাঁচলাম।

কর্ত্তব্যটা করতে পেরেছি মনে করে' খুসী হ'য়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্চি, হঠাৎ চোখে পড়ল অফিসের একধারে একটি টেবিলে ব'সে একজন তরুণী "মর্স-কী"র উপর হাত চালাচ্চে। চোখাচোখি হবামাত্র যেন সে একটু গর্ব্ব-ভরেই আমার দিকে পিছন ফিরে বসল। হাঁ, বয়স ত তার কাঁচাই বটে! মাথার চুলও যে মেঘের মতন কালো আর সুন্দরী, হাঁ—সুন্দরীই বা তাকে বল্‌ব না কেন? আব্‌ছা অন্ধকার-রঙের পোষাকের আবেষ্টনের মধ্যে সুঠাম দেহটির কমনীয় আভাস! রাঙা গাল দু'টির পাশে কয়েকটি চূর্ণ কুন্তল আর গোলাপী রঙের ঘাড়টিতে একটি ছোট তিল ঠিক যেন চাঁদে কলঙ্ক! অকস্মাৎ ঐ তিলটির উপর একটি চুম এঁকে দেবার জন্য আমার মনে এক দুর্নিবার উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল!

সে হয়ত ফিরে তাকাতেও পারে, এই আশা নিয়ে বয়োবৃদ্ধা রমণীটিকে টেলিগ্রাফ সংক্রান্ত কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তরে যে কতখানি সহৃদয়তা প্রকাশ পেল—তাও আর প্রকাশ করে' না বলাই ভাল! অপর জন অবশ্য একটু নড়েও বস্‌ল না।

এর পর যদি কেউ মনে করেন যে পরের দিন আমি আর টেলিগ্রাফ আফিসে যাই নি, তাহলে জানব, তিনি আমাকে মোটেই চেনেন নি।

এবার তাকে একাই পেলাম—মুখ ফেরাতেও সে বাধ্য হ'ল! আর সত্যই, সে মুখ দেখে আমার আর বল্‌বার কিছুই রইল না, এবং আমি বল্‌ছি, আপনাদেরও কিছু বলবার থাকবে না!

সেদিন অযথা কয়েকটি ষ্ট্যাম্প কিনলাম, কতকগুলি বেদরকারি তার পাঠালাম এবং তদধিক অর্থহীন প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। মোটের উপর আগাগোড়া আশ্চর্য্যভাবে একটি গাধার মত ব্যবহার করে' এলাম।

ধীর, গম্ভীর, ভদ্র অথচ চালাক মেয়ের মত আমার সব কথারই জবাব দিলে,—ফলে রোজই আমার আসা-যাওয়া সুরু হ'ল, কখনও দিনে দু'বারও, কারণ আমি জানতাম কখন তাকে একলা পাব। আসবার সঙ্গত কারণস্বরূপ—প্রত্যহ রাজ্যের অপরিচিত বন্ধুগণের উদ্দেশে অসংখ্য পত্র লেখা আর কল্পিত ব্যবসাদারদের নামে বে-অর্ডারি মালের তারযোগে তাগাদা দেওয়াই হ'ল আমার কাজ। ক্রমশঃ সহরে রটে গেল যে আমার মাথা খারাপ হয়েছে।

প্রতিদিনই মনে করতাম আজই তার কাছে মনের কথা বলব, কিন্তু তার সংযত হাব-ভাব দেখলেই "সুন্দরী, আমি তোমায় ভাল বাসি," এই কথা ক'টি আমার পেটে এসেও মুখে আস্‌ত না—অগত্যা শেষ পর্য্যন্ত আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বলতেই হ'ত—

"দয়া করে' চার আনার টিকিট দিন ত—"

অবস্থাটা ক্রমশঃ অসহ্য হ'য়ে উঠল, অথচ ফেরবার দিনও ঘনিয়ে এল। প্রতিজ্ঞা করলাম একটা হেস্ত-নেস্ত করবই করব। সেদিন অফিসের মধ্যে গিয়ে এইরূপ একটি সংবাদ লিখলাম :—

বন্ধু চ—, ক—ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ অপারেটরকে দেখনি বোধ হয়! জ্যোৎস্নার মত সোনালি তার গায়ের রং, ভোমরার মত কালো তার চোখের তারা; সুরবাহারের মীড়ের মত মিষ্টি তার গলার আওয়াজ! আমি তার প্রেমে পাগল হয়েছি, অথচ সে কথা মুখ ফুটে তাকে বলতে পারছি না, কি করি, বলতে পারো?

কম্পিত হস্তে টেলিগ্রামটা তার হাতে দিলাম। অন্ততঃ এটুকু আশা করেছিলাম যে তার মুখের গোলাপী রং আরও একটু ঘোর হ'য়ে উঠবে!

—কিছুমাত্র না!

মুখের কোন জায়গায় একটুও পরিবর্ত্তন দেখা দিল না, তারের কথাগুলি গুনে নিয়ে শুধু বললে,—

"পাঁচ টাকা পড়বে।"

এর চেয়ে শান্তস্বরে কেউ কখনো কথা বলে নি!

কিন্তু পকেট হাতড়ে দেখি পাঁচ টাকা ত দূরের কথা, পাঁচ পয়সাও নেই! পকেট-বুক থেকে একখানি পাঁচশ' টাকার নোট বার ক'রে তার হাতে দিলাম।

নোটটা হাতে নিয়ে অতি যত্নের সহিত সে পরীক্ষা ক'রে দেখলে! পরীক্ষার ফল ভালই হ'ল বোধ হয়, কারণ মুখখানি তার হাসিতে ভরে' উঠল। সে হাসি আর থামে না, হাসির পর হাসির মালা তার দু'চোখ দিয়ে সে আমায় পরিয়ে দিতে লাগল,—আর সেই অবসরে আমি দেখতে পেলাম—কি দেখতে পেলাম? দু'পাটি নিখুঁত সুন্দর দাঁত, কুন্দফুলের মত!

তারপর সুন্দরী আর একবার তেমনি ক'রে আমার চোখেমুখে তার হাসির আলো ছড়িয়ে দিয়ে, একবার বামে, আর একবার দক্ষিণে মাথাটি নেড়ে, দু'কানের দুল দুলিয়ে—কণ্ঠে সঙ্গীত ফুটিয়ে আমায় বললে, কি বললে শুনবেন?

—আপনি কি বাকিটা ফেরত চান?

———

ফরাসী গল্পের ভাব অবলম্বনে।

সেকালিনী

চৈত্র মাসেতে হায় প্রবাসীর পাতাতে
শ্রীমতী অপরাজিতা নানা ছুতা নাতাতে
কবিগুরু রবিদা'কে হাত মুখ নাড়িয়া
দেখিতেছি ফেলেছেন একেবারে পাড়িয়া !
যদিও বয়স তাঁর সত্তর পারায়ে
বুদ্ধিটা একেবারে যায় নি ত হারায়ে !
নাৎনীর কাছে তাই নানা রসে রসিয়া
হার মেনে কর-জোড়ে পড়েছেন বসিয়া।
'শিভাল্‌রি' এরে যদি নাহি চাহ বলিতে
বলিও না !—সব কিছু হতে পারে কলিতে !

কিন্তু শ্রীমতী তুমি ভাবিও না তা' বলে
ভুলাইবে আমারেও আবোলে বা তাবোলে,
আমার বয়স আজও তিরিশের কোঠাতে
সুরু করিয়াছি সবে কিঞ্চিৎ মোটাতে !
বুদ্ধিও হয়ত বা নয় খুব তীক্ষ্ণ,
তবুও বুঝিতে এটা হয়নি তো বিঘ্ন—
এ-কালিনী নহ নহ, তুমি সেকালিনী গো
স্বামী-সহধর্ম্মিনী, তনয়-পালিনী গো !

অবশ্য এ-কালের হাব-ভাব ফ্যাশনে
আয়ত্ত করিয়াছ প্রাণপণ প্যাশনে !
কবিতা লিখিতে চাও—যোগ দাও তর্কে
ফুলুরি হয়ত খাও বিঁধে বিঁধে 'ফর্কে' ;
স্কার্ট-পাড়-শাড়ী তব নানাবিধ কোঁচেতে
রমণীয় ভাবে আঁটা কমনীয় ব্রোচেতে !
চা-পানি বানাতে পার জাপানীয় কাঁচেতে
খদ্দরি ব্লাউস্ পর লণ্ডনি ধাঁচেতে ।
এরোপ্লেনে যদি চড়, পাঁজি দেখে চড় গো
মনে সদা ভয়-ভয়, সদা পড়-পড় গো !
হয়ত বা ড্রাইভারে বল নাক 'থাম্ থাম্'
মনে মনে অবিরত জপিতেছ রাম নাম ।

এ-কালিনী হতে যদি পাকা-পাকি ওজনে
বিলাসে, ব্যসনে, বেগে, বিহারে বা ভোজনে ;
তাহাদের মত যদি থাকিত সে 'ড্যাশ'টা
যার বলে তারা এই পৃথিবীর ব্যাসটা
বেদ-ব্যাসের কোন বিধান না জানিয়াই ।
পার হয়ে যেতে চায়, নানা বাধা মানিয়াই ।
গোল্লায় যেতে পারে—যেতে চায় 'মার্সে'
উদাসিনী বসে থাকে অচেনার পার্শ্বে ।

রবিবারে ভালবাসে প্রাণ দিয়া যাহারে
সোমবারে হাসিমুখে ত্যাগ করে তাহারে !

এ-কালিনী হতে যদি চিন্তার জগতে
রবিদা'র পাওনাটা মিটাইতে নগদে।
পুরাতন নজীরের জের টেনে আনিয়া
সেকালের সেই পচা-কাহিনীকে টানিয়া
দেখাতে না একালের-সেকালের মিল গো,
এ-কালিনী শোনে যদি হয়ে যাবে নীল গো।

এ-কালিনী সেকালের তোয়াক্কা রাখে না
মিল যদি থাকে থাক্, সেটা গায়ে মাখে না!
অন্ততঃ তাই নিয়ে বাজায় না ঢাকটা .
এ-কালের গর্ব্বেই উঁচু তার নাকটা!
"আমি ত সেকেলে নই!"—এই তার গর্ব্ব
তুমি সেটা শেষকালে করে দিলে খর্ব্ব!
সেকালের মত যদি একালের জগতই
'প্রগতি' বলিছ কেন? বল তবে 'অগতি'!
সেকালের দোহাইটা মিছে পেড়ে, উতলে,
এ-কালিনী শালীনতা লুটাইলে ভূতলে!
মনে হয় তাই তুমি একালিনী নহ গো
সেকালের গৌরব আজও বুকে বহ গো!

এ-কালিনী সকলেরে করেন না বিধি যে,
অধিকাংশই হায় পিসি, মাসী, দিদি যে!
এবং বাঁচোয়া সেটা! অন্ততঃ আমাদের
অর্থাৎ Dick-Tom, যদু-রামা-শামাদের

এ-কালিনী রমণীরে সিনেমা বা নাটকে,
যুদ্ধের শিবিরে বা রাশিয়ার ফাটকে
দেখিয়া তৃপ্ত হব,—দিব হাত তালিও;
ঘরেতে কিন্তু চাই সেই পুরাকালীয়
রাগে অনুরাগে ভরা অঙ্গন-লক্ষ্মী
আধুনিক ডিম্বেতে সনাতন পক্ষী!

সুতরাং এই তব অতীত-প্রশস্তি
আনিয়া দিয়াছে মনে শান্তি ও স্বস্তি
খুসী আছি এই ভেবে আমাদের দেশেতে
দিদিমারা বেঁচে আছে নাৎনীর বেশেতে।

"বনফুল"

পৃথিবীর পাগলামি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সত্তরলক্ষ লোক কর্ম্মহীন!...তবুও, প্রতি ব্লকে বেআইনী মদের দোকানের ('Speak easies') এবং হাজার হাজার নৃত্যশালায়, শত শত নাইট ক্লাবে, ধূসর উষোদয় পর্যন্ত, জ্যাজ্ ব্যাণ্ডের উদ্দাম ধ্বনির অভাব নেই।

ব্রড্ওয়ের, টাইম স্কোয়ারে এইরূপ কোলাহলপূর্ণ রাত্রিতে একটু ভ্রমণ করা যাক্। এক থিয়েটারের টিকিট ঘরের কাছে খাঁচায়

পোরা একটা চিতা বাঘ ঘুরছে; একটা ভালুক; সাদায় কালোয় মেশান এক 'তাপির' (গণ্ডার জাতীয় জানোয়ার)। এসব জানোয়ারের সঙ্গে প্রোগ্রামের কোন সম্বন্ধ যদিও নেই, তবুও এদের এখানে রাখার উদ্দেশ্য, যারা সে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছেন, তাঁদের দ্রুতগতিটাকে একটু থামিয়ে ঐ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। থিয়েটারের শো বিকেল চারটে থেকে রাত বারটা পর্য্যন্ত, মাঝে কোন ইণ্টারভালই নেই। সবচেয়ে শস্তার সীট্ হচ্ছে কুড়ি সেণ্টের (অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ আনা; এবং সব চেয়ে দামী, দেড় ডলার (প্রায় সাড়ে ছ টাকা)। যখন খুসী এখানে প্রবেশ করা যায় এবং যতক্ষণ খুসী থাকাও যায়; ইচ্ছে করলে, পুরো আট ঘণ্টা বসে থেকে একই প্রোগ্রাম তিনবার দেখা যায়—অবশ্য, যদি কারও আট ঘণ্টা একাদিক্রমে ক্রমাগত জ্যাজের আওয়াজ শুনে বসে থাকার সাহস থাকে। জ্যাজে রকমারী ছন্দ আছে একথা স্বীকার করলেও, কেবল একঘেয়ে রকমের কর্কশতা যেন সামনে ক্রমাগত ধাক্কা মারে। E. W. Howe বলেন, "জ্যাজ ব্যাণ্ড যারা বাজায়, তাদের প্রত্যেকেই মাতলামি ও গুণ্ডামির এক এক অবতার।"

যাহোক, কয়েক মিনিট পরেই, লেখক পল হোয়াইটম্যানের সঙ্গে গল্প করবার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন, "জ্যাজ মিউজিক্ নাকি মরণপথগামী, অনেকের তো এই ধারণা, অথচ শত শত বার এই মরণোন্মুখ সঙ্গীত মরতে মরতেও পুনর্জন্ম পেয়েছে।—এর স্বপক্ষে? বিপক্ষে? আধুনিক সঙ্গীত? আবশ্যকতা? ভিতরকার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা? এসব প্রশ্নের উত্তর কি আমি জানি?—কুড়িবছর আগে, সানফ্রান্‌সিস্‌কোতে আমি 'আল্টোতে' (কর্ণেটের মত) কখনও ক্লাসিকাল সঙ্গীত ছাড়া অন্য কিছু বাজাইনি।

পরে, এক অর্কেষ্ট্রাতে, তেরো জন যন্ত্রীর মধ্যে আমি দ্বাদশ নম্বরের বেহালাবাদক হয়েছিলুম। কিন্তু একাজে আমার পেট ভরা দায় হয়ে উঠেছিল, কাজেই সুযোগ বা সুবিধে পেলেই কিছু কিছু সঙ্গীত রচনা করব, এ খেয়াল আমার ছিল। কিন্তু হঠাৎ অল্পকিছুদিন বাদে আমার চাকরী যায়। তখন বাধ্য হয়ে আমায় এই মতলব করতে হয় যে নিজেই এক অর্কেষ্ট্রার পত্তন করব। দুর্দ্দশায় পতিত কতকগুলি সঙ্গীর অভাব হল না। আমাদের 'মিউজিক্' কেনবার অবস্থা ছিল না, কাজে কাজেই আমাকে রচনা করতে হত সবই, আমার অর্কেষ্ট্রার জন্যে। ছন্দজ্ঞান আমার ছিল, আমি সে সব পুরোন সঙ্গীতের ছাঁচ নিয়ে শব্দ বসাতে লাগলুম; এবং সে কারণেই বোধ হয় কোটি কোটি লোক আধুনিক ছন্দ জিনিষটাকে বুঝতে আরম্ভ করেছে, নৈলে 'জ্যাজ্‌সঙ্গীত' আজ যতদূর উন্নত হতে পেরেছে, তা হবার অবসর পেত না।"

নামজাদা হোয়াইটম্যান বলতে আরম্ভ করলেন, "বড়ই আশ্চর্য্য যে অনেক আমেরিকান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ম্যাগনেট্ এবং তথা অর্থজগতের কর্ত্তারা, এই জ্যাজ্‌সঙ্গীত খুসী হয়েই শোনেন, এমনকি তাঁরা বলতেও কসুর করেন না যে, এ সঙ্গীত তাঁদের মনকে বেশ ভাল-রকমেই নাচায়। এবং যদিও তাঁরা আধুনিক সঙ্গীতের ঠিক গোঁড়া ভক্ত ন'ন্, তবু রাজ্যশাসন কার্য্যের বড় বড় পাণ্ডাদের প্রায় সকলেরই মধ্যে এর মিত্রের অভাব নেই।" অন্যান্য অনেক আমেরিকান, লেখককে যা গল্প করে শুনিয়েছেন, সে সব কথার প্রতিধ্বনি করে ইনি আরো বললেন, "চার্ল্‌স জী. ডজ্-এর উদাহরণ ধরা থাক। ইনি এত রকম যন্ত্র বাজাতে পারেন যে বলার নয়। ইনি তাঁর জীবনী আরম্ভ করেন, যৌবনে ফ্লুট বাজিয়ে; নিজের ক্ষমতার পরিচয়

দেখিয়ে ইনি উন্নততর অবস্থায় উপনীত হন। এমন কি, ইনি ম্যারিয়েটার (ওহিয়োতে) মিউনিসিপাল অর্কেষ্ট্রাতেও বাজিয়েছেন। কিছু বিলম্বে ইনি পিয়ানো বাজাতে শেখেন, হার্মনি জিনিষটা কি তা দস্তুরমত শিক্ষা করেন এবং পরে নিজেই সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন। বিখ্যাত ভায়লিনিষ্ট, ফ্রিজ্ ক্রাইজ্‌লার ডজ্ রচিত Melody in A তাঁর repertoireএ ব্যবহার করেন। ইস্পাতের 'রাজা' Charles M. Schwabও বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে একজন; ইনি তাঁর যৌবনে, নিজে পিয়ানো ও বেহালা শেখাতেন।

আমেরিকার কর্ত্তারা তাহলে সব সঙ্গীত-ধুরন্ধর! তা যদি হয়, তবে তাঁরা কি জগতের কনসার্টে প্রথম বেহালাবাদকের স্থান অধিকার করবার সামর্থ্য রাখেন? আজকাল চারিদিকে যে বিপ্লব চলছে তার গোলমালের মধ্যে, তাঁরা কি তাঁদের গলাবাজী করবার স্পর্দ্ধা রাখেন? আমেরিকায় যদি কেউ অর্থনৈতিক প্রশ্নের, গুণ্ডামী বা ডাকাতী কার্য্যের, জীবন ধারণের ষ্ট্যাণ্ডার্ডের, অথবা খালি price index এর সম্বন্ধে অফিসিয়াল জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে চান, তাঁর তাতে ঠকবার আশঙ্কা নেই কেননা, আর যাই হোকনা আমেরিকার প্রধান ঝোঁক হচ্ছে, 'ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্' এবং জীবনসত্ত্বার পরিচয় প্রদানে: সংখ্যা অথবা ডলার। প্রায় সকলক্ষেত্রেই এই সব সংখ্যা সত্যসংখ্যার সঙ্গে মিল খায়, কারণ আধুনিক যা কিছু প্রণালী, তা দিয়েই এ সব সংগৃহীত।

এই statistical service থেকেই জানতে পারা যায় যে, গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী সব চেয়ে দামী জমি মানহাট্টানে পাওয়া যায়, যেখানে এক centimeter square জমির দাম এক ডলার; যে নিউ ইয়র্কের সেণ্ট্রাল পার্কে প্রতি রাত্রের তেত্রিশহাজার পাঁচ শ লোক শুতে আসে; যে বিরেনব্বই ফুট উচ্চে অবস্থিত উপরে-চলা রেলগাড়ী

থেকে দেড়খানা মানুষ ও সওয়া একখানা স্ত্রীলোক প্রতিদিন ইচ্ছে করে ঝাঁপ দেয়; যে নিউইয়র্কে এগার হাজার তুশোচল্লিশ জন লোক, যাকে racketeering বলা হয়, তারই উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। অর্থাৎ এদের কাজই হচ্ছে বড় বড় ব্যবসাদারদের গুপ্তকথা প্রকাশ করবার ভয় দেখিয়ে সেলামী আদায় করা; যে নিউইয়র্কে এমন একটা পাড়া আছে যেখানে একদিন অন্তর একজন পুলিসম্যান ও অন্য একজন লোক খুন হয় এবং যেখানে গড়পড়তায় প্রতি রাতে সতেরটা চুরি ডাকাতী হয়। কেবল সংখ্যা আর সংখ্যা, অমানুষিক সব সংখ্যা...যদিও এটা স্বীকার করতে হবে যে, এই সংখ্যা সকল মানুষকে চিন্তা করবার বেশ একটু খোরাক দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সংখ্যা-তালিকা যে সব রক্তমাংসের শরীরের সম্বন্ধেই এই সব সংবাদ যোগাড় করে তারা কি ভাবে এ বিষয়ে? তারা এটাকে কিরকম ভাবে মনে গ্রহণ করে?

* * *

রক্তবর্ণ আলোক! পাঁচ শ গজ দূরত্বের পরিসরে, ছটা শ্রেণীতে সমস্ত 'অটো'ই দাঁড়িয়ে এবং ইঞ্জিনের ঘসঘস শব্দ ও শোফারদের বিরক্তিব্যঞ্জক শপথ বাণীর শব্দ কানে বাজে।

সবুজবর্ণ আলোক! অমি আরম্ভ হয় ভীষণ ছুট সকলেরই; যেন সকলেই শিকারে চলেছে এবং শিকারের পশ্চাদ্ধাবনই তার অঙ্গ। গোলমালের মধ্যে চারিদিকে চীৎকার এবং ভেজা ও উজ্জ্বল পীচের রাস্তার ওপর কেবল রবারের পিছলান...এই।

যাহোক সেই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে লেখক ৫৮ ষ্ট্রীটে অবস্থিত Petes Barএ উপস্থিত হলেন। এক বৃদ্ধ ব্যক্তি বলছেন, "সফলতা! তার মানে কি?"

তাঁর 'girlie' দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, "আমি তো ঐ জিনিষটাই জানতে চাই।"

এবং Petes Elektrola তাদের বাধা দিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন, "সকলেরই কর্ত্তব্য হচ্ছে, এটা নিজে নিজেই অনুশীলন করা।"...

সেখানে, চেষ্টনাট্-রংএর কস্‌টিউম-পরা লালমুখো একটি ভদ্রলোক ছিলেন। লেখক সেদিকে দৃষ্টিপাত করেই বুঝতে পারলেন যে, তিনি হচ্ছেন Mike o' Grady, একজন Cop (অর্থাৎ পুলিসম্যান)। লেখকের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা ছিল, তাই তিনি গোয়েন্দা মশায়কে কিছু 'পান' করার নিমন্ত্রণ করলেন। লেখক জানতেন যে, Mike, ঠিক আগের দিনেই আরো একটি যুবককে ভূমিসাৎ করেছেন, এবং সে কারণেই তাঁর জানার ইচ্ছা ছিল যে, যুবককে হত্যা করে গোয়েন্দামশায়ের মনের অবস্থা কেমন।

* * *

Mike o' Grady 'জিন' পান কর্ত্তে চাইলেন, এবং বল্লেন, "আমি এখন কাজে নেই। তাছাড়া,—আমি বেশী পানও করিনে।"

লেখক কথা পাড়লেন এই বলে, "আমি শুনেছি, সামান্য কিছুকাল আগে আপনি এক মারামারির ভেতর পড়েছিলেন..."

"হ্যাঁ, তা সত্যি। দু একবার পড়েছি বটে।"

"আচ্ছা, মানুষ খুন করে কি আপনার মনে কখনও একটু চাঞ্চল্য আসেনি?"

"আমার? নিশ্চয়ই। গত কালও আমি এক ব্যক্তিকে ভূমিশায়ী করেছি।"

"কেমন করে এ ব্যাপার ঘটল?"

"একটা রাহাজানিতে ('Hold p')।"

"কিন্তু, কি ভাবে ?"

"তার এই আকাঙ্ক্ষাই ছিল এবং তাকে তাই দেওয়াও হল। হাসপাতালে যাবার পথেই সে মারা গেল।"

"কিন্তু, কেমন করে এ ঘটল যে আপনি ঠিক ঘটনার সময়েই সেখানে উপস্থিত হলেন ?"

"দৈব। আমি রেস্তরাঁতে বসে ছিলুম, দেখলুম সে ক্যাশিয়ারের ওপর লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু, সে কি করতে যাচ্ছে, এ ব্যাপার ভাল রকমে বোঝবার পূর্ব্বেই আমি তাকে গুলি করলুম।"

'বাস্তবিকই ?"

"নিশ্চয়ই, আমার গুলি তাকে স্পর্শ করেছিল।"

"আপনি তাহলে বলতে চান যে সে যখন ডাকাতী করতে যাচ্ছিল, আপনি তখন দৈবক্রমে সেই আস্তানায় হাজির ছিলেন ?"

"সত্যিই। আমার স্ত্রী ও আমি, আমরা দুজনে মনে করেছিলুম যে, সকাল সকাল খাব এবং খাওয়ার পর একটা 'মাটিনে' (matinee)তে যাব, কিন্তু…"

"ঘটনার স্থানে, আপনার স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন তবে ?"

"নিশ্চয়ই, আমরা সর্ব্বদাই এক সঙ্গে ভোজন করি।"

"হু-হুঁ। ক্যাশিয়ারকে তাহলে সে ভয় দেখিয়েছিল !"

"হ্যাঁ, আর ঠিক সেই সময়েই আমি আমার রিভলভারের ঘোড়া টিপি।"

"কোন মানুষকে খুন করা, বাস্তবিকই ভয়ঙ্কর রকম কঠিন, না ?"

"হুঁ, আর, লোকটা আমার কাছ থেকে এমন কি দশ পা দূরেও ছিল না।"

"আচ্ছা, আপনি কি তাকে খুন করার বদলে ভয় দেখিয়ে, তার হাত দুটো মাথার ওপর তোলাতে পারতেন না ?"

"সময় ছিল না বন্ধু, তার ইচ্ছা ছিল দ্রুতগতি কাজ হাসিল করা। আমি যদি অপেক্ষা করতুম তাহলে ক্যাশিয়ারের দশা তারই মত হ'ত।"

Mike o' Grady, Barএর ওপর ঝুঁকে 'জিন' পান করতে লাগলেন ; ইনি এক বিরাটকায় ভারী ওজনের লোক, এবং তাঁর চোখের দৃষ্টি অতি স্বচ্ছ।

লেখক আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকটা তার রিভলভার বার করবার পূর্ব্বে কি করছিল ?"

"কিছুই না।"

"লোকটা বাইরে থেকে এসেছিল, না আগেই এসে বসেছিল ?"

"সে একটা টেবিল নিয়ে বসেছিল।"

"আপনার কাছ থেকে দূরে ?"

"না, খুব নিকটেই। মাটিনের জন্যে, আমরা ভোজন করছিলুম সকাল সকালই, তখন এখানে প্রায় কেউই ছিল না। আমাদের কাছাকাছি দুটি মহিলা তখনও বসে ছিলেন ; আমি তাদের নাম ধাম ভাল রকমেই জানতে পেরেছি, যদিও তারা নিজেরাই তা এত ভাল রকম জানে কিনা সন্দেহ।"

"আপনার স্ত্রী এ ঘটনার পর কি করছিলেন ?"

"আমার স্ত্রী ? কি আবার করবে ?"

"তা হলেও, যখন লোকটাকে আপনি ভূমিশায়ী করলেন, তখন আপনার মনে নিশ্চয়ই কোন রকম একটা ভাব জেগেছিল ; আপনার তার জন্যে কিছু করাও উচিত ছিল।"

"কে বল্লে, আমি কিছু করিনি? আমি তথ্খুনি তার কাছে গিয়ে তার হাত থেকে রিভলভারটি ছিনিয়ে নিয়েছিলুম। সেটা একটা পুরোন আরমি রিভলভার ৪৮ কোল্ট এবং সমস্ত কার্ত্তুজগুলিই তার ভিতরে ভরা ছিল। লোকটা তখনও মরেনি, তার মৃত্যু হয়েছিল হাসপাতালেই।"

"মরবার আগে সে কিছু বলেনি?"

"বলেনি আবার! অনেক কথাই বলেছিল, কিন্তু আমার অত সব মনে নেই। খবরের কাগজওয়ালারা আজ সে সব প্রকাশ করবে 'খন্।"

"তার স্ত্রী বা কোন সন্তানাদি ছিল না?"

"না, বাচ্ছা রিপোর্টার আমায় বলে গেল যে তার এসবের বালাই কিছু ছিল না। তবে তার কোন এক বান্ধবী ছিল এই মাত্র। এদের প্রায় সকলেরই একটা করে বান্ধবী থাকে।"

"রিপোর্টার কেমন করে আপনাকে এত সব খবর দিল?"

"তার আর আশ্চর্য্য কি, আমি তাকে টেলিফোন করেছিলুম। আমার ধারণা, আপনিও তাকে চেনেন, আশ্চর্য্যরকমের ছেলে। যখন আমি আমার রিপোর্ট দিচ্ছিলুম, ঠিক সেই সময়েই সে কমিসারিয়েটে এসেছিল; এসেই আমাকে ডাকে। তখন বেলা দেড়টা, আমি আমার শালী এলার সঙ্গে সবে 'স্পেক্টাকল্' দেখে ফিরে এসেছি, আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিল না। থিয়েটারে 'Lilliom' পরীদের ব্যাপার বা ঐ রকম একটা কিছুর পালা হচ্ছিল। আমার ধারণা ছিল যে সেখানে গানবাজনাও ছিল, কিন্তু……"

"মৃত ব্যক্তির মুখাকৃতি কি এখনও আপনার মনে পড়ে?"

"যুবকের? কৈ না।"

"বাঃ তা'র বাইরের ব্যাপার অর্থাৎ ধরণ ধারণ, আচার ব্যবহার কিছুই আপনার মনে নেই?"

"নিশ্চয় আছে, লোকটার বয়স কম ছিল, যুবকই বলা চলতে পারে; মুখখানা তার দাড়ীতে পূর্ণ ছিল, ক্ষৌরকার্য্যের বিশেষ আবশ্যকই তার ছিল। 'ক্যাশের' দিকে ধাওয়া করবার আগে সে আমার কাছেই একটা দেশলাইয়ের কাঠির জন্য এসেছিল অথচ ঠিক তার টেবিলেরই উপর একটা দেশালায়ের বাক্স ছিল। আমার কাছে দেশালাই ছিল না, আমি সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বল্লুম, 'তোমার টেবিলের ওপর রয়েছে যে।' আমার কথায় সে পাগলের মত মুখ কুঁচকে, একটা অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট ধরালে এবং তারপরেই, তার 'কোল্ট' বার করে ক্যাশের দিকে ধাওয়া করলে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভূতলশায়ী করলুম।"

"লোকটার নাম কি?"

"আঃ সেটা খবরের কাগজেই ছিল, কিন্তু আমার ছেলে ফ্রেডি (বয়স বারো, ভারী 'স্মার্ট') প্রতি কাগজেই আমার ফোটো ছিল বলে, কাগজ থেকে সে সব টুকরো কেটে ফেলে দিয়েছে, এবং মনে হয়, কাগজগুলোও এতক্ষণে আস্তাকুঁড়ে। এসব বাস্তবিকই বড়ই মুখ্যুমির কাজ, না?"

এক ভদ্রলোক মাইককে খুঁজতে এলেন এবং লেখকও সেখান থেকে বিদায় হলেন। লেখকের মনে ক্রমাগতই বাজতে লাগল, "মানুষ খুন করলে কেমন লাগে..." (How it feels to kill a man...)

সামনে আলোকিত বিরাট বিজ্ঞাপনের প্যানেল।

প্রতি অর্দ্ধমিনিট অন্তর ব্রড্‌ওয়ের সমস্ত গণ্ডগোল ছাড়িয়ে সিংহনাদ হচ্ছে :—

"সতর্কতাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাস্তা পেরুতে বরং পাঁচ মিনিট নষ্ট করে প্রাণ বাঁচাও, কারণ জীবন সুন্দর।"

সত্যই কি এ জীবনটা সুন্দর ?

* * *

দুঃখের সঙ্গেই ট্যাক্সী ওয়ালষ্ট্রীটের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছিল। সামনেই দেখা যাচ্ছে, সাদাসিধে ধরনের এক বাড়ী, যার নীচু দরজার ওপরে লেখা আছে, জে, পি, মর্গ্যান্ এণ্ড কোং। কিন্তু মর্গ্যান কারু সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না! তিনি প্রেসকে দ্রুত চালিয়ে নিয়ে চলেন, যেমন তাঁর বাপ চালাতেন। প্রেসকে তাঁর বাপ, "Plutocracyর bleeding dog" নামেই অভিহিত করতেন…।

স্বেচ্ছায় তিনি কয়েকটি বিষয় ছাড়া বিশেষ কিছু বলেন না, যথা প্রাত্নতত্ত্বিক প্রশ্ন, আমেরিকান গির্জ্জার ইতিহাস, ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের প্রতি তাঁর যে টান, তাই তাঁকে যে জ্ঞান দিয়েছে তাকে কোনক্রমেই সাধারণ জ্ঞান বলা চলে না। তিনি সর্ব্বদাই পোপের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি করেন এবং যখন রোমে যান, কখনও পোপের সঙ্গে দেখা করতে ভোলেন না। Pius XI তাঁকে এক ছোট লাইব্রেরীতে অভ্যর্থনা করেন এবং সেখানেই দুজনের নানান রকমের ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা হয়; Copte (ইজিপশিয়ান জাতি-বিশেষ) দের শাস্ত্র গ্রন্থ, দলীল ইত্যাদিই তাঁদের মনোযোগ বেশীরকম আকৃষ্ট করে।

এগিয়ে চলা যাক। কিন্তু রক্তবর্ণ আলোক, সুতরাং থামো; বাঁয়ে থেকে ডাইনে মানুষের লম্বা লম্বা সারি। অনেক মুখই চিন্তাগ্রস্ত, অনেক মুখেই হতাশা প্রতিফলিত। ট্যাক্সী আরো খানিকটে এগিয়ে চল্‌ল তারপরই সব গাড়ী থেকে নামতে বাধ্য হল, কারণ সামনেই এক

বিরাট সবুজ লরী এক লিমুজিনের গায়ে ধাক্কা মেরেছে। চারিদিকে ভাঙা বোতলের কুচোয় ভর্ত্তি; বোতলগুলি জলে পূর্ণ ছিল; সত্যিই বোতলে জল সংরক্ষিত ছিল। চাপ পরিমাণ মত না হওয়ায় আকাশচুম্বী অট্টালিকাসমূহের উপরতলায় জল ওঠে না এবং সেই কারণেই, ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া সব ঝর্ণা থেকে জল লোকে ছোট ছোট বোতলে কেনে; এক বোতল জলের দাম হচ্ছে দশ সেণ্ট (অর্থাৎ প্রায় ছয় আনা)।

নিউইয়র্কের গ্রীক দেবমন্দিরস্বরূপ ষ্টক্ একস্‌চেঞ্জে প্রবেশ করা হল। দালাল বল্লে, "আজ কিছুই নেই।" পরক্ষণেই সে এই আস্তানার composition সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করে বললে যে, অর্থবাজারের এই ক্রাইসিস্, এই ভঙ্গুরতা ('krach') সত্ত্বেও এখানকার প্রতি বৈঠকের মূল্য সর্ব্বদাই তিন লাখ চল্লিশ হাজার ডলার। আরো বললে, "ওয়াল ষ্ট্রীটের যেখানে আটষট্টি নম্বরের বাড়ী আছে, ওখানেই ১৭৯০ সালে এক পুরোন গাছ ছিল। সেই বৃক্ষতলে, নিউইয়র্কের প্রথম দালালরা, সংখ্যায় বারোজন মাত্র, জড়ো হত। তাদের সেই সম্মিলন, আজকের দিনের 'বুর্গের' মতই স্বাধীন ছিল। সভ্যদের মধ্যে চুক্তির দ্বারাই তার গঠন হয় এবং তা ঠিক্ এই যুক্তসাম্রাজ্যের মধ্যে একটা ছোট রাজ্য স্বরূপ। এর আইন-কানুন বড়ই কড়া রকমের, কারণ এ সব অতি প্রাচীন।"

সব স্থানের মতই এখানে চীৎকার। কিন্তু তবুও এখানের একটা কথাও বোঝা যায় না, দালালরা তাদের সব সংখ্যার অন্ত নামকরণ করেছে। এখানে কেউ হাজার বার 'quarter' কথার পুনরুল্লেখ করে না, 'odr' বলেই সন্তুষ্ট; 'three'র বদলে সকলেই 'i' বলে। যতদূর সম্ভব স্বরবর্ণের প্রতিই সকলের নজর। শত শত অক্ষর

ছেঁটে ফেলে, শেষের সংখ্যাগুলো নিয়েই চলবার চেষ্টা; সব রকম দামেরই এখানে একটা করে ছোট নাম আছে, যা ছাপা তালিকার সঙ্গে ঠিক খাপ খায়। ব্যাঙ্কার পুনর্ব্বার বললেন বটে যে, আজ আর কিছুই নেই, কিন্তু তবুও সংগ্রাম এখানে এত ভীষণ যে, মনে হয় বুঝি সব দম আটকে মারা যায়।

এখানকার 'প্যাসেজে'র গোলক ধাঁধাঁয় লক্ষ লক্ষ লোক তাদের জীবনধারণের জন্য সর্ব্বদাই যুদ্ধ করছে—যেন এক বিরাট মৌচাক। এখানেই কোটি কোটি ডলারের হস্তান্তর হয় এবং দিনের পর দিন, এখানকার পাশবিক অবস্থা ভোগ করতে লোকে এখানেই ছুটে আসে।

দূরে, ব্রডওয়ের কোণে, ছোট এক গির্জ্জা মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার দুর্ব্বল চূড়া আকাশ পানে উঠে একটু আলোকিত হ'তে চাইছে, কিন্তু তার চারদিকের সব অত্যুচ্চ ব্যাঙ্কগুলি তাকে ঢেকে তার থেকে সমস্ত আলোকই অপহরণ করে নিচ্ছে।

'অর্থের' এই রাস্তা এত ছোট আর এত সরু যে, দম বন্ধ হয়ে আসে। পিছন পানে দৃষ্টি আর একবার ঘুরে আসে, কিন্তু "আজ কিছুই নেই" সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করেছে।

টাইমস্ স্কোয়ারে লেখকদের গাড়ী অপেক্ষা করছিল। সেখানে নবাগত সংবাদ সমূহ, এক গজ উঁচু বড় বড় অক্ষরে সংবাদপত্রদের বাড়ীগুলির চারিদিক দিয়ে ছুটছিল, এবং পড়ে বোঝা যাচ্ছিল, "Stocks decline again"; ষ্টকের দাম আবার কমতে আরম্ভ হয়েছে; শেষ দুঘণ্টার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ ডলারের লোকসান···।"

* * *

পরদিনই ওয়াশিংটনে, Eugine Meyer জুনিয়ারের সামনে আপীল। ইনি ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের কর্ত্তা এবং নিজ দেশের

'ফিনান্সিয়াল ইকনমি'রও পরিচালনকর্ত্তা। নিজদেশ কেন প্রায় সমস্ত দুনিয়ারই আর্থিক অবস্থার পরিচালনা ইনিই করেন।

এঁর বাপ E. Meyer সিনিয়র ষোল বছর বয়সে ফ্রান্স থেকে নিউইয়র্কে 'এমিগ্রেট' করেন; সেখান থেকে পানামায় যান এবং পরে লস্ এঞ্জেলেসে গিয়ে এক শক্তিশালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। এঁর পুত্র নিউইয়র্কে এক প্রাইভেট ব্যাঙ্ক গঠন করেন। ১৯১৭ সালে, সকল রকম রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায়, পৃথিবী ব্যাপী প্রাধান্যের সকল রকম অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে শিক্ষিত হয়ে ইনি ওয়াশিংটনে আসেন।

ক্রাইসিস্ সম্বন্ধে ইনি কি বলেন?—"যেমন কোন ধারণাই হোক না কেন, সমস্ত বিশ্বই যে তাকে এক মনে বরণ করে নেবে, এ আমি বিশ্বাস করিনে। পৃথিবীব্যাপি যে এই আর্থিক দুরবস্থা আজ এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে আমি বলব যে, আমাদের ধারে কারবার করার পদ্ধতিটা একটা মস্ত রকম দায়িত্ব বহন করছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই; 'ক্রেডিট' জিনিষটাকে আমি 'ড্রাগে'র সঙ্গেই তুলনা করব। যাঁরা এই ক্রেডিটের শক্তি, এর বিপদ জানেন, তাঁদের হাতে এটা সর্ব্বপ্রধান সহায়দাতা ত্রাণকর্ত্তার মত। কিন্তু ঠিক নেশার মত, এর অসদ্ব্যবহার, এর অবহেলা, এর অভ্যাস ও এর অতিব্যবহার দ্বারা মানুষের মনে অতীব নীচতার সৃষ্টি করে, এবং সে হিসাবে, ক্রেডিটের তুল্য সর্ব্বোপায় ধ্বংসকারী আর কিছুই নেই।"

সভাপতি মশাই বলে যেতে লাগলেন, "Trade boomsএর সর্ব্বোচ্চ চূড়া ও trade depressionsএর সর্ব্বনিম্ন খাদ সমান করা হয়ত সম্ভব হত, হয়ত এ কাজটা খুবই সরল হত, যদি আমরা এক স্থায়ী (stable) জগতে বাস করতুম। কিন্তু ঠিক যখন আমরা

পৃথিবীর এক সীমা stabilise করেছি, পৃথিবীর অন্য সীমা তখন ইতিমধ্যে ঠিক এর উল্টো আকার ধারণ করে বসে আছে।...ক্ষোভের কথা যে, পৃথিবী কখনই নর্ম্মাল নয়।”

সেই রাত্রেই, একই কন্সার্টে লেখক আবার মেয়ার জুনিয়ারকে দেখতে পান। তিনি আধুনিক সঙ্গীত উপভোগ করছিলেন। লেখক সেখানে শুনেছেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীর মতই, মনেপ্রাণে চৈনিক আর্টের সংগ্রহকারক। আমেরিকার অতি বিশ্বাসী আশাবাদীদের মধ্যেও তিনি একজন।

* * *

(ক্রমশঃ)

চিঠি

“শনিবারের চিঠি” সম্পাদক মহাশয়,

আশা করি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সম্প্রতি কয়েকখানি কাগজে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। ঘটনাটি এই, জনৈক ভদ্রলোক এবং জনৈকা মহিলা বাস্-এ যাইতেছিলেন (এরূপ ঘটনা নূতন নহে), কিন্তু কোনো কারণে মহিলাটির একপাটি জুতা ভদ্রলোকের পিঠে গিয়া পড়ে, (ইহা নূতন) এবং যেহেতু হিন্দুধর্ম্মে টলারেশন থাকিলেও অনেক হিন্দুর টলারেশন নাই, সেইহেতু অনতিবিলম্বে ভদ্রলোকের একপাটি জুতাও মহিলাটির পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া ধন্য হয় (ইহাও নূতন)। পাদুকা এবং পিঠ মিলিত হইয়া পাদ-পীঠ রচিত হয় কিনা আপনারা বলিতে পারেন, যেহেতু

আপনাদের অভিজ্ঞতা বহুমুখী—অন্তত বহির্মুখী ত বটেই, অপর পক্ষে আমাদের মত সাধারণ লোকের কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই চলে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনকে যদি অভিজ্ঞতা বলা যায় তাহা হইলে আমি যাহা বলিতে যাইতেছি তাহাও অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন।

আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, পাদুকাঘটিত ব্যাপারটি সম্বন্ধে কাহারও কোনো মতভেদ নাই, অর্থাৎ সকলেরই মতে উক্ত ঘটনা নিশ্চিত ঘটিয়াছিল; কিন্তু কি কারণে ঘটিয়াছিল ইহা লইয়া মতভেদ ঘটিয়াছে। কেহ বলেন, ভদ্রলোকটি বাস্-এর ঝাঁকানিতে হঠাৎ মহিলার গায়ের উপর পড়িয়া যান; কেহ বলেন ভদ্রলোক মহিলার গায়ে চুরুটের ছাই ভাঙিয়া তাহা ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে গিয়াছিলেন। প্রথমটি সত্য হইলে মহিলার কোনো অপরাধ নাই, অর্থাৎ যদি থাকে তাহা হইলে তিনি জড়-প্রকৃতির সঙ্গে সম-অপরাধী। প্রকৃতি এবং পুরুষ সম্পর্কে সাংখ্যের বর্ণনাটা যদি সত্য বলিয়া মানেন, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন, পাদুকার প্রতিদানে পাদুকা ব্যবহার করিয়া পুরুষ তাঁহার সাংখ্যকীর্ত্তিত উদাসীনতা ভঙ্গ করিয়াছেন। বাস্-এর ঝাঁকানি এবং পুরুষের পতন যেমন প্রকৃতিপ্রসূত, পুরুষের পৃষ্ঠে পাদুকাও তেমনি প্রকৃতিপ্রসূত। উভয়-ক্ষেত্রেই (অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রের মত দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও) পুরুষ যদি উদাসীন হইয়া থাকিতেন তাহা হইলে সাংখ্যের মর্য্যাদা রক্ষা হইত।

দ্বিতীয়টি সত্য হইলেও মহিলার দোষ নাই। সিগারেটের ছাই যদি কাহারো গায়ে গিয়া পড়ে তাহা হইলে ক্ষমা চাহিলেই চুকিয়া যায়। কিন্তু ছাই দেখিলেই যদি উড়াইতে ইচ্ছা হয়, যদি মনে পড়ে "যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে

পার অমূল্য রতন", তাহা হইলে ত তাহা প্রশংসার যোগ্য হয় না। পাশে বসিয়া যদি চুরুট খাইবার ধৃষ্টতা হয়, তাহা হইলেই যে গায়ে হাত দিবার ধৃষ্টতাটুকুও হইবেই এরূপ কোনো কথা নাই। কিন্তু ট্রামে বা বাস্-এ চুরুট খাওয়া আইনত বা সামাজিক প্রথাগত কোনো ধৃষ্টতা হয় না, তবে অপরিচিত মহিলার মুখে ধোঁয়া ছাড়িয়া চুরুট খাওয়াটা অশোভন হয়। কর্ম্মক্লান্ত ধূমপানঅভ্যস্ত পুরুষের পক্ষে ট্রামে বা বাস্-এ বসিয়া ধূমপান না করার মত সংযম না থাকাই স্বাভাবিক; সেক্ষেত্রে ট্রাম বা বাস্-এ মহিলার প্রবেশ তাহার নিকট একটা উৎপাত বলিয়াই মনে হয়। কোনো মহিলা আসিলেই আসন ছাড়িয়া দিতে হয়—ইহা যে শুধু বাহিরের ভদ্রতামাত্র তাহা নহে, কোনো মহিলা দাঁড়াইয়া আছেন এরূপ দৃশ্য উপবিষ্ট পুরুষের পক্ষে ঔদাসিন্যের সহিত সহ্য করা সম্ভব হয়না।

কিন্তু তথাপি মহিলাগণ ট্রামে বা বাস্-এ উঠিবেন কারণ না উঠিয়া উপায় নাই। বৃদ্ধের দল বা অনেক সময়ে কোনো কোনো যুবকও ইহা লইয়া মেয়েদের ঠাট্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু উপায় কি? মহিলারা সদাসর্ব্বদা ট্যাক্সিতে যাতায়াত করিবেন এরূপ অসঙ্গত বাসনা কোনো বৃদ্ধ বা যুবকের থাকিবে কেন? বাঙালী মেয়েরা অল্পদিন হইল বাহিরে চলাফেরা করিতে আরম্ভ করিয়াছে—এরূপ ব্যাপারে পুরুষেরাও অভ্যস্ত নহে, মেয়েরাও নহে। কাজেই সময়ে সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

অনেক গুণ্ডা, মেয়েদিগকে পথে ঘাটে অপমানিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে এবং সেরূপ ক্ষেত্রে মেয়েরা জুতার সদ্ব্যবহার দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে আছে। মেয়েদের এই বীরত্বের কাহিনী খবরের কাগজসমূহে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাইয়াছে। সুতরাং মেয়েদের ধারণা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা ঠিক ধারণা

যে গুণ্ডাদিগকে, বিশেষ করিয়া ভদ্রবেশধারী গুণ্ডাদিগকে জুতা মারিলে জব্দ করা যায়। উপরোক্ত ঘটনাটিরও মূলে হয়ত এইরূপ কোনো ধারণা ছিল। মহিলাটি হয়ত কিছুই অন্যায় করেন নাই। কিংবা হয়ত ভুল করিয়া অন্যায়ই করিয়াছেন। এই দুইটির একটি সত্য। কিন্তু আমি পুরুষের পক্ষ হইয়া ইহাই বলিতে চাই যে মহিলার গায়ে পুরুষের কোনো কারণেই হাত তোলা উচিত হয় নাই। এতদিন পুরুষের পিঠে ঝাঁটা পড়িয়াছে তথাপি পুরুষ প্রতিশোধ লয় নাই, এখন পুরুষই হাতের ঝাঁটা কাড়িয়া লইয়া পায়ে জুতা পরাইয়াছে। সুতরাং ঝাঁটার স্থানে যদি জুতার আদেশ হয় তাহা হইলে সামাজিক ব্যাকরণ উল্টাইয়া আমরা সে জুতা অমান্য করিব কেন? পুরুষটি যদি মনে করিতেন ঐ জুতা তাঁহাকে নহে তাঁহার ভিতরকার (কল্পিত?) গুণ্ডাকেই মারা হইতেছে, তাহা হইলে কি তাহাতে তিনি কিছুই সান্ত্বনা পাইতেন না?

কিন্তু বোধ হয় পাইতেন না। কেননা আমরা আমাদের অন্তরের পশুটাকে মারিতে চাহি না। তাহাকে কেহ জুতা মারুক ইহাও চাহি না। দেবতা যখন আমাদের পশুটাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন তখন আমরা বাজার হইতে পশু কিনিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছি, নিজের ভিতরকার পশুটাকে দিই নাই।

কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, এরূপ সামান্য কারণে এরূপ একটা কেলেঙ্কারী ঘটিবে ইহা কল্পনা করিতেও লজ্জিত হইতেছি। লজ্জা হইবারই কথা, কেননা এরূপ কোনো ঘটনাই ঘটে নাই, আমি সেই গাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। ইতি

শ্রীপরাশর শর্ম্মা

সাধু

ফাল্গুন সংখ্যার "কবি" ও এই সংখ্যার "সাধু" ও "শিল্পী" জনৈক ভ্রমণকারীর লেখা। লেখক পুরাতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্ব গবেষণা উপলক্ষে বিস্তারিত ভাবে ভারতভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি এই ভ্রমণসময়ে যে সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা বা ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাহার কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশ করিবেন।

শ. চি. স.

চায়ের দোকানে চা খাইতেছি, এমন সময়ে একজন প্রৌঢ় গেরুয়াধারী সাধু দোকানে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া এক কাপ চায়ের ফরমাস দিলেন। চা লইয়া একটি কৌটা হইতে প্রায় আধ ভরি আফিম বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। দেখিয়া বড় ভক্তি হইল। হাত যোড় করিয়া প্রভুকে নমস্কার করিলাম! সাধু-বাবা চোখ মুদিয়া ছিলেন, বোধ হয় দেখিতে পান নাই। আফিমের নেশাটি ঘোর হইয়া আসিলে নিজেই আলাপ আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "ভায়া, যা ভাবছ তা নয়। আগে এক ভরি করে খেতাম। গান্ধী মহাত্মা বারণ করেছেন, তাতেই ছ' আনায় দাঁড় করিয়েছি।"

সাধু-বাবার সঙ্গে আলাপ জমিয়া গেল। ক্রমে জানিলাম তাঁহার নাম বালাগিরি অঘোরী। উপযুক্ত লোক। ভারতবর্ষের বহুস্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া রং ঘোর তামাটে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্পত্তির মধ্যে একটি ঝুলিতে দুএক প্রস্থ কাপড়, মাথায় পাগড়ী, গায়ে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা এবং হাতে এক মোটা লাঠি। সেটি বড় প্রিয়। সহজে ছাড়েন না। ব্যবসায়, চিকিৎসা। চায়ের আড্ডায়, রাস্তায়, মন্দিরে যেখানেই একটি ভারী শিকার দেখিতে পান সেখানেই তাহাকে

বলেন, "তোমার অসুখ হইয়াছে।" সংসারের অধিকাংশ লোকই মনে করে তাহার শরীরে একটা না একটা ব্যাধি আছে; সাধুর মুখে সেই কথা শুনিয়া তাহাদের সহজেই প্রত্যয় হয়। তাহার পর পেস্তা, বাদাম, কিসমিস সহযোগে একটি উপাদেয় ঔষধ তৈয়ারী করিয়া সাধু তাহাদের খাইতে দেন। রোগীর শরীরের যে উপকার হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, সঙ্গে সঙ্গে বালাগিরির ঝুলিতেও কিছু আমদানী হয়।

লোকটির স্বভাব কিন্তু ভাল। সন্ধ্যা হইলেই সারাদিনের রোজগার খরচ করিয়া ফেলিত। গুরুর আদেশে রাতে হাতে পয়সা রাখা নাকি নিষেধ। চিকিৎসাবিদ্যার দ্বারা কোন দিন চার আনা, কোন দিন বা দুই টাকাও রোজগার করিত। তাহার সবটাই দান-ধ্যানে এবং আফিমের পিছনে রাত্রের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইত। আবার সকাল হইতে সাধুকে রোজগারের ভাবনা ভাবিতে হইত। বহুদিন অদ্ভভক্ষ্যোধনুর্গুণ অবস্থায় কাটাইয়া সংসারের লোকের উপর সাধুর কেমন একটা বাঁকা নজর হইয়া গিয়াছিল। সহজে তাহারা পয়সাকড়ি দিবে না, রোগ তাপের অছিলায় কিছু কামাইয়া লইতে হইবে, এইরূপ একটা বদ্ধ ধারণা সাধুর অন্তঃকরণে বহুবিধ দুঃখ ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। বালাগিরির সঙ্গে আলাপ হইবার দুচার দিনের মধ্যেই সে একদিন চুপি চুপি আমাদের বলিল, "ভায়া, তোমাদের কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। এমনি করেই খাই। সব শালাই এই রকম। তোমরা ভাই আর পিছনে লেগো না। অনেক ঘুরে এলুম, কিছুদিন স্বস্তিতে থাকতে দাও।"

বালাগিরি বেশ গল্প করিতে পারিত। বিশেষ করিয়া আফিমের নেশা যখন জমিয়া আসিত। একদিন মানস সরোবরের গল্প হইল। বালাগিরি বলিল, "সে কি বলবো ভাই। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

বহু কষ্টে ত' মানস-সরোবরে পৌছান গেল। যা ঠাণ্ডা! পায়ের আঙুল শীতে ফাটবার যোগাড় হয়েছে। কিন্তু কি করি, তীর্থস্নান ত করতেই হবে। মানসের জলে নেবে যাই ডুব দিয়েছি অমনি কানের ভিতর যেন একটা ভোঁ-করে আওয়াজ লেগে গেলো। মাথাটা ঘুরে গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে মাথা তুলে দেখি—জয় গুরু—কোথায় মানস সরোবরে চান করছিলাম, না একেবারে কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত।"

আমরাও বুঝিলাম গল্পের দফা আজ মাটি, আফিম বোধ হয় ছয় আনার জায়গায় দশ আনায় উঠিয়াছে। যাই হোক, এমনি করিয়া বালাগিরি রোজ রোজ একটা গল্প করিত। কবে কাবুলের বাদশা তাহাদের পনেরো জন সাধুকে রাজভোগ খাওয়াইয়াছিলেন, কেমন করিয়া অমরনাথে দুইটি শ্বেত পারাবত আকাশের দিক হইতে নিমেষের মধ্যে উড়িয়া আসিয়া পাথর হইয়া গেল, আবার গলিয়া জল হইল—এমনি সব প্রাকৃত, অপ্রাকৃত অনেক কিছু।

এমনি ভাবেই দিন যায়। একদিন সহরে এক নামজাদা সাধু আসিলেন। বিশ্বের গুরু না হইলেও তাঁর চেলা চামুণ্ডার সংখ্যা কম ছিল না। চামুণ্ডার চেয়ে চামুণ্ডীর সংখ্যাই বেশী। যাই হোক, আমরা ঠিক করিলাম সাধু-সঙ্গ করা ভাল। কিন্তু একা যাইতে ভরসা হইল না; কি জানি যদি একটা হাতাহাতি ব্যাপার হইয়া যায়। সঙ্গে একজন রাশভারি লোক থাকা প্রয়োজন। কাহাকেই বা লই! বালাগিরিকে বলিতেই রাজি হইয়া গেল।

মাথায় এক বিরাট পাগড়ী বাঁধিয়া, সন্ধ্যায় বালাগিরির আফিমের নেশাটি যখন বেশ ধরিয়াছে তখন আমরা দল বাঁধিয়া রওনা হইলাম। সাধুর দর্শন লাভ হইল বটে, কিন্তু তিনি হয়ত আমাদের কথাবার্তায় কিছু

ইঙ্গিত পাইয়া থাকিবেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা যতক্ষণ গুরুদেবের সহিত কথা বলিতেছিলাম, ততক্ষণ বালাগিরি চক্ষু মুদিয়া, স্থির ভাবে আসন করিয়া বসিয়া ছিল। গুরুদেব চলিয়া গেলে তাঁহার শিষ্যেরা আমাদের সহিত সাধন ভজনের গল্প আরম্ভ করিলেন। আমাদের চেয়ে বালাগিরির উপরেই তাঁহাদের সবিশেষ অনুরাগ দেখা গেল। কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু, কতদিন এই মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, এই সকল কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা বালাগিরিকে স্বীয় সাধনার ইতিহাস কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন।

বালাগিরি বরাবর চোখ মুদিয়া কাষ্ঠমূর্ত্তির মত বসিয়াছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "উঁট চরাতাম!" আমরাও কথাটার অর্থ প্রথমে ধরিতে পারি নাই। একটু ব্যাখ্যা করিতে বলায় বালাগিরি বিশদভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিল। বলিল, কানপুরের নিকট কোন অঘোরীর আশ্রমে সে প্রথমে শিষ্য হয়। তাহার পর সাধন ভজনের একটা পথ চাহিলে গুরু তাঁহাকে আশ্রমের উট চরাইতে বলিলেন। তখন বালাগিরি সাত বৎসর ধরিয়া খালি উটই চরাইল।

সভাস্থ সকলেই তখন গুঞ্জন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "অহো, কি গুরুভক্তি! এরূপ ধৈর্য্য না হইলে কি সাধনার পথে যাওয়া যায়?" যাহাই হউক, উটই চরান, আর ঘাসই কাটুন, আমরা আর কিছু আলাপ আপ্যায়নের পর বালাগিরিকে লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। পথে তাহাকে বলিলাম, "দাদা, করেছিলে কি? নেশার মাথায় আর কিছুক্ষণ জমালেই ওরা যে সব ধরে ফেলতো।" বালাগিরি বলিল, "ভায়া হে, ওরকম লোক ঢের দেখেছি। ওরাও মানুষ চরিয়ে খায়, আমি না হয় উট চরিয়ে খাই। তাতে তাদেরই বা কি, আমারই বা কি।"

এমনি ভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ক্রমে শীতের পর গ্রীষ্মকাল আসিয়া পড়িল। বালাগিরির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হইত। কখনও কোনও মৃগী-রোগীর চিকিৎসা করিতে যাইতেছে, কখনও বা বাতব্যাধির। যাই হোক, চৈত্রের শেষ নাগাদ সে বৎসর বদরিকাশ্রম যাইব স্থির করিলাম, বালাগিরি শুনিয়াই লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "ভাই, আর ভাল লাগে না। ঘেন্না ধরে গেছে। যত আহাম্মককে চরিয়ে খাওয়া আর পারা যায় না। চল এবার একবার মহাদেবের শ্রীচরণ দর্শন করে আসি। জয় গুরু।"

যাঁহা বলা তাঁহা কাজ। সঙ্গে লটবহর ত কিছুই নাই। সাধু আমাদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর বদরিকাশ্রমে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী সব সারিয়া কেমন একটা নেশার মত দাঁড়াইয়া গেল। সঙ্গের সাথীরা একে একে সবাই সঙ্গ ছাড়িলেন; কেহ বা দুই মাস, কেহ বা তিন মাসেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। রহিল কেবল বালাগিরি অঘোরী।

আমিও তখন কাপড়-চোপড় ময়লা হইবার ভয়ে গেরুয়া ধরিয়াছি। অল্প কাপড়েই চলিয়া যাইত; তাহার উপর আর একটা লাভও ছিল। যত্র তত্র ভোজনও জুটিয়া যাইত। শুইবার স্থানের ত বালাই নাই। আজ এ আখড়া, কাল ও গ্রাম! কোনদিন পাহাড়ে যাহারা ভেড়া চরায় তাহাদের সঙ্গে, কোনদিন বা নদীর ধারে কোনও হনুমানজীর মন্দিরে রাত কাটিয়া যাইত।

এমনি করিয়া এক বছরের উপর ঘুরিয়া গেল। কাটিতেছিলও ভাল। পথে আমরা জন ছয়েক নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গ পাইলাম। তাঁহারাও তীর্থে তীর্থে ঘোরেন, আমরা দুই বাঙালী প্রাণীও তাই। এদিকে বর্ষা নামিয়া আসিল, পথ চলাও ক্রমশঃ দুষ্কর হইয়া উঠিল। সেবার বর্ষার

প্রায় গোড়ার দিকেই আমরা জ্বালামুখী তীর্থের দিকে যাইতেছি, এমন সময়ে এক বিপদ ঘটিল। চারিদিকে অবিশ্রান্ত জলধারায় পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গল অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার উপর পাথরের গায়ে সবুজ শৈবালরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এমনি একটা পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিন আমি পা পিছলাইয়া প্রায় পনেরো হাত নীচে খাদে পড়িয়া গেলাম।

প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারি নাই। সমস্ত বোধশক্তি কেমন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। পাহাড়ের নীচে রহিয়াছি ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম। উপর হইতে লোকেরা আমাকে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে, ক্রমে পাগড়ী বাঁধিয়া নামিয়া আসিয়া আমাকে লইয়া গেল। সবই দেখিতেছিলাম, বুঝিতেছিলাম। কিন্তু ঘটনাটা যে আমাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিতেছে, ইহা ঠিক প্রত্যয় হইতেছিল না।

তাহার পর আর বহুদিনের কথা ভাল করিয়া মনে নাই। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম কুল্লুর হাঁসপাতালে শুইয়া আছি এবং পাশে সেই কয়েকজন নাগা সন্ন্যাসী ও বালাগিরি অঘোরী। বালাগিরির নিকট সব কথা শুনিলাম। কেমন করিয়া পাহাড়ী ওষুধ পত্র দিয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দীর্ঘ পনের দিন ধরিয়া সকলে আমাকে হাতে হাতে লইয়া আসিয়াছে, কেমন করিয়া দারুণ শীতের মধ্যে নাগারা নিজেদের সমস্ত কম্বল দিয়া আমার শুশ্রূষা করিয়াছে, নিজেরা সেঁকো-বিষ খাইয়া ঠাণ্ডা কাটাইয়াছে, এই সব কথা। এমনি করিয়া অবশেষে তাহারা কুল্লুর হাসপাতালে আমাকে আনিয়া ভর্ত্তি করিয়া দেয়। হাসপাতালের অধ্যক্ষদের সঙ্গে নাকি বালাগিরি কোম্পানীর ইতিমধ্যে তুমুল কলহ হইয়া গিয়াছিল। নাগারা যখন-তখন আসিত বলিয়া তাঁহারা আপত্তি করেন। তাহাতে নাগারা ডাক্তারদের চিমটা লইয়া তাড়া করিয়াছিল।

ফলে শেষে ব্যবস্থা হয় যে রোগীকে বারান্দায় রাখা হইবে ও নাগারা যখন তখন আসিতে পারিবে।

এমনি করিয়া দীর্ঘ তিন মাস হাঁসপাতালে কাটাইলাম। নাগারাও রোজ আসিত, বালাগিরি ত ছিলই। তাহার গল্পের কামাই ছিল না। হিমালয়ের সম্বন্ধে প্রাকৃত—অপ্রাকৃত কত গল্পই যে শুনিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। অবশেষে আরোগ্যলাভ করিয়া হাঁসপাতাল হইতে ছুটি পাইলাম। বালাগিরি ও নাগারা তখন কোথা হইতে পয়সা সংগ্রহ করিয়া আমাকে কলিকাতার একটি টিকিট কিনিয়া দিল ও সঙ্গে নগদ পাঁচটি টাকা দিল। সেই নাগাদের সঙ্গে শেষ দেখা। পথের মধ্যে তাহাদের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। কিন্তু কোনদিন তাহারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে আত্মীয় করিয়া লয় নাই। অবশেষে বিপদের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম ইহারা না জানাইয়াও আমাকে কিরূপ পরমাত্মীয় করিয়া লইয়াছে। বন্ধুর মত তাহাদের পাইয়াছিলাম বটে, গ্রীষ্মের পরে স্নিগ্ধ বারিধারার মতই তাহারা আমাকে শীতল করিয়া দিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু বর্ষা শেষের মেঘেরই মত তাহারা আবার নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বালাগিরিও তাই। তাহার সহিত আর একরকম দেখাও হয় নাই, হয়ত সেও সংসারের বহু লোকের মত আমাকে এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছে।

একেবারে যে দেখা হয় নাই তাহা নহে। কয়েক বৎসর পরে বোলপুরে একবার রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন দেখিতে গিয়াছি। বৈশাখের মাঝামাঝি। বোলপুর সহরের ভিতর একটি গঞ্জিকার দোকানে বালাগিরির মত এক ব্যক্তি কি কিনিতেছে দেখিলাম। প্রথমটা ঠিক চিনিতে পারি নাই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেছি, যেন আরও

কিছু বৃদ্ধ হইয়াছে, লাঠিটা কিন্তু বদল হইয়া গিয়াছে। আমি তাকাইয়া আছি দেখিয়া বলিল, "হাঁ বালাগিরিই বটে; ভায়া কোথা থেকে?" সাইক্ল্ হইতে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে রাত্রে শান্তিনিকেতনের পথে এক নাগা সন্ন্যাসীর মন্দিরে আড্ডা পড়িয়াছে। সন্ধ্যায় যাইব প্রতিশ্রুতি দিয়া বাজারে চলিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কিন্তু ভীষণ দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল। দারুণ ঝড়ের মধ্যে ঘন ঘন বজ্রপাত ও ভীষণ শিল পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাঠ সাদা হইয়া গেল। তেমন শিলপড়া কখন দেখি নাই। সে সন্ধ্যায় বালাগিরির সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। তার পরদিন সন্ধান করিয়া জানিলাম সাধু রাত্রেই চলিয়া গিয়াছে। কোথায় কেহ তাহা বলিতে পারিল না।

তাহার পরেও একবার হাবড়ায় যাইতে যাইতে হঠাৎ পুলের উপর মনে হইল বালাগিরি যাইতেছে; কিন্তু ঠিক কিনা বলিতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, সাধু যেমন আমার হৃদয়ে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে, তাহার প্রাণেও কি আমার কোনও স্থান নাই? হয়ত নাই। তাহার মনের উপর কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিতে পারিব এমন কোনও সুকৃতি আমি করি নাই। বহুদিনব্যাপী দারিদ্র্যদুঃখের ভিতর দিয়া সংসার তাহার মনে ভালবাসার সব রসটুকু নিঃশেষে শুকাইয়া দিয়াছিল। সেখানে কাহারও স্মৃতি যে দীর্ঘদিন বাসা বাঁধিতে পারিবে তাহা মনে হয় না। অথচ পরের বেগার খাটিতে বালাগিরির কখনও কামাই ছিল না। উপকার সে সকলের করিত বটে, কিন্তু রেলগাড়ী যেমন করিয়া যাত্রী বহিয়া লইয়া যায় তেমনি করিয়াই করিত। পরের তাহাতে যতই লাভ হউক না কেন, বালাগিরির নিজের তাহাতে কোন আনন্দও ছিল না, কিছু আপত্তিও ছিল না।

শিল্পী

পুরীতে সামান্য একটি পল্লীর মধ্যে কয়েকঘর পাথুরিয়া বাস করে। ইহারা এখন জগন্নাথদেবের ছোট ছোট মূর্ত্তি গড়িয়া যায়, অথবা ঘরবাড়ী তৈয়ারীর জন্য পাথর কাটিয়া দিনে বারো আনা চৌদ্দ আনা রোজগার করে। ইহাদেরই মধ্যে একজনের নাম ছিল রামমহারাণা।

অল্প বয়স, দেখিতে সুশ্রী, মাথার চুল লম্বা করিয়া রাখিত। গান গাহিতে ভাল বাসিত, একটু আধটু যাত্রাও করিত। রামের সহিত আমার পরিচয় হঠাৎ হইয়াছিল। কণারকের মন্দিরে একবার জনৈক সৌখীন ভদ্রলোক কিছু মূর্ত্তির নকল গড়াইবার জন্য রামকে সঙ্গে লইয়া যান। সেইখানেই রামের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। রামের হাতের দক্ষতা দেখিয়া খুব আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। নরুণের মত কয়েকটি যন্ত্র লইয়া আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত রাম অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি পাথরের ঢেলাকে সজীব করিয়া তুলিত। অথচ এ জিনিষের আদর ছিল না। লোকে হয় জগন্নাথের মূর্ত্তি চাহিত, নয়ত পুরীর মন্দিরে নরনারীর কামভাবের যে সকল মূর্ত্তি আছে, চুপি চুপি তাহারই প্রতিকৃতি গড়াইয়া লইত।

রামের কিছু অর্থাগম এই দিক দিয়া হইত। শিল্পশাস্ত্রের বিদ্যা আহরণ করিবার জন্য রামের বাড়ী প্রায়ই যাইতাম, এবং সেও আমাকে স্নেহ করিয়া দাদা বলিয়া ডাকিত। যতই আলাপ হইতে লাগিল ততই বুঝিলাম রাম যথার্থই একজন গুণী লোক। অশ্লীল মূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া খায় বটে, কিন্তু সে শুধু খাইতে পায়

বলিয়াই। নয়ত তাহার প্রাণ সত্য সত্যই শিল্পের জন্যই কাঙাল ছিল।

নিজে শিল্পীর ছেলে; ছোট বয়স হইতে ছেনি ও হাতুড়ী ধরিতে শিখিয়াছে, বাপ পিতামহ যেমন করিয়া পুরীর বা ভুবনেশ্বরের মন্দির রচনা করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই কৌশল বংশপরম্পরায় সেও কিছু শিখিয়াছে বটে; কিন্তু অন্যদেশের শিল্পের মধ্যেই যথার্থ যাহা সুন্দর তাহা সহজেই তাহাকে আকৃষ্ট করিত। একদিন বিলাতী কয়েকখানি মূর্ত্তির চিত্র দেখাইতেই রাম আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "দাদা আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে চল, আমি এইরকম মূর্ত্তি গড়া শিখব।" তাহাকে বলিলাম, তোমরা যে শিল্প জান, তাহাই বা কম কিসে? তুমি কেন পরের শিল্প শিখিবে? রাম দুঃখ করিয়া বলিল, "কেউ চায় না যে দাদা। দেখুন না বড় লোকেরা কতকগুলো খারাপ বিলাতী ছবি পাঁচ টাকা দিয়ে কিনবে, আর আমার মূর্ত্তি কেনার সময়ে দশ আনা দেবে কি, ন' আনা দেবে, এই নিয়ে ঝগড়া করবে। বলে ন' আনাই তোর ঢের, ও আর করতে কতক্ষণ সময় লেগেছে!"

রাম মহারাণার হৃদয়ে সমাজের এই তাচ্ছিল্য সর্ব্বদাই কাঁটার মত বিঁধিত। নিজের শিল্প যে ভাল, এবিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বিদেশী শিল্প যে খারাপ এমন ধারণা তাহার কোন দিন হয় নাই। কেবল সহরের ভদ্রলোকেরা দেশী বা বিদেশী শিল্পের বিন্দুবিসর্গ না বুঝিয়াও অতি খেলো ধরণের বিদেশী ছবি মহা আড়ম্বরের সহিত ঘরে টাঙাইয়া রাখিত, এইটাই সে বরদাস্ত করিতে পারিত না। বড় লোকদের উপর এইজন্য তাহার কেমন একটা রাগ হইয়া গিয়াছিল।

অথচ মানুষের ভালবাসার জন্ত ও একটু সম্মানের জন্ত রাম কতই না কাঙাল ছিল। একদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ী আসিয়া রাম হঠাৎ এক হারমনিয়ম চাহিয়া বসিল। কোথায় পাই? অবশেষে এক প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে হারমনিয়ম সংগ্রহ হইল এবং রাম সেই অন্ধকার সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া বহু গিটকারী সহযোগে নানাবিধ দুর্ব্বোধ্য তান আবৃত্তি করিয়া গেল। এমনি করিয়া, মাঝে মাঝে রামের উৎপাত সহ্য করিতে হইত।

কিন্তু ভদ্রসমাজে মিশিলেই ত ভদ্রলোকেরা খাইতে দেয় না। রামের অর্থাগমের চেষ্টা করা দরকার। কলিকাতায় কয়েকজন বন্ধু রামের গড়া মূর্ত্তি দেখিয়া তাহা কিনিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। রাম মূর্ত্তি গড়িয়া আমার কাছে রাখিয়া যাইত, আমিও সুযোগ বুঝিয়া বন্ধুবান্ধবদের ঘাড়ে তাহা চাপাইতাম। তবে আমদানী এমন করিয়া বেশী হইত না। কখনও বা হইত, কখনও বা এক পয়সাও জুটিত না। রামের কিন্তু উহার ফলে কাজের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সে ভুবনেশ্বরের পুরাতন মন্দিরের গায়ে যে সকল অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ও লতাপাতার সাজ আছে তাহারই প্রতিলিপি গড়িতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই আমার ঘরে একটা যাদুঘরের মত সামগ্রী জমিয়া উঠিল। রাম মাঝে মাঝে বলিত, "দাদা, হাতে কাজ এলে কিরকম মনে হয় জানেন? সমস্ত পুরী সহরটার ঘর বাড়ী যেখানে যা কিছু আছে, সব আমার কাজ দিয়ে ভরে দিতে পারি।" তাহার উৎসাহ দেখিয়া আমার ভালও লাগিত, দুঃখও হইত। কে বা ইহাদের আদর করিবে, কেই বা ইহাদের বাঁচাইয়া রাখিবে?

একদিন অপরাহ্নে ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি এমন সময়ে শুষ্ক মুখে রাম মহারাণা আসিয়া হাজির হইল। তাহার মুখ দেখিয়া

কেমন সন্দিগ্ধ হইলাম। কিছু না বলিয়া সে তাহার গড়া মূর্ত্তিগুলি ফিরিয়া চাহিল। তাহার দুএকদিন পূর্ব্বে রাম টাকার জন্য একবার আসিয়াছিল, কিন্তু কোন মূর্ত্তি বিক্রয় না হওয়ায় তাহাকে কিছু দিতে পারি নাই। আজ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হইল না। মূর্ত্তিগুলি ভিতরের আলমারী হইতে আনিয়া রামের হাতে দিলাম।

রাম নিঃশব্দে সেগুলি লইল, এবং পর মুহূর্ত্তেই মাটির উপর আছাড় দিয়া সেগুলি টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। তাহার পর সেগুলি কুড়াইয়া দূরে ফণীমনসার ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহার কাণ্ড দেখিয়া আমি কিছু বলিতে পারিলাম না; সেও যে-ভাবে আসিয়াছিল তেমনি ভাবেই ফিরিয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যার সময়ে রাম মহারাণার বাড়ী উপস্থিত হইলাম। দেখি সে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিবিষ্টমনে একটি মূর্ত্তি খোদাই করিতেছে। আমাকে দেখিয়া প্রথমে সে লজ্জায় কোন কথা বলে নাই। তারপর আমি যখন কালকার কাণ্ডটার কথা পাড়িলাম তখন সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ বাদে বুঝিতে পারিলাম কে তাহার এক ভাইকে কাজের জন্য কিছু টাকা দাদন দিয়াছিল; এবং সেই ব্যাপার লইয়া সে নাকি কাল তাহাকে অপমান করে। এই ব্যাপারে মর্ম্মাহত হইয়া সে নিজের সব মূর্ত্তিগুলি ভাঙিয়া দিয়াছে। দুঃখ করিয়া রাম বলিল, কেউ আমাদের কাজ চায় না। যে সিঁড়ির পাথর কাটে সেও বারো আনা পায়, আমি মূর্ত্তি গড়লেও বারো আনা পাই।" সেই দুঃখেই রাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। সমাজের কাছে কোন ভালবাসা, কোনো আদর সে পায় নাই। তাহার উপর রামের লোভ ছিল বটে, কিন্তু দেশের লোক তাহাকে খাইতে পর্য্যন্ত দেয় নাই। নিজের কথা ঠিক রাখিতে পারে

নাই বলিয়া, নিষ্ঠুরভাবে তাহারা বাড়ী বহিয়া অপমান পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছে।

সেই আমার রামের সঙ্গে শেষ দেখা। তাহার পর বহুদিন ভ্রমণের নেশায় দেশে দেশে ঘুরিয়াছি। কয়েক বৎসর পরে যখন পুনরায় ফিরিয়া গেলাম তখন শুনিলাম রাম মহারাণার মৃত্যু হইয়াছে। পাথুরিয়া-পল্লীর একজন কারিগরের কাছে শুনিলাম যে রাম উপর্য্যুপরি তিন দিন অনবরত গঞ্জিকা পান করিয়া একরকম আত্মহত্যাই করিয়াছে। রামের বাড়ীতে তাহার বিধবা স্ত্রী সকালে দাওয়ায় গোবর লেপিতেছিল, সে আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া প্রণাম করিল বটে, কিন্তু কি হইয়াছিল, একথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার আর কথা সরিল না।

ব্যাধি

বয়স আমার পঁচিশ—কেহ বলেন বয়সের দোষ, কেহ বলেন এ দেশেরই দোষ। আমি বাংলা দেশকে ভালবাসি—দেশের দোষ আমি দেখিতে পাই না। গরম দেশের দোষ দিলে ত সকলকে ইউরোপে গিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু সেখানেই কি লোকেরা সুখে আছে?

বন্ধু বলেন, বিবাহ করিলেই তোমার সব রোগ সারিয়া যাইবে। আমার রোগটা কি? আমার বাড়ির পাশে মুকুন্দ ঘোষ নাই তবুও আমি সমস্ত দিন সমস্ত আকাশ-বাতাসে একটি মৃদু সঙ্গীত শুনিতে

পাই। সে সঙ্গীতের কি শেষ নাই?—মনে হয় আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হইতেছে, আমার চেহারা উন্মাদের মত হইয়াছে—কিন্তু ভগবান যদি তাঁহার এই অনন্ত সৌন্দর্য্যভরা ধরণীর বুকে আমাকে পাঠাইলেন তাহা হইলে সঙ্গীতের শেষ দিলেন না কেন? যখন ভোরের প্রথম আলো আসিয়া ধরণীর শির চুম্বন করে তখন সমস্ত দেহমনে যে শিহরণ জাগে সে কি পুলক শিহরণ? মন কিছুতেই বসে না—আমার মনে হয়—কিন্তু স্পষ্ট করিয়া কি মনে হয় তাহা আমি নিজেই বুঝি না। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি না। পাশের বাড়িতে যে তরুণীটি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকে—তাহারই সঙ্গে আমিও রাত্রি জাগি। মনে হয় বিমলার সঙ্গে আমার জীবন এক সুরে বাঁধা। এমনি করিয়া আজ সুদীর্ঘ তিনমাস কাটিয়াছে। ব্যবধান মাত্র পঞ্চাশ হাত।—আমাদের পথ এক হইয়া কবে মিলিবে জানি না—কিন্তু আমাদের লক্ষ্য যে এক এবিষয়ে এখন আর আমার সন্দেহ নাই। মনে হয় এই পঞ্চাশ হাতের ব্যবধান আমাদের অনন্ত কালের ব্যবধান। এই পঞ্চাশ হাত প্রশস্ত নদীর দুই তীরে আমরা দুই যাত্রী ধীর স্থির গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিতেছি—মাঝখানে রহিয়াছে সামাজিক বিধি-বিধান নিষেধ-নিবৃত্তির অলঙ্ঘ্য বাধা। এই বাধা মধুর বাধা—ইহা অলঙ্ঘ্য বলিয়াই ইহাতে এত সুখ এত আনন্দ।

এখন রাত্রি তিনটা। করিবার কিছুই নাই, কিন্তু ভাবিবার অনেক আছে। বিমলাও ভাবিতেছে।—কিন্তু এই যে মাথা ঘুরিয়া উঠিল—ওঃ একি সমস্ত পৃথিবী আমার পায়ের নীচে হইতে সরিয়া যাইতেছে—সঙ্গীতের মৃদু গুঞ্জন কানের মধ্যে অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিল—আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না—ওঃ—

* * *

বেলা আটটায় ঘুম ভাঙিয়াছে। পাশে ডাক্তার বসিয়া। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, কুইনিন কাল ক'গ্রেন খেয়েছিলেন ? আমি বলিলাম, কেন, ত্রিশ গ্রেন, তাইত ব্যবস্থা ছিল !

—Singing in the ear কি এখনো চলছে ?

—হাঁ এখনো।

—তাহলে মাত্রা কমাতে হবে ; ও বাড়ির মিস্ বিমলাও বেশি কুইনিন সহ্য করতে পারছে না, আপনারই মত রাত জাগছে।

প্রসঙ্গ কথা

গতপূর্ব্ব মাসে আমরা পত্রিকাপ্রকাশে আশীর্ব্বাদ সংগ্রহের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল, যাঁহারা আশীর্ব্বাদ দেন তাঁহারা ভাল লেখা অন্যত্র বেচিয়া বিনামূল্যে আশীর্ব্বাদ দিয়া থাকেন। "উন্মোচন" নামক নবপ্রকাশিত মাসিকে অনেকগুলি আশীর্ব্বাদ দেখিয়া আমাদের উক্তরূপ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু উন্মোচন জানাইয়াছেন, এবং কিঞ্চিৎ গর্ব্বের সঙ্গেই জানাইয়াছেন যে তাঁহারা লেখা চাহিতে যান নাই, আশীর্ব্বাদই চাহিতে গিয়াছিলেন।

* * *

এ কথায় উন্মোচনকে প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না, কেননা উন্মোচন অন্য কিছুর পরিচয় না দিলেও হিন্দুত্বের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে লজ্জিত করিয়াছেন। এমন কি জিজ্ঞাসাও করিয়াছেন,

কোথাও যাত্রাকালে অথবা কোনো কার্য্যারম্ভে আমরা গুরুজনকে প্রণাম ইত্যাদি করি কিনা। আমাদের ইহার উত্তর দিবার উপায় নাই, কিন্তু উন্মোচনকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাঁহাদের গুরুস্থানীয় কাহারা এবং গুরুর সংখ্যা কত ?

*　　*　　*

তিনজন আশীর্ব্বাদকের নাম দেখিয়া এরূপ প্রশ্ন উঠিল। একজন ত স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "অবসর পেলে আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা কঠিন হবে না। ইতিমধ্যে আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।" এই শুভেচ্ছা (আশীর্ব্বাদেরই ভিন্নরূপ) প্রদানকারী "ইতিমধ্যে" শব্দটি ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া গিয়াছেন। ইঁহার কাছে অন্যকিছু নহে, লেখাই যে চাওয়া হইয়াছিল এবং তিনি তৎপরিবর্ত্তে "ইতিমধ্যে শুভেচ্ছা" দিয়াছেন আমরা এইরূপই ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এখন অবশ্য উন্মোচন সে কথা অস্বীকার করাতে আমরা লজ্জা অনুভব করিতেছি !

*　　*　　*

কিন্তু দুইজনের কাছে যে আশীর্ব্বাদ চাওয়া হইয়াছিল, এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের সন্দেহ নাই। সুতরাং জিজ্ঞাসা করি, উন্মোচনের গুরু কি বহুবচন ? আমরা কিন্তু গুরুবিষয়ে একবচনের সমর্থক, এবং এবিষয়ে আমাদের বচনও এক। অর্থাৎ আমরা বরাবর এই এক কথাই বলিব যে মাসিকপত্র পরিচালনে আশীর্ব্বাদের মহোৎসব আমরা পছন্দ করি না। কারণ বাংলাদেশে কাগজ-পরিচালনা ক্ষেত্রে উহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর (জেস্‌চার নহে) ম্যানারিজ্‌ম্‌-এ পর্য্যবেশিত হইয়াছে। যাঁহারা পছন্দ করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

*　　*　　*

সিনেমাগৃহ, কাপড়ের কল, কালীর কারখানা, প্রসাধন দ্রব্য, খাবারের দোকান প্রভৃতি যে-আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন-হিসাবে ব্যবহার করে, সাহিত্যবিষয়ক মাসিকপত্রও যদি সেই ব্যবসাদারি বিজ্ঞাপন "আশীর্ব্বাদ" নামে চালাইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাকে কি বলিব ? উন্মাদ রোগের ঔষধের সার্টিফিকেট এবং এই জাতীয় আশীর্ব্বাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য অন্তত আমাদের চোখে পড়ে না। বাংলাদেশে একই ধেনু হইতে যাবতীয় দ্রব্যের জন্য আশীর্ব্বাদ বা সার্টিফিকেট দোহন করা হইতেছে ইহা শুধু অশোভন নহে অসঙ্গত। কিন্তু ইহার অসঙ্গতি কাহারো চোখে পড়ে না। সার্টিফিকেটের মূল্য যে বর্ত্তমান বাজারে এক কানাকড়িও নহে, বরঞ্চ ইহা যে সর্ব্বত্রই একটা বিদ্রূপের বিষয়, সার্টিফিকেট বা আশীর্ব্বাদ-গ্রহণকারী তাহা দেখিতে পান না।

* * *

উন্মোচন আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন (এবং সম্ভবত নিজেদিগকেও এইরূপই বুঝাইয়াছেন) যে গুরুজনকে প্রণাম করা এবং আশীর্ব্বাদী-লেখা গ্রহণ করা এক। আমরা বুঝি বা না বুঝি তাঁহারা যদি এরূপ বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে সুখের বিষয়। হাতের চুলকানিকে যদি তাঁহাদের নিকট পায়ের ধূলা বলিয়াই মনে হয় তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

* * *

আশীর্ব্বাদ ও সার্টিফিকেট আমরা একই অর্থে ব্যবহার করিতেছি। কারণ এ দুইটাই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের মূল্য-নিরূপণ করিতে চাহিনা কিন্তু এই বিজ্ঞাপনকে যাঁহারা সেন্টিমেন্টের গন্ধ মাখাইয়া আশীর্ব্বাদ নামে চালাইতে চাহেন তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি সত্যই ইহার আধ্যাত্মিক মূল্যে বিশ্বাস করেন ?

* * *

আশীর্ব্বাদের কথা ছাড়িয়া বিশুদ্ধ সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে আসা যাউক। যাঁহারা আশীর্ব্বাদ দেওয়ায় উন্মুখ, তাঁহাদের লেখনী হইতে কি জাতীয় সার্টিফিকেট বাহির হয় তাহা প্রত্যেকরই একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। খাবারের দোকানের মিষ্টান্ন সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দেখিলাম। যিনি সার্টিফিকেট দিয়াছেন তিনি যদি উহাতে লিখিতেন "আমাকে আজ যে খাবারের নমুনাগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহা উৎকৃষ্ট।"—তাহা হইলে আর কিছু না হউক দেশ প্রতারণার হাত হইতে বাঁচিত। উপরোক্ত সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া পরদিন হইতে যদি ঐ দোকানদার ভেজাল খাদ্য বিক্রয় করিতে থাকে তখন কি আর সার্টিফায়ারের আর্কফলাটিও দৃষ্টিগোচর হইবে?

* * *

যিনি এই জাতীয় প্রশংসাপত্র লেখেন, তিনি নিজেও তাহার মূল্য বোঝেন, এবং এই সার্টিফিকেট লেখার মূলে কোন্ রিপু কাজ করে তাহাও আমরা বুঝি। কিন্তু ইহার হাত হইতে নিরীহ জনসাধারণকে বাঁচাইবার কোনো উপায় আমরা ভাবিয়া পাই না।

* * *

বৃদ্ধত্বের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ এবং সার্টিফিকেট দিবার প্রবৃত্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ব্যবসাদার সুযোগ বুঝিয়া এই জাতীয় গুরু-পদ-লোলুপ বৃদ্ধদের কাছে সার্টিফিকেট প্রার্থনা করে এবং বৃদ্ধদের দ্বারা সে প্রার্থনা অবিলম্বে পূরিত হয়।

* * *

সার্টিফিকেট দিবার লোভে রসিকের রসিকত্ব ঘুচিয়া যায়, বিবেচকের বিবেচনা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, এবং সকলের ঊর্দ্ধে গুরু বা উপদেষ্টারূপ উচ্চাসনে বসিবার আকাঙ্ক্ষা অতিশয় হীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই দলে নাম লিখাইয়াছেন। কিন্তু সার্টিফিকেট দিবার মত কি হাতের কাছে আর কিছুই ছিল না?

* * *

তাহা না থাকুক, অন্য কিছুর সার্টিফিকেট তিনি নাই দিলেন। কিন্তু যে বইখানা অসভ্য ইতরামি করিবার উদ্দেশ্যেই লিখিত যাহা ভদ্রলোকের স্পর্শের অযোগ্য এইরূপ বইএর প্রশংসাপত্র তিনি লিখিয়াছেন! যে বইতে "মাইরি দাঁড়িয়ে মুততে কি আরাম" জাতীয় ভাষায় লেখা তাহারই সার্টিফিকেট শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত হইতে বাহির হইল! তিনি ইহাতে ইনটেলেকচুয়াল touches দেখিতে পাইয়াছেন। Urinationএর ভিতর intellect কোথায় তাহা কেদারবাবু বুঝাইয়া দিবেন কি? যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে অন্তত সাহিত্যক্ষেত্রে এই জাতীয় খ্যাতিলোলুপ নির্লজ্জ বৃদ্ধদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া না চলিলে উপায় নাই।

* * *

কতকগুলি মোকদ্দমা লইয়া আমরা আলোচনা করি নাই কেন ইহা লইয়া অনেকে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছি। আলোচনাটি বিশেষ করিয়া শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের মোকদ্দমা-সম্পর্কে। আমরা নীরব থাকিবার জন্য নলিনীরঞ্জনের নিকট হইতে টাকা খাইয়াছি এবিষয়ে দেখিতেছি তাঁহাদের সন্দেহ নাই, কেবল কত টাকা খাইয়াছি, ইহা তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া জানেন না!

* * *

তাঁহারা যে দয়া করিয়া আমাদের সম্পর্কে এতটা ভাবিয়াছেন সে জন্য আমরা বিশেষ আনন্দিত, কিন্তু আমাদের প্রতি মমতাবশত নলিনীরঞ্জনের প্রতি তাঁহারা একটু অবিচার করিয়াছেন। ইহা কেন

করিলেন তাহা বুঝিনা। কেন তাঁহারা দয়া করিয়া মনে করিলেন যে নলিনীরঞ্জন অত্যন্ত নির্ব্বোধ ? যে সংবাদ খবরের কাগজের কৃপায় বাংলার ঘরে ঘরে, ভারতের সর্ব্বত্র এবং ভারতের বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছে, সেই সংবাদ পাছে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশ হয় ইহাই কি নলিনীরঞ্জনের একমাত্র ভয় ?

* * *

শনিবারের চিঠি সম্বন্ধে আলোচনাকারীদের যে অন্ধভক্তি আছে সেজন্য আমরা মনে মনে অবশ্যই পুলক অনুভব করি, কিন্তু ভক্তির মাত্রা বেশি হইয়া পড়িলে অনেক সময় ভক্তিভাজনকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় বলিয়াই সেই ভক্তিতে একটু আঘাত দিলাম ; আশা করি তৎসত্ত্বেও আমাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশ্বাস অবিচলিত থাকিবে। আমরা এখনো মনে করি, আলোচনাকারীগণ যদি নলিনীরঞ্জনের মেয়রের পদপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত জীবনী আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারেন যে তিনি (তাঁহারা যতটা মনে করেন) ততটা নির্ব্বোধ নহেন, তাহা হইলে তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে বাজারে টাকা হঠাৎ খুব শস্তা হইয়া উঠে নাই, এবং শনিবারের চিঠির বৈশিষ্ট্যও ঠিক আছে।

আব একটি কথা। একটি সৎকার্য্য, তাহাও পয়সা না খাইয়া করা যায় না, এরূপ কল্পনা পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি করিতে পারে তাহার নাম বাঙালী জাতি।

বিড়াল ইঁদুরে কয়, "ভয় কিরে ধন
তোদের বাঁচাব মোরা, তোরা হরিজন।"

প্রতিবাদের ফলাফল

অবশেষে গোয়ালন্দ!

বাষ্পীয় শকট থেকে নামা গেল; কুলিরা ভীড় জমাল। অর্দ্ধ মাইল দূরে, ঘাটে—বাষ্পীয় পোত হুঙ্কার দিচ্ছে, সুট্‌কেস্ হাতে নিয়ে ছুটি ষ্টীমারের দিকে।

*　　　　*　　　　*

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে স্মরণ করলাম আমার রমণীকে। সে আর কারো নয়; নিতান্ত আমার—আমার বান্ধবী, সঙ্গী, সখী, পরামর্শ-দাত্রী। এ যুগেও সে লাল শাঁখা পরে, হাতের নোয়া সোনা দিয়ে বাঁধায় না। তার হাত লিকলিকে নয়—সে 'লভেব' নয়। কাউকে সে উৎসাহ দেয় না—অনেক সময় আমাকেও না। সাহিত্য-রসিকা হলেও সাহিত্য পথের কাঁটার ভয় শ্রীমতীর আছে। আসবার সময় মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিল,—

"যমনার বাটে তুমি যেয়ো না যেয়ো না
উয়ারিতে কারো বাড়ি খেয়ো না খেয়ো না।"

তার সেই মিনতি-ছলছল চোখ মনে পড়লো। তার কালো ডাগর চোখ আমিই শুধু দেখেছি—লোকে যা বলে বলুক। মনে মনে কবিতার আবেগ এল,—

দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।

*　　　　*　　　　*

বন্ধুর বাড়ীতেই ওঠা গেল। বন্ধু আধুনিক হলেও সেকেলে-সাহিত্যিক সুতরাং কি করে পদ্মাপারের মাটিতে সজীব আছেন—তাই

ভাবি। ও মাটিতে কেউ ছোঁয়াচে রোগের হাত থেকে বাঁচতে পারে? যাক্‌গে। প্রেয়সীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেই রম্‌না ও উয়ারীর মাঠে বাটে বন্ধুর সঙ্গে বেড়ালাম—ঢাকেশ্বরী মাকে দর্শন করলাম—করজোড়ে প্রার্থনা করলাম,—"মা! মা!" ইত্যাদি।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়, কৈ এপর্য্যন্ত কিছুই আমার নজরে পড়্‌লো না। তবে—তবে?

বন্ধু বললেন—"পুলিস পার্কগুলোর দ্বার সমস্ত দিন রাত্রি বন্ধ রাখে, তা না হলে—।" ধন্য পুলিস!

* * *

তবু ভরিল না চিত্ত।

বন্ধুসহ গৃহে ফেরা গেল চা পানের জন্য; বৈঠক্‌খানা ততক্ষণ জম্‌জম্‌ করছে। বন্ধু আমাকে সবার সঙ্গে 'ইণ্ট্রোডিউস' করে দিলে।

সে দিনের বাজারে 'কাউঠার' দাম বেশী কি কম ছিল এই থেকে আরম্ভ করে আলোচনা 'cultural conquest of East Bengal"এ এসে পৌছল যখন, তখন ঘরটার গরম ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট নিশ্চয় হয়েছিল, কারণ অট্টহাসি ও বক্তৃতার শব্দতরঙ্গ যেরকম প্রচণ্ড ভাবে ইথার-সমুদ্রে আলোড়িত হচ্ছিল—তাতে আকাশে রেডিও-চাঞ্চল্য না হয়ে যায়নি। অর্থাৎ যা ভাবছেন আপনারা ঠিক তাই—lungs থাকেতো পদ্মাপারের লোকেরই আছে।

বন্ধু ও আমি প্রায় নির্ব্বাক—মাঝে মাঝে হাঁ-হুঁ-করছি আর ভাবছি এরা শুধু যে মনুষ্য তা নয়, প্রভিনশিয়াল্‌ও বটে।

একজন, যার মস্তিষ্কের ঔজ্জ্বল্য তার মূর্ত্তিতেই প্রকাশ, যা বল্‌লে তার তাৎপর্য্য এই যে পদ্মাপারের লোকেরা বাংলার মাড়োয়ারী। আমি বললাম—সেটাতো গেল কমার্‌শ্যাল্‌ কন্‌কোয়েষ্ট।

জবাব হ'ল—"ঐ একই কথা মশয় !"

তারপর যে বক্তৃতা সুরু হল তার মর্ম্মকথা এই যে, আজ যদি কল্‌কাতায় পূর্ব্ববঙ্গের লোক না থাকতো তবে দেশের সাহিত্য কোথায় থাকতো !—কোথায় বিজ্ঞান ? কোথায় দর্শন ? কল্‌কাতার 'কাল্‌চারাল্ লাইফ্' পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে !

ওঁদের কথার তাৎপর্য্যটা আমি দিলাম, ভাষা দিতে পারলাম না ; সেজন্য আমি লজ্জিত। কি করবো—ঠিক বুঝতে পারলাম না—বোঝবার মধ্যে কেবল "মশয়" আর "ছ্যাখ্‌তেয়াছেন্," কিন্তু তাতে রস-বোধের অভাব হয়নি।

বক্তৃতা চলেইছে—বিষয়, বঙ্গ সাহিত্য ও ভাষা ; বক্তা বললেন, কিন্তু কি বললেন ? তাঁর কথার তাৎপর্য্য এই যে পদ্মাপারের মাটিতেই প্রথম বঙ্গ সাহিত্যের উৎপত্তি এবং প্রসার, অতএব ভাষা সম্বন্ধে একটা ''র‍্যাডিকল্ চেন্‌জ্য'' আনতে হলে তাতে একমাত্র তাঁদের অধিকার। আমি প্রতিবাদ করে বললাম—কিন্তু কি বললাম কিছুই মনে নেই—প্রতিবাদ করার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না।

তিনমাস পরে মেডিক্যাল স্কুল হাঁসপাতাল থেকে বেরুলাম। একখানা হাতে কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার হয়েছিল, হাতখানা স্বাভাবিক ভাবে জোড়া লাগেনি, বেঁকে আছে। পা দুখানা ঠিক আছে ; এখন ওরই উপর ভরসা। একা এসেছিলাম, সস্ত্রীক ফিরে চলেছি—

* * *

আবার সেই গোয়ালন্দ ! বাষ্পীয় পোত থেকে নামা গেল ; কুলীরা আগেই ভীড় জমিয়েছে—অর্দ্ধমাইল দূরে বাষ্পীয় শকট বাঁশী বাজাচ্ছে—স্ত্রীকে নিয়ে ছুটি গাড়ির দিকে—এবারে মালপত্র কুলির মাথায়।

—প্রসেন

———

নামানি

সে যেন সঞ্চিত ধন অদৃষ্ট যক্ষের !
পুত্র যেন তৃতীয় পক্ষের
বৃদ্ধ বিধাতার।
সুতরাং তার
দেশ যেন স্বর্গভূমি। যদিও তা মর্ত্ত্যেতে বিরাজে,
ধন ধান্য পুষ্পে ভরা বসুন্ধরা মাঝে
শ্রেষ্ঠতম তবু তাহা ;
বুলবুল, পিউ-কাঁহা,
পিক, দহিয়াল,
কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিয়া বকুল, পিয়াল,
হারায়ে সম্বিৎ,
ক্রমাগত গাহিছে সঙ্গীত !
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি
ক্রমাগত পুষ্প 'পরে পড়িতেছে ঢলি
কিছু না মানিয়া
আশ্চর্য্য ! অভূতপূর্ব্ব !—কবিকণ্ঠ কহে বাখানিয়া
মাতৃবক্ষে সে দেশেতে বিশেষ করিয়া
স্নেহ দিয়াছেন বিধি ভরিয়া ভরিয়া !
সে দেশের ভাই,
নাহি তারো কোনো তুলনাই !

সে দেশের নদীনদ সাপ ছুছুন্দর
সমস্ত সুন্দর !
তা লয়ে 'কোরাস্' ধরি উদ্বেলিত হৃদয়ে উদ্বাহু
ভগ্ন-কণ্ঠ হল কত শর্ম্মা, সেন, সাহু !
বিশীর্ণ যদিও দেহ—কিন্তু ওগো সেই অনুপাতে
অন্তর যে পূর্ণ তার নানা অজুহাতে !
চক্ষু দিয়া গ্রাস করে ছাপার অক্ষরে
এবং বিশ্বাস করি পায় সে মোক্ষরে
মানে সে 'মোক্ষম্'
ম্যালেরিয়া, T.B. দেহে, মন তার নহে ত অক্ষম !
বিচিত্র সাধনা !
লক্ষ্মীরে কামনা করে ভারতীর করি' আরাধনা,
ভারতীও অপরূপা, সাদাসিধা নহে বীণাপাণি,
নহে তা, কমল-বন-বাণী ।
হস্তে নাহি বীণা ;
ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি তার—মাথামুণ্ড হীনা !
আপন শোণিত পিয়া
তাথিয়া তাথিয়া
নৃত্য করে উন্মাদিনী ; তারি চারি পাশে
লক্ষ্মীরে কামনা করি ভারতীর অর্ঘ্য বহি আসে
মুগ্ধ লুব্ধ ভক্তবৃন্দ যত
আবৃত্তি করিয়া নিত্য পুঁথিগত মন্ত্র শত শত !
নাহি তার মহিমার সীমা
জানে তাহা যে কোনো পিসীমা !

'মেকলে' পারেনি তাহা কিছুতে কমাতে
মিস্ মেয়ো, পারেনি দমাতে!
সঙ্গে সঙ্গে উত্তর সে করিয়া প্রদান
করেছে প্রমাণ
তাহারা মহজ্জাতি!—আর্য্য-গর্ব্ব উত্তরাধিকারী
সাক্ষী তার আছে সারি সারি
অতীতের বনিয়াদে পোঁতা
সকলের থোঁতা মুখ হয়ে গেছে ভোঁতা!
অন্তরে ঐশ্বর্য্য তার—বাহিরে সে যদিও কাঙালী!
নাম কি বাঙালী?

* *

সে যেন সাঁতারু বীর নিতান্ত নির্ভীক
অপার জলধি বক্ষে সাঁতারিয়া চলিয়াছে ঠিক্।
চলিয়াছে সোজা
পৃষ্ঠে বহি গুরুতর বোঝা
বিরাট সংসার!
ছেলে মেয়ে বউ বোন মাসি, পিসি, সব সারে সার
সানন্দে বসিয়া আছে দুলায়ে চরণ,
সাঁতারু চলেছে সোজা তুচ্ছ করি জীবন মরণ!
কেহ তার দেয়না রেহাই!
আসে রোগ, আসে 'বিল', আসেন বেহাই
মাঝে মাঝে নামে অকস্মাৎ
মনিবের রুদ্র পদাঘাত।
নামে বারম্বার

যুযুধান্ রুষ্টা প্রিয়ার
তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ;
কোন দিকে নাহি দিয়া কান
উত্তাল তরঙ্গমালা, গর্জ্জমান মহাঝঞ্ঝাবাত
না করিয়া কিছু দৃক্‌পাত
সাঁতারু চলেছে সোজা—মুখে নাহি বাণী।
নাম কি কেরানী?

*　　*

যে মালা পরায় প্রিয়া নিজ প্রিয়তমে
সোহাগে সরমে,
সে মালার
সেই মালাকার।
অন্তরালে থাকি নিজে দুইখানি অচেনা অন্তর
পরিচয় বন্ধনেতে বাঁধে নিরন্তর!
যেন সে 'হাইফেন'
কবি ও কাগজ মাঝে, যেন 'ফাউনটেন'!
একের মনের বার্ত্তা অপরের বুকে
বহি আনে সুখে!
শুষ্ক ভূগোলেতে যেন যোজক, প্রণালী,
যুক্ত করি চলিয়াছে খালি
দেশে দেশে, সাগরে সাগরে
ক্রেতা আর বিক্রেতায়; নাগরী, নাগরে!
যদি আসে কাছে
মনে হবে. আছে আছে আছে

এ জগতে আছে একজন
যার কাছে খোলা চলে মন !
আকাশের চাঁদ পেড়ে দিতে পারে হাতে
যদি পায় তাতে
কিছু কমিশন !
সবুজে করিতে পারে অনায়াসে লাল !
নাম কি দালাল ?

* *

তবু চাই তাকে
করিতে পারে না কিছু তবু তারে ডাকে !
আছে ইতিহাস :
বহু অর্থ করিয়া বিনাশ,
বহু লজ্জা, বহু ঘৃণা, বহু প্রেম করিয়া হজম ;
দিবা নিশি করি বহু শ্রম
লভিল সে যাহা,
কি যে বস্তু তাহা
বলিল না কখনো খুলিয়া !
রহস্যের আবরণ দিয়া
আপনারে রাখিল ঢাকিয়া !
সতত সবার চিত্ত উৎসুক সদাই
বলে, 'তাকে চাই !'
গল্প যেন প্রকাশ্য ক্রমশঃ,
আমসি আচার যেন যতবারই চোষ
কিছুতেই [illegible] হয় নাক'.

কিছু হইলেই তাই বলে তারে, "ডাকো !"
এবং ডাকিলে সেও আইসে ছুটিয়া
প্রাপ্য তার টাকা কটি নিয়া,
লিখে যায় চালায়ে কলম
সার্টিফিকেট কভু, কখনো বা মিকশ্চার, মলম,
উঁচু করি বিজ্ঞ নাক তার
—নাম কি ডাক্তার ?

* *

পৃথিবী যে রঙ্গমঞ্চ—একথা সে বুঝেছে প্রচুর
ইংরেজ-বিদ্বেষী আজ, কল্য তাই রায়-বাহাদুর !
নিত্য নব অভিনয় সখ
রাম বা রাবণ কভু, কভু মন্ত্রী, কভু বিদূষক !
সে যেন বুঝেছে ভূমা
উচ্চ-নীচ, ভাল মন্দ, চড়্ কিম্বা চুমা
আসল নকল
তার কাছে সমান সকল ।
কিন্তু নয় আইনষ্টাইন
(যদিও সে নানাবিধ জ্ঞানের 'মাইন')
ভেদ-বুদ্ধি আছে কিছু চিতে ।
টাকাতে ও খোলামকুচিতে
আছে যে তফাৎ
সে কথাটা ভুলিতে সে পারে না হঠাৎ ।
'মাইনাস্' ওইটুকু সমদৃষ্টি সব তাতে তা'র
সত্য মিথ্যা তার কাছে স্পষ্ট একাকার ।

মিথ্যা, প্লাস্ কিছু টাকা, হ'য়ে যায় সত্যের সমান ;
নিত্য তাহা করিছে প্রমাণ।
কভু হস্ত জোড় করি কখনও বা উচাইয়া কিল
—নাম কি উকীল ?

* *

প্রিয়ার নয়ন কোণে যেন সে পিঁচুটি !
কারণ বিছুটি
লাগায়েছে মকর-কেতন,
অথচ পকেটে নাই তেমন বেতন !
নাই সেই রজত-নিক্কণি
যার জোরে হওয়া যায় নয়নের মণি
কোন রমণীর !
কিম্বা যদি—বীর
হইত সে, যৌবনের আবেগে অধীর,
আনিত লুণ্ঠন করি কোন রূপসীর
সমস্ত হৃদয় !
কিন্তু হায়, বিধাতা নিদয়।
দেহ তার কিছুতেই হলনা সবল,
লম্বা চুল, জুলফি, গোঁফ ব্যর্থ সকল !
ফ্রয়েডি মুখস্থ বুলি হল অনর্থক
ভেজেনা তাহাতে চিপিটক !
তাই
পিঁচুটির মত আছে লাগিয়া সদাই
কিছুতে না দমে'
বার বার পুছে ফেলে—পুন এসে জমে
যৌবনের 'প্যারডি' সে, অথচ করুণ,
নাম কি তরুণ ?

"বনফুল"

———

পেডিগ্রী মেয়ার

(মেয়র নহে)

মনটা ভাল ছিল না। থাকিবার কথাও নয়।

কর্পোরেশনে একটি চাকরীর জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। ভিতরে সংবাদ লইয়া জানিয়াছিলাম—প্রার্থীদের মধ্যে আমারই যোগ্যতা সকলের চেয়ে বেশী, এবং একথা বিভাগীয় কর্ত্তাও স্বীকার করিয়াছেন। অতএব দীর্ঘদিনের বেকার জীবিকার অবসান ঘটিল মনে করিয়া মনে মনে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

কিন্তু হইল না। শুনিলাম সার্ভিস-কমিটিতে ডাক্তার রায় বলিয়াছেন—"অবনত জাতিদের প্রতি আমরা যুগ যুগ ধরিয়া যে অত্যাচার করিয়াছি—তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। তাহাদের দাবীই সর্ব্বাগ্রগণ্য হইবে। অপর প্রার্থীর যোগ্যতা যেমনই হউক—"

অতএব প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইল।

মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। প্রায় লাগিয়া গিয়াছিল—সামান্যের জন্য ফস্কাইয়া গেল। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চাপিয়া বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিতে লাগিলাম—বিজ্ঞানের সাহায্যে আধুনিক যুগে মানুষ এত কাণ্ড করিতেছে—অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল,—আলকেমি, টেলিভিসন, রেডিও, ডেথ-রে, এমনকি মৃতের পুনর্জ্জীবন দানের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন দাবী করিতেছে;—আর জন্মিবার পূর্ব্বেই মানুষ যাহাতে ইচ্ছামত জাতি বা বংশ বাছিয়া লইতে পারে—মাত্র এইটুকুর ব্যবস্থা বিজ্ঞান করিতে পারে না? স্থির করিলাম—

এ বিষয়ে স্যর অলিভার লজের সহিত অবিলম্বে পত্রালাপ করিতে হইবে।

সহরতলির স্বল্পালোকিত পথে অন্যমনস্কভাবে চলিতেছিলাম। একবার মনে হইল—এ বড় অন্যায়, উচ্চবর্ণে জন্মিয়াছি, মাত্র এই অপরাধে যোগ্যতা সত্ত্বেও আমার দাবী উপেক্ষিত হইবে? তা' ছাড়া বেকার যুবকের সংখ্যা ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ—একথাও তো সেন্‌সাস্ রিপোর্টেই প্রকাশ। তবে—? মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম—হয়ত ইহাই ঠিক্; সমগ্র জাতির কল্যাণের জন্য দেশপূজ্য নেতাগণ এই যে অভিনব ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহাকে নত শিরে মানিয়া লওয়াই উচিত। বৃহত্তর মানব সমাজের মঙ্গলের নিকট ব্যক্তিগত বা শ্রেণীবিশেষের সুবিধা অসুবিধার কথা উঠিতেই পারে না। যাঁহারা বিরাট ভারতীয় জাতির মুক্তিযজ্ঞের হোতা তোমার আমার কথা ভাবিবারই বা তাঁহাদের অবসর কোথায়? মহামানবতার যে রূপ তাঁহারা ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সেখানে জাতি, শ্রেণী বা ব্যষ্টির স্থান থাকিতে পারে না।

মেথর বস্তির কাছে আসিয়া চিন্তায় বাধা পড়িল। একটা কলরব হইতেছে। দেখিলাম দশবারোটি ছেলের চারিদিকে পঁচিশ ত্রিশ জন মেথর জড় হইয়াছে। ছেলেদের মধ্যে একজন হাতমুখ নাড়িয়া তাদের কি বুঝাইতেছে। তাহারা কিছু বুঝিতেছে কিনা বোঝা যাইতেছে না; কিন্তু বেশ একটা চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। কাছে গিয়া দেখিলাম—বক্তা আর কেহ নয়, আমাদের গণেশ। আমাকে দেখিয়াই বলিল—"এইযে দাদা, আপনি এসে পড়েচেন ভালই হয়েছে। এদের একটু বুঝিয়ে দিন তো—"। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাহার শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশের মুখেই অবিশ্বাসের হাসি। বুঝিলাম,

গণেশ যাহা বলিতেছে—তাহা ইহারা তামাসা মনে করিয়াছে। বলিলাম- "গণেশবাবু, ব্যাপার কি? থিয়েটারের রিহার্সাল ছেড়ে তোমরা এতগুলি মূর্ত্তি মেথর-বস্তিতে জুটেছ কেন?"

গণেশকে আমাদের ওদিকে সকলেই চেনে। সে নন্‌কোঅপারেশ-নের সময় কলেজ ছাড়িয়াছে; সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সে কন্‌ট্রাব্যাণ্ড সল্ট. বিক্রয় করিয়াছে। পাড়ার ছেলেরা তাহাকে একটা অবতার-বিশেষ মনে করে। অনুমান করিলাম, এবার হরিজনের পালা। সে বলিল—"সেই কথাই তো এতক্ষণ এদের বোঝাচ্ছিলুম। কালথেকে সকালে এদের বদলে আমরা বাঁক নিয়ে ময়লা সাফ করতে বেরুব। তা' এরা বিশ্বাস করচে না; এটা যে জাতির মঙ্গলের জন্যে কত প্রয়োজন—সে তো আপনি জানেন। তাই আমরা ঠিক করেচি।—"।

গণেশ অনেক সময়েই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা বলে; কিন্তু তাহার এ কথায় আমি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলাম। হঠাৎ ইহাদের ময়লা সাফ করিবার প্রয়োজন ঘটিল কিসে? বলিলাম—"গণেশ বাবু, একটু বুঝিয়ে বল। তোমরা ভদ্রলোকের ছেলেরা হঠাৎ ময়লা সাফ করতে যাবে—ব্যাপার কি? আর তোমরা তা' পারবেই বা কেন? এরা বংশানুক্রমে সে কাজ করে আসছে—এরাই তা পারে।"

একজন বৃদ্ধ মেথর আমার কথা সমর্থন করিয়া বলিল—'বলুন তো বাবু। বাবুর নেখা পড়া শিকে মাথা খারাপ হয়েচে। এ কাজ আপনাদের করতে দিলে আমাদের পাপ হবে না?"

গণেশ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল—"এই করেই জাতটার সর্ব্বনাশ হতে বসেছে। যুগ যুগান্তর ধরে আমরা এই পদদলিত নিপীড়িত মানুষগুলির ওপরে যে অমানুষিক অত্যাচার করে এসেছি—

তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতেই হবে ;—নইলে নিস্তার নেই। আর তা সুরুও হয়ে গিয়েছে। মহাত্মাজীতো বলেইছেন—বিহারের ভূমিকম্প হরিজনদের প্রতি অত্যাচারেরই ফল—"।

ব্যাপারটা কতকটা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সবটা পরিষ্কার হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তা প্রায়শ্চিত্তটা কি রকম করতে চাও?"

গণেশ তখনো শান্ত হয় নাই। বলিল—"কেন, সে তো দাশগুপ্ত মশায়ই পথ দেখিয়ে দিয়েচেন। যে উচ্চবর্ণ এতদিন এদের অস্পৃশ্য করে রেখেছিল—তাদেরই নেমে আসতে হবে এদের কাজে। তাইতো আমরা ঠিক করেছি—কাল থেকে আমরাই এদের বদলে ময়লা সাফ করতে বেরুব।।

আমি অন্য ছেলেগুলির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আর তোমরা—তোমরাও সকলেই তাই করবে স্থির করেছ?" তাহারা সমস্বরে জানাইল—তাহারা সকলেই এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। জাতির কলঙ্ক প্রক্ষালন করিতে যদি এইটুকুই তাহারা করিতে না পারিল, তবে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে কেন?

আমরও সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিল। যাহা হউক একটা প্রশ্ন মনে জাগিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তা গণেশবাবু, উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকেরাই যদি মেথরদের কাজ করে দেয়—তবে ওরা করবে কি? ওদেরও তো একটা কাজ চাই?"

গণেশ বোধ হয় এ কথাটা একেবারেই ভাবে নাই। একটু থতমত খাইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ জোরের সহিত বলিল—"তা জানি নে; জানবার প্রয়োজনও নেই। আমাদের দীর্ঘ দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ যদি ওরা আমাদের দেয়—তা' হলেই আমরা ওদের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ থাকবো। প্রয়োজন ওদের চেয়ে আমা-

দেরই বেশী। ভেবে দেখুন জগৎ জুড়ে একটা কতবড় সাড়া পড়ে যাবে—"।

বৃদ্ধ মেথর সহাস্তে কহিল—"তাইতে বলি, খবরের কাগজে নাম উঠবে—তার লেগেই—"

গণেশ তখনো থামে নাই। "সে যাই হোক দাদা আপনাকেও আমাদের দলে চাই। আপনাকে নইলে চলবে না।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। সভয়ে বলিলাম—"না না গণেশবাবু আমি না,—আমায় বাদ দিয়ে—"

গণেশ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া বলিল—"আপনারা জাত নিয়েই গেলেন। ভুলে যাবেন না—কালের চক্র ঘুরে গিয়েছে। আপনারা উচ্চবর্ণেরা সব সুখ সুবিধা ভোগকরে এদের ওপর এতদিন যে অত্যাচার করে এসেছেন, সমাজ ব্যবস্থায় যে ভার-বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতিকার না করলে নিস্তার নেই; তাই পাল্লা বদল করতেই হবে। আপনাদের জায়গা এদের ছেড়ে দিয়ে, এদের জায়গা নিতে হবে আপনাদের। তা ছাড়া জাতির মুক্তির অন্য পন্থা নেই।"

তাইতো! সমাজ-ব্যবস্থায় ভার-বৈষম্য ঘটিয়াছে—একথাটাতো ভাবিয়া দেখি নাই! মুগ্ধ হইয়া গেলাম। নাঃ, ছোকরা কলেজ ছাড়িয়া দিলে কি হইবে। বোঝে অনেক জিনিষ; বলে আরও ভালো।···

কিন্তু তাই বলিয়া এই কাজে আমাকে নামাইতে চায়? সর্ব্বনাশ আর কি! সবিনয়ে কহিলাম—"ভাই গণেশ বাবু, তুমি যা বললে—তা তোমারই উপযুক্ত কথা। কিন্তু ভাই, আমার শরীরটা তত ভালো নয়, এই ঠাণ্ডায় ভোরে উঠে তোমাদের দলে যোগ দিতে পারবো না। কিছু মনে কোরো না।"

গণেশ অবজ্ঞার সহিত হাসিল। বলিল "আপনাদের কর্ম্ম নয় সে আমি আগেই জানতুম। তাই বলে আমাদের টলাতে পারবেন মনে করবেন না। আমাদের ব্রত আমরা একলাই—"

আর একটা বক্তৃতার দমক আসিতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলাম। দূর হইতে পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, গণেশ পূর্ব্ববৎ আবার হাতমুখ নাড়িয়া বক্তৃতা সুরু করিয়াছে। তাহার সঙ্গীর দল মাঝে মাঝে উচ্চস্বরে সমর্থন করিতেছে—এবং তাহার শ্রোতৃবর্গ সহাস্যে মাথা নাড়িতেছে। সহসা অনুভব করিলাম—ইহাদেরই জন্ম সার্থক! দেশের কাজতো করিতেছে ইহারাই। কোনোও প্রকার কর্ম্মেই ঘৃণা নাই, কোনো প্রকার ত্যাগেই পশ্চাৎপদ নয়।

সশ্রদ্ধ চিত্তে এই তরুণ দলের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও আদর্শের কথাই ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিয়াছিলাম। সমাজের বিভিন্ন স্তরে উচ্চবর্ণের সৃষ্ট কর্ম্ম বিভাগের দ্বারা যে ভার-বৈষম্য ঘটিয়াছে, তরুণ ভারত তাহার সমাধান করিবেই। গণেশ ঠিকই বলিয়াছে। সমাজের দাঁড়িপাল্লায় বাটখারা বদল করিতেই হইবে। আমাদের স্থান উহাদের দিয়া উহাদের স্থান আমাদের লইতে হইবে। তবেই জাতির মুক্তি! কিন্তু—

সহাস সুর কাটিয়া গেল। তাই তো! একি হইল? ইহাতেই বৈষম্যের সমাধান হইবে কি করিয়া? দুই পাল্লার বাটখারা পাল্টাইয়া দিলেই ভারসাম্য ঘটিবে কি? যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ইহারা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—তাহাইতো উল্টাদিকে আরও প্রবল ভাবে প্রকট হইবে। তাহাকে ঠেকাইবে কি করিয়া? তা' ছাড়া—বংশানুক্রমে যে যে-কাজ করিয়া আসিতেছে—তাহাদের সেই বিষয়ে একটা জন্মগত সংস্কার কি জন্মায় নাই? এ'কথা তো—

চিন্তায় বাধা পড়িল। সম্মুখেই মিষ্টার নন্দীর বৈঠকখানা হইতে

যুগপৎ উজ্জ্বল আলো ও সতেজ কলরব চক্ষে ও কর্ণে প্রতিহত হইল। আড্ডা বেশ পুরা দস্তুর জমিয়াছে। মনমরা ভাবটা কাটাইয়া লইবার জন্য ঢুকিয়া পড়িলাম।

মিষ্টার নন্দী চমৎকার লোক। এক সময়ে বিলাত যাইবার কথা হইয়াছিল, সেই অবধি বাড়ীতে ঢিলা পায়জামা পরেন, এবং সকলকেই 'মিষ্টার—অমুক' বলিয়া সম্বোধন করেন। কালচার্ড লোক, হাই সার্কেলে মেলামেশাও আছে। লোকে বলে ঘোড়দৌড়ে তাঁহার টিপ্‌স্ অবার্থ। এইজন্য, কেবল যে কালচার-অভিলাষী পাড়ার অনেকেই তাঁহার ড্রয়িং রুমে সমবেত হন—তাহা নয়; আরও নানান ধরণের লোকেরই সমাগম হয়। আমাকে দেখিয়া খুসী হইয়া বলিলেন—"আসুন, আসুন, মিষ্টার শর্ম্মা! তারপর, কি খবর? হল কিছু?"

আরো অনেকেই এ প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ,—কি হল?—কি হল বলুন তো?

এতক্ষণ ভুলিয়া ছিলাম। শুভানুধ্যায়ীগণ অজ্ঞাতসারে বেদনার স্থানটিতেই আঘাত করিলেন। শুষ্ক হাসিয়া কহিলাম—"হল না; আমি যথেষ্ট নীচু জাতের নই।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। ও পাশে ঘোড়া সম্বন্ধে কি একটা আলোচনা চলিতেছিল—তাহাও থামিয়া গেল। মিনিট দুই পরে মিষ্টার নন্দী মুখ হইতে সিগার নামাইয়া বলিলেন—"ভেরি সরি; আপনার হ'লে আমরা সকলেই খুসী হতুম। কিন্তু মিষ্টার শর্ম্মা, কিছু মনে করবেন না,—এ আপনাদেরই যুগযুগান্তর সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণেরা চিরদিন ধরে যে—।"

এই কথাটাই আরো দুইবার আজই শুনিয়াছি। বাল্যকালে এক সহপাঠীর অজ্ঞাতসারে তাঁহার টিফিন-বক্সের খাবার খাইয়া সেটি

আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছিলাম, এবং সে আমাকে সন্দেহ করিলে—প্রবলভাবে অস্বীকার করিয়াছিলাম। ইহা ব্যতীত আর কোনও পাপ করিয়াছি—স্মরণ হইল না। সবিনয়ে কহিলাম—"এ কথাটা আজকে আরও দুবার শুনেচি। কিন্তু পাপটা কি করেচি স্মরণ হচ্চে না। ভারতীয় সভ্যতায় যদি গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ হয়েই থাকে, তাতে ব্রাহ্মণদের বিশেষ করে অপরাধ কি? আর তারাই কি ভারতের ভাব-সাধনার ধারা উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করবার ভার গ্রহণ করে নি? এ রকম জাতিভেদ তো ভালো, এর চেয়ে খারাপ জাতিভেদ যে জগতে আর্থিক বৈষম্যের জন্য হচ্চে, চামড়ার রঙের পার্থক্যের জন্যে হচ্চে, তার কি?"

মিষ্টার নন্দী হাসিলেন। "সেই মামুলি যুক্তি। মিষ্টার শর্ম্মা, ও সব দেশে একটা মুচির ছেলেও রক্‌ফেলার হবার স্বপ্ন দেখে। পারে আপনার দেশের মেথর কাল বামুন হয়ে যাবার স্বপ্ন দেখতে? তা ছাড়া—"

গণেশ ইতিমধ্যে আসিয়া জুটিয়াছিল। সে বলিল—"সব ঠিক ক'রে এলাম।—হ্যাঁ তা ছাড়া চিরদিন এদের বঞ্চিত করে এসেছেন; এদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে এসেছেন; আর নিজেরা সব সুখ সুবিধা ভোগ করে এসেছেন। দেখুন না, যে অপরাধে অপরের কঠিন শাস্তি হত, সেই অপরাধেই ব্রাহ্মণের শাস্তি হতই না,—না হয়ত খুব লঘু শাস্তি হত। এ বিষয়ে ইংরেজের আদালত আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েচে। সেখানে ব্রাহ্মণ, শূদ্র সব সমান।"

গণেশকে দেখিয়াই ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম;—বুঝি আবার পাকড়াও করিতে আসিয়াছে। ভয়ে ভয়েই বলিলাম—"গণেশবাবু সেটা ব্রাহ্মণদের একারই কি দোষ? জগতের সর্ব্বত্রই চিরকালই

যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে—তারা একটু সুবিধা ভোগ করে নেয়ই। পয়সাওয়ালা লোকও কত সময়েই তো শাস্তি এড়িয়ে যায়—কিম্বা কম শাস্তি পায়। ও কথা নয়। অনেক প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে ভারতীয় সভ্যতায় বিদ্যা আর জ্ঞানের বিশিষ্ট ধারাটিতো ব্রাহ্মণেরাই সযত্নে বাঁচিয়ে রেখে এসেচে। তাদের তো আমি বেশী অপরাধ দেখি নে। একটু গোঁড়ামি তাদের করতেই হয়েচে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে টিঁকে থাকতে হলে—"

মিষ্টার নন্দী মুখ হইতে সিগার নামাইয়া বলিলেন—"সে কথা আমি অস্বীকার করচিনে। কর্ম্মগত, বা অবস্থাগত জাতিভেদ একটা জগতে আছে; এবং চিরদিনই মানুষ সমাজে থাকবে। পৃথক কর্ম্ম এবং পৃথক জীবনযাত্রা-প্রণালী মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডীতে আবদ্ধ করবে—একথা বুঝতে পারি। যদি এমন হত যে বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম ইত্যাদির চর্চ্চা যাঁরাই করবেন—তাঁরাই ব্রাহ্মণ হবেন—তা হলে আপত্তির বেশী কিছু ছিল না। কিন্তু তাঁরাই যে বিদ্যা, জ্ঞান ইত্যাদি একচেটিয়া করে রাখবেন—এর চেয়ে অন্যায় এবং অবিচার আর কি হতে পারে। তারপরে, এই জাতিভেদ যখন জন্মগত হয়ে দাঁড়াল—তখনি হল সর্ব্বনাশের বীজ বপন। ব্রাহ্মণের ছেলেই ব্রাহ্মণ হবে, আর শূদ্রের ছেলে চিরকালই শূদ্র থাকবে—এই ব্যবস্থা করেই আপনারা শুধু নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারলেন না; জাতিটাকেও ডোবালেন। আজকে যদি আমরা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, তবে আর যাই করুন—আপনাদের ওপর অবিচার হচ্চে বলে কাঁদবেন না। আপনারা যা করেছেন—তার প্রতিক্রিয়া এত সহজেই এড়িয়ে যাবেন—ভাববেন না।"

মিষ্টার নন্দী পুনরায় সিগারটা মুখে তুলিলেন। আমার সহসা

কথা যোগাইল না। একটু ভাবিয়া বলিলাম—কিন্তু মিষ্টার নন্দী, প্রাচীন ভারতে অনেক নীচু জাতও কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছেন দেখতে পাই। ব্যাসদেব জাবালি,—"

নন্দী হাসিলেন। বলিলেন—"ও সব পুরাণের কথা ছেড়ে দিন। ওর ঐতিহাসিকতা কোথায় ?"

অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করিতে বাধিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম—"ঐতিহাসিক যুগেও হয়ত এমন দু একটা হয়েছে মনে পড়ছে না। তা ছাড়া আরও একটা বিষয়ও লক্ষ্য করবার যে ঐতিহাসিক যুগেও ভারতীয় ভাব-সাধনার মূর্ত্ত প্রতীক যাঁরা—উচ্চ বর্ণের মধ্যে তাঁদের আবির্ভাব যেমন দেখতে পাই—শঙ্কর, বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্যদেব—"

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। গণেশ বাধা দিয়া সবিদ্রূপে কহিল—"আপনি সুবিধামত ভুলে যাচ্চেন দাদা, যে তথাকথিত নীচু জাতের ওপরে ওঠবার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই নষ্ট করা হত। যে রামচন্দ্র আদর্শ রাজা—তিনিও বেদপাঠের অপরাধে শূদ্রদের শিরশ্চেদ করেছিলেন!"

এতটুক হইয়া গেলাম। ছিঃ, ছিঃ, সত্যইতো! আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী, সর্ব্বোপরি আদর্শ প্রজারঞ্জক রাজা—রামচন্দ্র—তিনি গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়াছিলেন,—শবরীর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন নাই—তিনিই যখন এমন এমন কাণ্ড করিতে পারিয়াছেন—তখন—

নাঃ গণেশের কাছে হার স্বীকার করিতেই হইতেছে। আর কিছুই বলিবার মুখ রহিল না। মনটা বড়ই ছোট হইয়া গেল।

মিষ্টার নন্দী দাঁতে সিগার চাপিয়া সদয় কণ্ঠে কহিলেন—"যাকগে,

এসব কথা তুলে আপনার মনে আর কষ্ট দিতে চাইনে। বিশেষতঃ এই অবস্থায়। তারপরে, কি করবেন ঠিক করেচেন—বলুন। কোনো একটা দিক দিয়ে কিছু অর্থাগম হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।”

নিজের দুর্দ্দশার কথা আবার মনে পড়িয়া গেল। হতাশ ভাবে বলিলাম—“দেখতেই তো পাচ্চেন ; কোনো দিকেই কিছু সুবিধা করে উঠতে পারছি না। অদৃষ্টে না থাকলে—।

নন্দী টেবিলের উপরে রেসিং গাইড, রেস টিপ্‌স্ প্রভৃতির পুস্তিকাগুলি দুই একবার নাড়াচাড়া করিয়া কহিলেন—“অদৃষ্ট অদৃষ্ট করচেন——Have you ever tried your luck ? চলুন, কাল ভাইস্‌রয়েস্ কাপে ব্লুমফিল্ডের ওপর কিছু টাকা winএ ধরুন। অল্প কিছুই ধরবেন। It’s a sure tip. ব্লুমফিল্ডের দিদিমা ১৯০৭এ ডার্ব্বি সুইপ নিয়েছিল। She is a pedigree mare,”

নির্জ্জন প্রসুপ্ত পল্লীপথে চলিতে চলিতে আবার মনে সংশয় ঘনাইয়া আসে। সমস্ত ভুলিয়া যাই। দধীচি, বাল্মীকি, বেদব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, মনু, বশিষ্ঠের সহিত অন্ধকার ভেদ করিয়া পরবর্ত্তী যুগের বুদ্ধ, মহাবীর কৌটিল্য, শঙ্কর, চৈতন্য, তুলসীদাস, কাশীরাম ভীড় করিয়া আসে।··· আরও পরে, আধুনিক কালে, সাম্য স্বাধীনতার যুগে···রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ···ব্রাহ্মণ বঙ্কিম, ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর, ভূদেব, রবীন্দ্রনাথ···

দূর হউক ছাই ! কিছু অর্থাগমের উপায় না করিতে পারিলে আর চলিতেছে না। সপরিবারে অনশনে মরিতে হইবে। নাঃ, অদৃষ্টটা একবার যাচাই করিতেই হইবে। মায়ের রুলি দুগাছা বাঁধা দিয়া গোটা কুড়ি টাকা ব্লুম ফিল্ডের উপর ধরিবই। মিষ্টার নন্দীর ভুল হইবার কথা নয়। ঠিক টিপই দিয়াছেন। She is a pedigree mare !

শ্রী-কান্ত

২য় পর্ব্ব

১

সেদিন কচুরি-বাইএর চোখের জলে জীবনের যে অধ্যায়টি পরিসমাপ্ত করিয়াছিলাম—আজ যে আবার তাহারই জের টানিয়া জীর্ণ কাঁথায় তালি লাগাইতে হইবে—একথা তখন ভাবি নাই। তালি লাগাইতে বসিয়া তাই আজ ভাবিতেছি, বার বার এই ছেঁড়া কাঁথা সবার সমুখে নাড়াচাড়া করিয়া কি লাভ হইয়াছে? ইহার দুর্গন্ধে যদি অপরের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া থাকে তাহার জন্যই বা দায়ী কে? কিন্তু এ প্রশ্ন যতই গুরুতর হোক এবং ইহার মীমাংসার ভার যাহারই উপর থাক আমার যে ইহা ব্যতীত আর উপায় ছিল না—সে কথা অন্য যে কোন ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইত যদি তিনি—তিনি না হইয়া আমি হইতেন। কিন্তু যাক সে কথা।

আজ মনে পড়ে জীবনটার মধ্যস্থলে যেন কে গুঁতা মারিয়া দুই ফাঁক করিয়া দিয়াছিল। ফাঁকের একদিকে ছিল আমার আহার বিহার আমোদ প্রমোদ এবং আমি, অপরদিকে ছিল আমার আধি ব্যাধি জরা মৃত্যু এবং কচুরি। অর্থাৎ আমার সুখের দিনে সে যেখানেই থাক, যাহা ইচ্ছা করুক, আমার অবস্থা শোচনীয় হইলেও সে নাচের মুজরা ছাড়িয়া আপনিই ছুটিয়া আসিবে যমের পথ আগলাইতে—তা সে খবর পাক আর নাই পাক। জীবনটা একপ্রকার নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে কাটিতেছিল। খাওয়া-শোওয়ার বাদবিচার ছিল না, বাড়াবাড়ি হইলেই মনে হইত

আমার কচুরি আছে। তাই এখন ভাবি, হায় কচুরি! সেদিন তোমার বিগত যৌবনটার উপর এতখানি আস্থা না রাখিয়া যদি একেবারে সেই রাধামাধবের চির-যৌবন চতুষ্পদে আশ্রয় লইতাম, তবে আজ কিন্তু যাক সে কথা।

কোথাও যেন আর ঘর-বার আপন-পর রহিল না। মনে হইল, ঐযে খেংরাপটীর বড় বড় কাপড়ের আড়ত—ওখানকার মাড়োয়ারী বণিকরা আমার প্রিয়তম, আর ট্রামরাস্তার দুইধারে যত বারান্দাওয়ালা বাড়ী—ওখানে যাহারা থাকে তাহারাও আমার প্রিয়তমা। যেখানে ইচ্ছা ঢুকিয়া পড়িতে পারি, কেহই গলা·ধাক্কা দিবে না, ঢুকিবামাত্র জামাই-আদর সুরু করিবে। ক্রমশ এককচুরি লক্ষকচুরির রূপে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। আমি যে প্রতি মুহূর্ত্তে খাইতেছি, শুইতেছি ও হাঁটিতেছি—দোতলার ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ইহলীলা সাঙ্গ করিতেছি না—তাহাও ওই সংখ্যাতীত কচুরিগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া। তাই সেদিন তাহাদের ভাগ্য-পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মেছোবাজার রাস্তার মোড়ে একপেট তেলে-ভাজা জিলিপী খাইয়া পথের ধারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম এবং ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে জ্ঞান হইবামাত্র পরিচর্য্যারত হরিজনটিকে কচুরিভ্রমে জড়াইয়া ধরিলাম।

হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া বুঝিলাম জিলিপীর সহিত আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি সবই বাহির হইয়া গিয়াছে। শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে বউবাজারের মোড় পর্য্যন্ত আসিয়া ক্লান্তিবশতঃ একটি সরবতের দোকানের সম্মুখে বরফের টবের উপর বসিয়া পড়িয়াছিলাম এবং মেরুদণ্ডের তলদেশ হইতে শীর্ষ অবধি একটি উর্দ্ধগামী শৈত্যের দুর্জ্জয় প্রকোপে মাথার সম্পূর্ণ ঘি-টা কুলপির মত জমিয়া গিয়াছিল। তাহার পর যে কি ঘটিয়াছিল তাহাও কিছুমাত্র স্মরণ নাই, তবে বোধকরি হঠাৎ

এক সময় বৈঠকখানা বাজারে বর্ম্মা-চালানী একপাল ভেড়ার খাঁচার মধ্যে কোনক্রমে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম। কতদিন যাবৎ মা মা করিয়া কাতরকণ্ঠে তাহাকে ডাকিয়াছিলাম—তাহাও মনে পড়ে না। যখন চৈতন্ত ফিরিয়া পাইলাম—দেখি সেই পিঁজরার মধ্যে জাহাজের ডেকের উপর তিনটি মেষ-শাবকের সহিত তাহাদের মাতার বাঁটে মুখ লাগাইয়া দুগ্ধ-পান করিতেছি,—জাহাজ তখন মাঝ-সমুদ্রে ভাসিতেছে। কতক্ষণ এইভাবে কাটিত বলা যায় না, কিন্তু মেষমাতা পিছনের পা-দু'টি আমার ললাটে ছুঁড়িয়া মারিতে অহল্যার পাষাণ-জন্ম ঘুচিল। স্তন্য-দায়িনীর পদধূলি মস্তকে বহন করিয়া যখন খাঁচার বাহিরে আসিলাম—তখন সন্ধ্যা আসন্ন। আকাশে মেঘের সমারোহ ঘোর হইয়া উঠিতেছে, সমুদ্র নিস্পন্দ নিশ্চল। প্রকৃতির থমথমে ভাব দেখিলে মনে হয় ঝড় উঠিল বলিয়া।

এ অবস্থায় কি করা উচিত দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতেছি এমন সময় জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল এবং একজন মোল্লা খালাসী দৌড়িয়া আসিয়া আমার গলদেশ ধারণ করিয়া কহিল—আরে কোর্ত্তা নীচে যাও, ছাইক্লোন হোতি পারে। মেষদুগ্ধ পান করিয়া আর মুখ মোছা হয় নাই, ঠোঁট দুইটা চট চট করিতেছিল। মোল্লাসাহেবের জামার আস্তিনে মুখটা মুছিয়া লইলাম, কিন্তু তাহাতেই বোধ করি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হইল। বিকট মুখ-ভঙ্গির সহিত এক ধাক্কা এবং একেবারে সিঁড়ির নীচে।

নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইয়া যে বস্তুটির উপর পড়িলাম তাহা একটি রসগোল্লার হাঁড়ি, তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া চতুর্দ্দিকে রস গড়াইয়া পড়িল। হাড়ির কাণাটা দক্ষিণ পদে আটকাইয়া গেল—তাহা ঝাড়িয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে পার্শ্বের কাপড়ের গাঁঠটি দুইবাহু দিয়া সবলে চাপিয়া ধরিলাম,

কিন্তু ধরিয়া বুঝিতে পারিলাম তাহা একটি স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোক—কাপড়ের গাঁঠ নহে। এদিকে রসগোল্লার হাঁড়ি কামড়াইয়া ধরিয়াছে, আশ্রয় ত্যাগ করিবারও উপায় নাই, অগত্যা স্ত্রীলোকটিকে কোনো উপায়ে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

পার্শ্বের লোকটি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"টগর তোর নাগরটিকে নিয়ে একটু সরে দাঁড়া না ভাই, বড্ড ভ্যাড়ার গন্ধ উঠছে যে, একে ত তোর গন্ধেই ভূত পালায়;—একেবারে মাৎ করে দিলি যে।"

টগর বজ্রনির্ঘোষে ধমক দিয়া উঠিল; তাহাতে আমিও থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলাম এবং হলফ করিয়া বলিতে পারি না, তখনই বস্ত্রে ভীতিজনিত কোনরূপ প্রক্রিয়া করিয়া ফেলিয়াছিলাম কি না। যাই হোক, শুনিতে পাইলাম আমার আশ্রয়দাত্রী ভয়াবহ স্বরে কহিতেছে—

"খবরদার নন্দ মিস্তিরী, মুখ সামলে কথা কও বলছি। তুমি আমার সাতপাকের বর নয় যে ধম্‌কে কথা কইবে। ভদ্দরলোকের ছেলে বিপদে পড়ে ধরে ফেলেছে—তার হয়েছে কি শুনি? তুই সেদিন রাত্তিরবেলা শেয়ালের ডাক শুনে আমার বগলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলি কেন? তখন গন্ধ লাগেনি? এবার যদি গায়ের কাছে ঘেঁসেছে কোনদিন, লাথিমেরে মুখ ভোঁতা করে দেব। ছোটলোকের জন্ম কিনা!"

নন্দ মিস্ত্রীর পাল্টা জবাব আসিল—খবরদার শালী, বাপ তুলে কথা বলবি যদি তোরই একদিন কি আমারই একদিন।"

তাহার পর গজকচ্ছপের যুদ্ধ। আমি সর্ব্বক্ষণ গিরি-গোবর্দ্ধনের আড়ালে ব্রজবাসীর মত টগরের পশ্চাতে ঝুলিতে লাগিলাম এবং যে

সাইক্লোন আসিবার সম্ভাবনায় জাহাজসুদ্ধ লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহারই একটি ছোটখাটো সংস্করণ আমার মাথার উপর বহিয়া যাইতেছে অনুভব করিলাম। একজন কাবুলিওয়ালা এতক্ষণ আমার জুতার নিষ্পিষ্ট রসগোল্লাগুলির সৎকার করিতেছিল, এই মহাসমরের রণবাদ্যে তাহার সীমান্ত-সৌর্য্য জাগিয়া উঠিল। টগর ও নন্দ যখন উভয়ে পরিশ্রান্ত এবং নন্দ পরাজিতপ্রায়, সীমান্তের মিত্র-শক্তি নন্দের পক্ষে যোগদান করিল। তাহার এক প্যাঁচেই টগর আমাকে পশ্চাতে লইয়া চিৎ হইয়া পড়িল—যথা ঘটোৎকচ কৌরব সমরে। এইবার ঠ্যালাটি বুঝিতে পারিলাম। দোতলা বাসের নীচে চাপা পড়িয়া ব্যাঙের কি অবস্থা হয় তাহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন *; টগরাচ্ছন্ন মনপ্রাণ এইটুকু নিঃসন্দেহে বুঝিতেছিল যে—শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, ইষ্টনাম জপ করিবার সময় নাই। কিন্তু মিত্র-শক্তির বোধ হয় অনুকম্পা হইল, এতক্ষণ কালীঘাটের ছিন্ন-শির পাঠার ন্যায় আমার অসহায় পদদ্বয় টগরবপুর সানুপ্রান্তে নির্গত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহারই একটি ধারণ করিয়া সে আমার চ্যাপ্টা দেহটিকে টানিয়া বাহির করিল এবং অবলীলাক্রমে সিঁড়ির পথে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া দিল। ডেকের উপর কিছুক্ষণ মূঢ় অবস্থায় কাটিল। মনে হইল নিশ্চয় আমার নাড়িভুঁড়ি নির্গত হইয়া গিয়াছে, শত চেষ্টাতেও আর বাঁচিব না, কিন্তু পোড়া প্রাণ যদি এত সহজেই যাইত, বাংলার পাঠকসমাজ অনেক যন্ত্রণার হাত হইতে রেহাই পাইতেন। কিন্তু যাক্ সে কথা।

সমুদ্রের বাতাসে অর্দ্ধমৃত বৃশ্চিকের মত বাঁচিয়া উঠিলাম এবং

---

* আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। —শ. চি. স.

হামাগুড়ি দিয়া সেই খাঁচার উপর চাপিয়া বসিলাম। পাছে ঝড়ে উড়িয়া যাই এই ভয়ে কাছাটি খাঁচার হাতলে বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইলাম এবং প্রতিমুহূর্ত্তে সাইক্লোন মহাপ্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রভুকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, শুনিয়াছিলাম তাঁহার কৃপায় জলচর খেচরে, খেচর জলচরে, এবং উভচর ত্রিচরে পরিণত হয়। অতএব আমিও যে শীঘ্রই এ তিন ভুবনের সৃষ্টি রহস্য ভেদ করিব তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিলাম।

প্রভুর নাকি অনিষ্ট ঘটাইবার শক্তি অসীম। অতএব একবার দেখিতে বাসনা হইল। আমার এতগুলি বাঁকের উপর আর কতগুলি বাঁক তিনি ধরাইতে পারেন। আজ এই জাহাজ-ডুবির বিশ হাজার বছর পরে সমুদ্রাপসরণের ফলে যখন ডাঙায় উঠিব এবং কোন বিখ্যাত যাদুঘরের কাঠের ফ্রেমে বাঁধা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিব, দেখিতে চাই তখনকার প্রাত্নতত্ত্বিকরা আমাকে কোন জন্তুর পর্য্যায়ে স্থান দেয়—অক্টোপাস, উটপক্ষী অথবা ওরাংওটাং। কাজেই বর্ত্তমানে খাঁচার উপর বসিয়া দৃঢ়রূপে কাছা ধরিয়া থাকা ব্যতীত উপায় ছিল না।

কিন্তু যাঁহার জন্য এত, অবশেষে তিনি আসিয়া পড়িলেন, আকাশ পাতাল বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার আগমনীর ভয়ঙ্কর গর্জ্জন বাজিয়া উঠিল। ছেলেবেলায় সেই যে সাতশো রাক্ষসীর মৃত্যুযন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসার কথা শুনিয়াছিলাম—এই ঝড়ের গর্জ্জনের কাছে তাহা নিতান্ত মশার ভ্যান্ ভ্যান্ মনে হইল। টগরের চাপে প্রাণপাখী যখন ধুকিতেছিল তখনও দুর্গানাম জপ করি নাই, কাজেই এখন ত কোন কথা উঠিতেই পারে না। তাহার চেয়ে যে কয় মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া আছি, জীবনের পেয়ালা পরিপূর্ণ করিয়া পান করাই শ্রেয়। মাথার উপর লক্ষ মাণিক জ্বালিয়া যে বিরাট দৈত্য ছুটিয়া

আসিতেছে এবং রূপকথার রাজকুমারীর মত এখনই যে আমাকে কোলে তুলিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিবে, তাহাকেই নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম এবং রসসিক্ত জুতাটি খুলিয়া বাগবাজারের আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে লাগিলাম। সেই সঙ্গে গুন্ গুন্ করিয়া কাকিস্বরে একটি গানও ধরিলাম—

নাতনি, তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে বাঁচিনে,—
নাতজামাই আসবে কতদিনে!

মাঝখানটায় মনে হইল আমরা ডুবিয়া গিয়াছি। কালো জলের ঢেউ আমার নিম্নদেশ স্পর্শ করিয়া বার বার আমাকে আদর করিয়া গেল। খাঁচার মধ্যে আমার বান্ধবগণ ভ্যা ভ্যা করিয়া ইহলীলা সাঙ্গ করিল, আমিই শুধু রহিয়া গেলাম তাহাদের জীবন সঙ্গীতের ধুয়া পুনরাবৃত্তি করিবার জন্য। আমার প্রিয়তম আমায় কোলে তুলিয়া ঘোড়া ছুটাইলেন না বটে, আমার মিষ্ট রসাকুল কণ্ঠতালুতে যে লবণজলের তিক্তপ্রয়োগ তিনি বার বার করিতে লাগিলেন—তাহাতে বড় অভিমান বোধ করিলাম। ইহা ত নিমকি অথবা নোন্‌তা বিস্কুট নহে, তবে মিষ্ট মুখের উপর এসব কেন? খাঁচাবদ্ধ কাছা ও তৎসহিত সম্পূর্ণ পরিধেয়টি প্রিয়ের কবলে ছাড়িয়া দিয়া, এক দৌড়ে ফাষ্টক্লাস ক্যাবিনের ল্যাভেটরির মধ্যে একটি কোণে ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

২

সারারাত্রি পড়িয়া থাকিবার পর সকালে কিরূপে বাহিরে আসিব তাহাই ভাবিতেছি; এমন সময় একজন একচক্ষুমহিলা ল্যাভেটরির

দরজা ঠেলিয়া ভিতরে আসিলেন। বলা বাহুল্য, আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া তিনি জিভ কাটিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি লজ্জার মাথা খাইয়া বলিয়া ফেলিলাম—

"আপনার তবু সেমিজের উপর সাড়িটা আছে, আমাকে একটা দিয়ে দিতে পারেন, নচেৎ দু'জনেরই বিপদ।"

রমণীটি আমার দিকে পিছন ফিরিয়া কহিলেন—"তা নিতে পারেন, তবে আপনাকে একটু উপকার করতে হবে আমার।"

"কি ?"

"আমি নীচে থেকে আসছি, এখানে ডাক্তারবাবুর খোঁজে এসেছিলাম, অমনি মনে করলাম চানটা একেবারে সেরে যাই।" "তা, বেশত সেরে ফেলুন, আমি ততক্ষণ পাশ কাটিয়ে দাঁড়াচ্ছি।" "না, আপনি বরঞ্চ আমার কাপড়টা পরে' নীচে চলে যান, রোহিণীদার কাছ থেকে আমার একখানা কাপড় চেয়ে নিয়ে আসুন, ওই কাছিগুলো যেখানে জমা করে' রেখেছে, তারই আড়ালে তিনি শুয়ে আছেন। বড্ড জ্বর, হুঁহুঁ কচ্চেন, গেলেই শুনতে পাবেন।"

মাত্র সেমিজটি লজ্জা-বস্ত্র রাখিয়া তিনি শাড়ীটা খুলিয়া দিলেন, আমি পশ্চাৎ হইতে তাহা টানিয়া লইয়া কোমরে জড়াইয়া লইলাম। বাহিরে আসিয়াই ডাক্তার-বাবুর সহিত দেখা। কহিলেন—'একস্কিউজ-মি স্যর, একজন মহিলা এইমাত্র বাথরুমে গেলেন না ?" "হাঁ, তিনি এখনও আছেন", বলিয়া আমি হাসিয়া প্রস্থান করিলাম। তিনি আমার পরনের লালপাড় শাড়ীর প্রতি হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। আমি রোহিণী-দার খোঁজে চলিলাম।

পরে জানিয়াছিলাম মেয়েটির নাম অভয়া। মানুষ বশ করিতে তাহার জোড়া নাই। কিইবা পরিচয়! সেই বাথরুমে কাপড় ছাড়া

এবং কাছিুর গাদার আড়ালে ছুই একবার তাহার একচোখের একটুখানি হাসি। অথচ আমি একেবারে আস্ত গাধা বনিয়া গেলাম। যে কয়দিন জাহাজে ছিলাম, কয়বার খাইব, কতক্ষণ শুইব, কখন বাথরুমে যাইব—সব তাহার বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে। সেদিন শেষরাত্রে বিছানায় উঠিয়া বসিতে অভয়া তৎক্ষণাৎ মাথাটি ধরিয়া শোয়াইয়া দিল এবং কানের উপর হাত চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া দিল। আর একদিন বাথরুমে যাইবার উদ্দেশ্যে জলের ঘটিটা হাতে করিয়াছি, অভয়া তখন খাইতেছিল—খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল এবং আমার হাতের ঘটি কাড়িয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—

"বলেছি না, বিকেল চারটার সময়?"

অথচ তাহার সম্বন্ধে কিই বা জানিতাম! বর্ম্মায় চলিয়াছে স্বামী খুঁজিবার জন্য। বিবাহের পর দিনই তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া রেঙ্গুন চলিয়া আসেন, আর খোঁজখবর করেন নাই। বাসরঘরে সে নাকি ঘুমের ঘোরে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিয়াছিল—"রোহিণীদা, আমার ব্লাউজটা খুলে দাওনা ভাই, বড্ড গরম লাগবে।" এই অপরাধ! ইহার জন্য যে ব্যক্তি স্ত্রীত্যাগ করিতে পারে, তাহার নিকট স্ত্রীত্ব দাবী করিয়া অভয়ার কি লাভ হইবে? সেদিন তাহার তারকাহীন বামচক্ষুটির প্রতি চাহিয়া সেই কথাই ভাবিতেছিলাম—রোহিনীদাকে বার্লি খাওয়াইয়া তাঁহার নাকের সিকনি ঝাড়িয়া দিতে তখন তাহার অপর চক্ষুটি ব্যাপৃত ছিল, কাজেই সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

জাহাজ হইতে নামিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে মনুষ্যবাসহীন সমুদ্রতীরে তপ্ত বালির উপর দাঁড়াইয়া যখন দেখিলাম—একপার্শ্বে এক ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, অপর পার্শ্বে একজন একচক্ষু নারী, পার্শ্বে তাহাদের একগাদা

বোঁচকাবুঁচকি এবং এসব গন্তব্যস্থানে পৌঁছানের ভার আমারই উপর, তদুপরি এ সবের মূলে ঐ রমণীর একচোখের একটু হাসি, স্বতঃই প্রবৃত্তি হইল,—ছাতার প্রান্ত দিয়া উহার ঐ অবশিষ্ট চক্ষুটি শেষ করিয়া দিই, সব জ্বালা চুকিয়া যাক!—কিন্তু ঐ অর্দ্ধেক হাসির মধ্যে কি যে ছিল! কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে পোঁটলাপুঁটলিসমেত তাহার রোহিণীদা-কে আমার পৃষ্ঠে বাঁধিয়া দিল এবং সেই রৌদ্রের মধ্যদিয়া আমায় টানিয়া লইয়া চলিল।

চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল, কহিলাম, "এত যখন করলে, গলায় চাট্টি-খানি ঘাস বেঁধে দিলেই পারতে এই ঠাণ্ডায় বেশ চিবুতে চিবুতে খাওয়া যেত!"

সে কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইল না। পেটকাপড় হইতে একটু পাটালি ভাঙিয়া আমার মুখে দিল। কহিল—"জীবনে অনেক বোঝাইত বয়েছেন শ্রীকান্ত বাবু, কিন্তু এমন জীবন্ত বোঝা বইবার সুযোগ আর পাবেন না কখনো তা বলে রাখছি।"

একি নিষ্ঠুর পরিহাস। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমার কণ্ঠতালু ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। চোখের সমুখে তপ্ত বালিতে আগুন ধরিয়া গেল, চতুর্দ্দিকে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। পৃষ্ঠের মোট লইয়া হঠাৎ এক সময় উপুড় হইয়া ভাঙিয়া পড়িলাম, মাটিতে মুখ দিয়া কহিলাম—হায় কচুরি,—আর আমি পারলাম না!

অভয়া আমার পিঠের বাঁধন খুলিয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া কহিল—

"বড্ড তেষ্টা পাচ্চে কি?

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম "হুঁ।"

—কিন্তু জল সে পাইবে কোথায়? অগত্যা রোহিণীদার পকেট হইতে মিকশ্চারের শিশিটা বাহির করিয়া সে তাহারই কোঁটা কয়েক

আমার মুখে ঢালিয়া দিল। আমি চুক চুক করিয়া তাহা শুষিয়া লইয়া অভয়ার গলদেশ ধরিয়া কহিলাম—

"এবার তোমাদের পালা, তোমরা আমায় কাঁধে ক'রে নিয়ে চল।"

কিন্তু কেহই আমাদের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। অগত্যা সেই ঠিক দুপুর বেলা তিন জনে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া সেই শূন্য সমুদ্রতীরে পড়িয়া রহিলাম এবং এক একবার পরস্পর চিমটি কাটিয়া পরখ করিতে লাগিলাম—তিনজনেই বাঁচিয়া আছি কি না। কিন্তু এক যাত্রায় কখনো পৃথক ফল হয় না। যাক সে কথা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণগ্রাস।

চৌকীদার হ'ল যবে গোবর্দ্ধন গোপ,
শালা তার সেই সূত্রে রাখিলেন গোঁফ!

ভ্রম-সংশোধন

বর্ত্তমান সংখ্যার ৭০৮ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ লাইনে "যে বইতে" স্থলে "যে বই" হইবে।

চলচ্চিত্র

ভারতের সামরিক জাতি

তফাৎ কেবল পোষাকে

বর্ষশেষ

হে কুমার হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান

ঝনন ঝনন

সাতের চোখে রবীন্দ্রনাথ

ওরিয়েণ্টাল আর্টিষ্টের সম্পত্তি
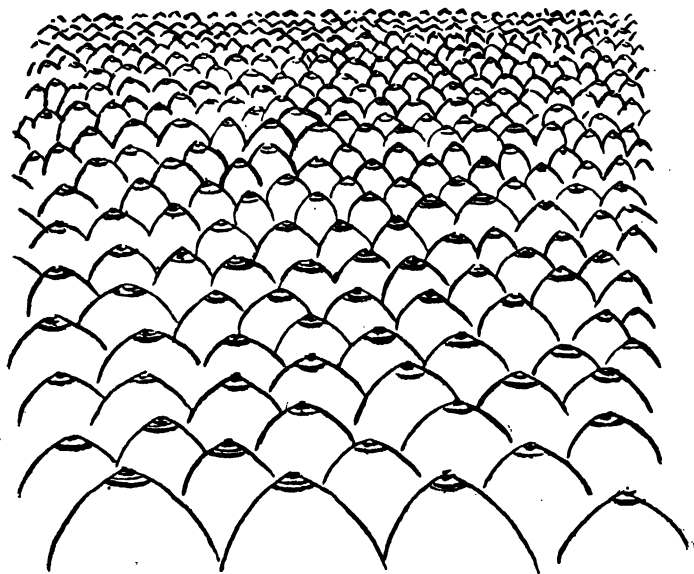
শিল্পের সমাধিক্ষেত্র

সংবাদ-সাহিত্য

গোঁড়ামী আমাদের মজ্জাগত। সুতরাং সমাজক্ষেত্রেই হউক বা মাসিকপত্রের ক্ষেত্রেই হউক একবার যে রীতি বা প্রথা চলিয়া গিয়াছে তাহাকে রদ করে এমন সাধ্য কাহারো পিতার নাই। কথাটা খুলিয়াই বলি। প্রবাসীর ৩৪ বৎসর শেষ হইল। এই চৌত্রিশ বৎসরে ৪০৮ মাসে প্রায় ৪০৮ সংখ্যা প্রবাসী বাহির হইয়াছে। প্রথম হইতে ধারাবাহিক ভাবে সমস্ত সংখ্যা দেখিবার সুযোগ হয় নাই, কিন্তু তবু অনুমান করি, উহাতে আজ পর্য্যন্ত যত স্তনের ছবি বাহির হইয়াছে তাহার সংখ্যা অন্তত দশ হাজার। কাহারো কৌতূহল হইলে গুনিয়া দেখিতে পারেন।

—

আশা করিয়াছিলাম বৈশাখ মাস হইতে প্রবাসী এ বিষয়ে অবহিত হইবেন। আশা করিয়াছিলাম বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি আসিয়া বাঙালী চিত্রকরগণ এইরূপ নানা ছুতানাতায়, কখনো বা সেন্টিমেণ্টাল নামের আড়ালে কখনো বা পৌরাণিক নামের আড়ালে নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি আঁকা বন্ধ করিবেন। আশা করিয়াছিলাম বাংলার সর্ব্বপুরাতন শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রখানা এই সব চিত্রকর নামধারী বর্ব্বরদের ব্যর্থতার বোঝা আর বহন করিবেন না, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। চৈত্রের শনিবারের চিঠি বাহির হইবার মুহূর্ত্তে বৈশাখের প্রবাসী আসিয়া পড়িল—খুলিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইয়াছি।

—

জানি, স্তন বাদ দিয়া স্ত্রীলোকের ছবি কেহ আঁকিতে পারে না অথবা বাদ দিলেই যে তাহা ছবি হয় তাহাও নহে—কিন্তু ইহাও জানি যে ছবি আঁকা না গেলেও স্তন এবং নিতম্ব সকলেই আঁকিতে পারে। কারণ উহা আঁকিতে শিল্পী হইবার প্রয়োজন হয় না, একটু কৌশলী হইলেই হয়। অর্থাৎ হাত যদি একেবারেই না চলে তাহা হইলেও ক্ষতি নাই, কম্পাস ঘুরাইলেই মিমিটে তিন চারি জোড়া স্তন এবং এক জোড়া নিতম্ব আঁকা যাইতে পারে।

—

প্রবাসী ৩৪ বৎসর ধরিয়া এই ফাঁকির হাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। "ওরিয়েন্টাল" আর্ট নামক ধাপ্পাবাজির (শতকরা ৯০ ধাপ্পাবাজী) আশ্রয়ে বহু কৌশলী আসিয়া তথায় ভীড় করিয়াছে। আর্টের সঙ্গে যেদিন "ওরিয়েন্টাল" বিশেষণ যুক্ত হইল সেই দিন হইতে আমরা কেবল ওরিয়েন্টাল স্তনই দেখিতেছি, আর কিছু বড় একটা দেখিতেছি না। স্তনরূপই যদি ওরিয়েন্টাল আর্টের একমাত্র রূপ হয় তাহা হইলে ইহার আর্ট নাম ঘুচাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

—

স্তন-কলা ওস্তাদগণ কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছে না। এই 'কলা' নানা নামে প্রকাশিত হইতেছে। নাম না থাকিলে ইহার কোনো মূল্যই নাই, ওস্তাদেরা তাহা জানে। বৈশাখের প্রবাসীতে "লঙ্কাদহন কালে" এই নামের আশ্রয়ে এবারে শুধু স্তন নহে অধস্তন অংশও অঙ্কিত হইয়াছে। লঙ্কা দহন বাজে কথা। চারিদিকে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা মেঘও হইতে পারে আগুনও হইতে পারে, জলও হইতে পারে। কিছু যায় আসে না। স্তন থাকিলেই আমরা ধন্য।

—

ইহার চেয়ে ফোটোগ্রাফ অনেক ভদ্র। কেননা তাহাতে যাহা যথার্থ তাহাই থাকে, এরূপ বাড়াবাড়ি থাকে না। পপুলার হওয়াই যদি প্রবাসীর একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এই "স্তন-কলা" ত্যাগ করিয়া ফোটোগ্রাফ ছাপিতে থাকুন, এবং সিনেমার কৃপায় তাহার অভাবও হইবে না।

—

তবে এই চৌত্রিশ বৎসরের মধ্যে প্রবাসী একটি মাত্র ছবির জন্য প্রশংসা পাইতে পারেন। চৈত্র সংখ্যায় "নীল বালিকা" নামক একটি ছবি আছে। আমরা আনন্দের সঙ্গে সকলকে জানাইতেছি যে বালিকাটি যথার্থই নীল। এই ধরনের ছবিতে চিত্র-পরিচয় দিতে হয় না, কাহাকেও কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, সব দিকেই সুবিধা।

—

রবীন্দ্রনাথ "সে-কালিনী"র উত্তর দিতে গিয়া derailed হইয়া পড়িয়াছেন। কবির পয়েন্টসম্যান কি একেবারেই বিদায় লইয়াছে?

এক সবুর কর আরো কিছু বলে যাই
কথার চরম পারে তারপরে চলে যাই।
যে গিয়েছে তার লাগি খুঁচিয়োনা চেতনা
ছায়ারে অতিথি ক'রে আসনটা পেত না।

* * *

একটা কিছু বলিতে গিয়া অন্য আর একটা কিছু বলিবার প্রবৃত্তি বয়সের সঙ্গে বাড়িবে, কেহই রোধ করিতে পারিবে না; কিন্তু অনাবৃষ্টি এবং অতিবর্ষণের মধ্যে একটু সামঞ্জস্যও কি আমরা আশা করিতে পারি না?

—

বাংলাদেশের মহিলা-কবিদের মধ্যে বর্ত্তমানে শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী শ্রেষ্ঠ ইহাই আমাদের মত। কিন্তু শুধু একথা বলিলে বিশেষ কিছুই বলা হয় না, কেননা তুলনা করিবার মত আর কাহাকেও ত দেখি না। তাঁহার ভ্রষ্টলগ্ন পড়িলাম। সমবেদনা অনুভব করিতেছি, বস্তুত ইহা ছাড়া আর কি করিতে পারি?

তোমার আমার যাত্রা এক লক্ষ্যে আজি আর নহে,
—ভিন্ন মুখে চলেছি উভয়ে!
চলে বিপরীত মুখে দুইখানি জীবনের রথ,
—নির্ব্বাচিয়া নিজ নিজ পথ!
তবুও বিশুষ্ক আঁখি আজো মোর ভরে আসে জলে
একদা চেয়েছি যারে তারেই ফিরাতে হ'ল বলে'।
দুর্লভ বল্লভ মম দ্বারে এল অকিঞ্চন-বেশে,—
আমার প্রেমের মৃত্যু শেষে।

আমাদের নরেনদা কিন্তু অনেকদিন কবিতা লেখেন না।

—

ইংরেজিতে একটি গল্প আছে—

পিতা ও পুত্র ভোজ খাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ জাগিয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন তাহাকে কিঞ্চিৎ সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পিতা বলিলেন—প্রিয় পুত্র, ঐ যে দুটো মোমবাতি দেখছ—ঐ দুটোকে যখন চারটে মনে হবে তখন উঠে বাড়ি যেয়ো।

পুত্র বলিল, ধন্যবাদ পিতা, কিন্তু মোমবাতি দুটো নয় ওখানে একটা রয়েছে—সুতরাং আপনি যখন ইতিমধ্যেই

একটাকে দুটো দেখছেন—আপনারাই কি এখন উঠে বাড়ি যাওয়া উচিত নয়?

এইরূপ একটাকে দুইটা দেখা বা দুইটাকে চারিটা বলিয়া ভুল করার গল্প এদেশেও আছে। অনেকেই জানেন, জনৈক ফুটবল খেলোয়াড় খেলিবার সময় দুইটি বল দেখিতে পাইত এবং বিভ্রান্ত হইয়া কোনটা মারবো, কোনটা মারবো, করিয়া চীৎকার করিত।

—

বৈষ্ণবীয় শাক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তিনজন চণ্ডীদাস দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের অনুরোধ, তিনি যেন এখন হইতে চণ্ডীদাসের সংখ্যা অযথা না বাড়াইয়া নিজের চক্ষু সম্বন্ধে অবহিত হন।

—

বাহিরে বৃদ্ধ হইলেও অনেকে অন্তরে তরুণ থাকিতে পারেন, অনেক বৃদ্ধের নিকট হইতে আমরা এইরূপ শুনিয়াছি। কিন্তু কোনো কোনো প্রবীণ যে অন্তরে এবং বাহিরে উভয় দিকেই "তরুণ" সাজিবার জন্য লালায়িত ইহা জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তারুণ্যের লক্ষণ কি তাহা পূর্ব্বে বহুবার আলোচিত হইয়াছে সুতরাং এখানে আমরা উহার একটিমাত্র রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হইব। একটি গল্পের অংশ (বঙ্গশ্রী)—

আদীশ্বর কহিল—এ আপনাদের কিসের দল বেরিয়েছে?

এখনো চড়কের দেরী আছে। আজ সবে এই চোৎ।

তারুণ্যাক্রান্ত না হইলে এরূপ লেখা যায়? নর্মাল মানুষ কখনো "ত" হইতে "ৎ"-তে নামিতে পারে? পুত্র পুৎ, রাত্রি রাৎ, বেত্র বেৎ হয়? না হইলে চৈত্র চোৎ হইল কেমন করিয়া? কিন্তু যাহাই হউক একটি বিষয়ে লেখকের সংযমের পরিচয় পাইলাম। লেখক "জাৎ"-তরুণ

হইলে তাঁহার হাতে "হেই. চোৎ" সংক্ষিপ্ত হইয়া "পাঞ্চোৎ" রূপ ধারণ করিত এবং সেক্ষেত্রে ভাষার উপর অত্যাচার আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিত। লেখক তাহা করেন নাই।

—

শ্রীকাঞ্চনমালা দেবী কোন শতকের লোক জানি না। তিনি বঙ্গশ্রীতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কল্পনা করিয়া আমরা মুহুর্মুহু শিহরিয়া উঠিতেছি। তাঁহার পিতামহী কি রাক্ষসবংশীয়া ছিলেন? শ্রীযুক্তা কাঞ্চনমালা লিখিতেছেন—

> আমার পিতামহী তখন জীবিতা ছিলেন। আমার মাথার রক্তমাখা পটী দেখিয়া তিনি "হাউ মাউ খাউ" করিয়া উঠিলেন। মা আসিয়া খানিক্ষণ "থ" হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর কোনো কথা না বলিয়া গুম্ গুম্ শব্দে আমার পৃষ্ঠে কিল বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর মা আবার "হাউ মাউ খাউ" করিয়া উঠিলেন।

আশা করি এই ঠাকুর-মা সত্য সত্যই রক্তপান করেন নাই।

—

সংবাদপত্রের একটা কর্ত্তব্য এই যে সে কোনো কারণেই দেশের ক্ষতি করিবে না, বরঞ্চ দেশের যাহাতে উপকার হয় তাহাই করিবে। কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম, কিছুদিন হইল সংবাদ পত্রে দেশের ক্ষতিই হইতেছে। আমরা কয়েকখানা চিঠি পাইয়াছি, তাহাতে লেখকগণ এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, যেহেতু মেয়র-মামলা, ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা ও অন্যান্য চিত্তাকর্ষক মামলার খবর দৈনিক কাগজ সমূহে প্রতিদিন একই তারিখে এক সঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে, এবং

প্রত্যেকটি সংবাদের কিস্তীই অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইতেছে ; এবং যেহেতু, যাঁহারা স্নানাহার সমাধা করিয়া সাড়ে নয়টায় অফিসে ছোটেন তাঁহাদের পক্ষে এখন আর সময়মত অফিসে যাওয়া ঘটিতেছে না, সেই হেতু তাঁহারা মনে করেন, সংবাদপত্রসমূহ যদি অধিকসংখ্যক মনোহারী সংবাদের সুদীর্ঘ কিস্তিগুলি একই দিনে ছাপাইবার নীতি ত্যাগ না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের চাকুরি যাইবে, তাঁহারা পুনরায় নূতন চাকুরি জুটাইতে পারিবেন না এবং তাহাতে দেশের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে।

—

আমাদের মনে হয় এইরূপ সংবাদের কপিরাইট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কপিরাইট নিলামে বিক্রয় হইবে—এবং যিনি কিনিবেন তিনি নিজের কাগজে সংক্ষিপ্ত কিস্তিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহা প্রকাশ করিবেন। এরূপ করিলে কাগজের যে লাভ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য কিন্তু ঐ সঙ্গে দেশেরও উপকার হইবে।

—

হর্ষ এবং বিষাদের সংমিশ্রণে দুর্য্যোধনের মৃত্যু হইয়াছিল কেন তাহার কারণ নির্ণয় করা সহজ নহে। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, যে কোনো উত্তেজনাতেই—(শুধু হর্ষে বা শুধু বিষাদেও) মৃত্যু হইতে পারে। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের অবস্থা যদি ভাল থাকে তাহা হইলে হর্ষ এবং বিষাদ—neutralised হইয়া যাইবে—দেহের উপর কোনোই ক্রিয়া প্রকাশ করিবে না। সম্প্রতি আমাদেরও একটি ব্যাপারে যুগপৎ হর্ষ এবং বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু মৃত্যু হয় নাই। এবং হয় নাই বলিয়াই গবেষণা করিবার প্রবৃত্তি হইল।

—

১২ই এপ্রিলের অমৃত বাজার পত্রিকায় লেখা হইয়াছে—

> We have every sympathy for the movement which has set on foot in Calcutta to purify the moral atmosphere of the c ountry by discouraging the publication of obscene literature and the exibition of immoral films.

কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপনগুলি প্রতিদিন বাহির হয় পত্রিকার সম্পাদকীয়-লেখক তাহা পাঠ করেন কি?

—

Ultra voilet ray কি বাংলায় "পিঙ্গলোত্তর"? এই পরিভাষা কে করিয়াছেন জানিনা। পৃথিবী কখন কাহার চোখে কিরূপ বর্ণ ধারণ করে তাহাও আমরা বুঝিনা—কিন্তু বর্ণান্ধের সংখ্যা যে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিংবা, হয়ত আমাদেরই ভুল। কোনো কোনো দেশে হয়ত পিঙ্গলবর্ণের বেগুনই ফলিয়া থাকে।

—

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম উদয়ন সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিল দে মহাশয় কৃতিত্বের সহিত দুই বৎসর উদয়ন পরিচালনা করায় একটি সোনার মেডাল পাইয়াছেন। উক্ত মেডাল কে দিয়াছে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু যিনিই দিয়া থাকুন, তাঁহাকেও সৎসাহসের জন্য একটি মেডাল দেওয়া আবশ্যক। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশের অন্য কোনো সম্পাদক পত্রিকা-সম্পাদনা করিয়া আজ পর্য্যন্ত কোনো মেডাল পাইয়াছেন কিনা তাহা জানিনা, বোধ হয় পান নাই, কেননা মেডাল পাওয়া বিশেষ শক্ত না হইলেও এই শঠতাপূর্ণ পৃথিবীতে মেডাল দিবার

...জিয়া পাওয়া যায় না। আমরা পরম্পর শুনিতে পাইলাম ... উদয়নের তৃতীয় বর্ষে একটি 'কাপ' এবং চতুর্থ বর্ষে একটি ...ল্ড পুরস্কার পাইবেন।

আনন্দবাজারে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে—জনৈক বাঙালী পদব্রজে চন্দননগর গিয়াছেন। আমরা জানি প্রতিদিন সহস্র সহস্র বাঙালী পদব্রজে গৃহ হইতে গৃহান্তরে গলি হইতে গল্যান্তরে অথবা পাড়া হইতে পাড়ান্তরে গিয়া থাকেন কিন্তু হায়, তাহাদের প্রতি আনন্দবাজারের কোনো দরদ নাই!

স্যর রাজেন্দ্রনাথের জন্ম-বর্ষ নির্দেশক, প্রত্যহ-স্মরণীয়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় চৈত্রের বঙ্গলক্ষ্মীতে ("মহিলা সমাচার" প্রবন্ধে) "বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণে মহিলা" নামক অধ্যায়ে বেলা দেবী, কল্যাণী চক্রবর্ত্তী, লাবণ্যলতা সেন প্রভৃতি নামের সঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভদ্রা খাঁএর নাম জুড়িয়া দিয়াছেন। আমরা ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। প্রফেসরের গোঁফ লাগাইয়া ছাত্র সাজার কথা শুনিতেছি, কিন্তু হঠাৎ একজন পুরুষের মেয়েদের দলে নাম লিখাইবার বাসনা হইল কেন? না ইহা ঘোষ মহাশয়ের মৌলিকত্ব?

"টলটল" "টলমল" প্রভৃতি শব্দগুলি লইয়া বাঙালী লেখক বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র "টলমল করিয়া চলেন"। পাথেয় নামক সাপ্তাহিকে দেখিতেছি—

> তাই কদিন ধ'রে দুই পক্ষের সংযুক্ত অধিবেশন হলেও
> মিটমাট 'হইলে হইতে পারে' অবস্থায় টল্‌টল্ করছে।

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

প্রবন্ধের মধ্যে বিজ্ঞাপন

সাধারণের পাঠ্য সাময়িকপত্রে বা সংবাদপত্রে কোনো চিকিৎসা-ব্যবসায়ী চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে জনসাধারণকে ডাক্তার বানাইবার উদ্দেশ্যে কোনোরূপ প্রবন্ধাদি লিখিবেন না, অন্ততঃ ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনো কথাই লিখিবেন না,—চিকিৎসা-জগতে এই নিয়ম বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। এ পর্য্যন্ত এই নিয়মের বড় কেহ ব্যতিক্রম করেন নাই; যাঁহারা রোগাদি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন তাঁহারা সাধারণের যাহা জ্ঞাতব্য তাহাই সাধারণভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে কয়েকটি ঔষধ সম্বন্ধে এবং বিশেষ করিয়া 'সিরোলিন রচি'র যক্ষ্মারোগ আরোগ্যের অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে কয়েকজন চিকিৎসক সাধারণ পত্রিকায় মুক্তপ্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদি তাহাতে সত্যকথা লেখা থাকিত তবুও তাহা অব্যবসায়ীর কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু তাহাও নহে,—যাহা কিছু লেখা হইতেছে তাহা অবিমিশ্র মিথ্যা। ঔষধবিক্রেতারা যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করে তাহাতে কেবল সত্য কথাই অতি-রঞ্জিত করিয়া লেখে। কিন্তু এই সকল প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সত্যের একেবারে বিপরীত কথা,—যাহাকে ইংরেজীতে বলে "misrepresentation and misstatement of facts." এ পর্য্যন্ত ইহার কেহ প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করেন নাই, কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে আপনারা জনসাধারণের পক্ষ হইতে ইহার প্রথম প্রতিবাদ বাহির করিয়াছেন, এবং একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসকও আপনাদের কাগজেই তাহা সমর্থন করিয়াছেন। যাহাতে জনসাধারণের ভ্রান্ত

ধারণা দূর হইয়া যাইতে পারে সেজন্য সাময়িক পত্রিকার মারফতেই সত্য প্রকাশিত করা ছাড়া অন্য উপায় নাই, সেজন্য চিকিৎসক হইয়াও আপনাদের পত্রিকাতে ইহা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

ঐ সকল প্রবন্ধের দ্বারা জনসাধারণের কিরূপ অনিষ্ট করা হইয়াছে তাহা দেখুন। সম্প্রতি একটি যক্ষ্মারোগী আমার নিকট চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছিল। আমি তাঁহার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করিবার পর তাহার আত্মীয় আমাকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ইহা তো টি-বি? তবে আপনি আজকালকার নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ দিতেছেন কেন? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি নূতন ঔষধ? তিনি বলিলেন,—কেন সিরোলিন রচি! আজকাল সকলেই এ-কথা জানে আর আপনি জানেন না? টি-বি স্যানিটেরিয়মে ঐ-ঔষধ ছাড়া আর কোনো ঔষধই আজকাল দেওয়া হয় না তাহা কি আপনি পড়েন নাই? আমরা সাধারণ কাগজে পর্য্যন্ত এ কথা দেখিতেছি, আর আপনারা এখনও সেই সেকেলে চিকিৎসা চালাইতেছেন? আমি তাঁহার কথায় অবাক হইয়া গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম কি কি কাগজে আপনি উহা পড়িয়াছেন জানিতে পারিলে আমি উপকৃত হইব। তিনি কয়েক দিন এক তাড়া কাগজ আনিয়া হাজির করিলেন,—দেখিলাম সকল কাগজেই—ইহা প্রবন্ধাকারে লেখা এবং তাহার অধিকাংশই পাস করা চিকিৎসকের নামে লেখা। ইহা যে মিথ্যা কথা তাহা তাঁহাকে বোঝানো আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

'সিরোলিন রচি' বস্তুটি কি জানেন? পূর্ব্বে যাহার নাম ছিল 'সিরাপ থিয়োকল' তাহারই বর্ত্তমান নাম ঐ রাখা হইয়াছে। ইহা নূতন জিনিষ নয়। থিয়োকলের সহিত সিরাপ মিশাইয়া ইহা মুখরোচক করিয়া প্রস্তুত করা হয়। এই থিয়োকল পূর্ব্বে অনেকেই যক্ষ্মা রোগে

ব্যবহার করিতেন, আজকাল বড় কেহ করেন না। পূর্ব্বে চিকিৎসকগণের ধারণা ছিল যে কোনোরূপ তেজী এন্টিসেপ্টিক প্রয়োগ করিতে পারিলে টি-বি মরিয়া যাইবে। সেই জন্যই প্রথমে কার্ব্বলিক হইতে প্রস্তুত ক্রিয়োজোট নামক ঔষধ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পরে উহা অতি দুর্গন্ধ বলিয়া তাহা হইতে 'গুয়েকল' ও পরে উহা হইতে 'থিয়োকল' (ডাক্তারী নাম Potas. guaiacol sulphonate) প্রস্তুত হইল। কিন্তু শীঘ্রই সকলে বুঝিলেন যে ওই সকল ক্ষীণ প্রচেষ্টা কিছু কাজের নয়। টি-বি মারিতে যে পরিমাণ এন্টিসেপ্টিক আবশ্যক তাহাতে রোগী পর্য্যন্ত মারা যাইবে। সেইজন্য এন্টিসেপ্টিক চিকিৎসা বর্ত্তমানে একরূপ বর্জ্জিতই হইয়াছে। পরে আরো জানা গিয়াছে যে থিয়োকল খাইলে কিছুই ফল হয় না, উহা যে অবস্থায় খাওয়া যায় ঠিক সেই অবস্থাতেই উহা অবিকৃত ভাবে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, উহার কিছুই হজম হয় না।

এই obsolete থিয়োকলের সিরাপের নামই 'সিরোলিন রচি'। কোনো চিকিৎসককে যক্ষ্মা রোগে সিরোলিন রচি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে দেখি নাই। কোনো স্যানিটেরিয়মের রিপোর্টে উহার উল্লেখ দেখি নাই। ইহা সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত বলিয়া হয়তো ঐ দেশের স্যানিটেরিয়মে দেশপ্রীতির জন্য কেহ কেহ উহা ব্যবহার করিয়া থাকিতে পারেন তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো স্যানিটারিয়মে উহা ব্যবহৃত হইতেছে এ কথা শুনি নাই। উহা খাইতে সুস্বাদু বটে, মিকশ্চার মিষ্ট করিবার জন্য কোনো কোনো চিকিৎসক মধ্যে মধ্যে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ-কথাও সত্য বটে, সর্দ্দি কাশি ও নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে অন্যান্য পাঁচটা ঔষধের সহিত ইহা দিলে কোনো ক্ষতি

নাই, সে কথাও সত্য বটে; কোনো কোনো পেটের পীড়ায় ইহাতে উপকার হয় বটে, কিন্তু ইহা যে যক্ষ্মার জ্বর বন্ধ করিতে পারে, বা শরীরের ওজন বাড়াইতে পারে, বা রোগের অন্যান্য উপসর্গ দূর করিতে পারে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

যে সকল ডাক্তার ঐ ভুল কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাঁহাদের খুবই অন্যায় হইলেও সমস্ত দোষ কেবল তাঁহাদের নয়। তাঁহারা স্বপ্রবৃত্ত হইয়া কখনই এ সকল কথা লেখেন নাই, হয়তো রচি কোম্পানির প্রতিনিধির আজ্ঞায় ঐরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা উক্ত কোম্পানির নিকট হয়তো কোনো না কোনো প্রকারে বিত্ত অর্জন করিয়া থাকেন এবং প্রভু যখন কিছু করিতে আদেশ করেন তখন তাহা অন্যায় হইলেও না করিলে অন্ন সংস্থান হয় না। কাগজওয়ালারাও যে ইহার জন্য খুব বেশী দোষী এ কথা বলা যায় না, কারণ কোম্পানি লোভ দেখান যে বিজ্ঞাপন হিসাবে ছাপিলে যাহা প্রাপ্য হইবে প্রবন্ধ হিসাবে ছাপিলে তাহার চতুর্গুণ-প্রাপ্য হইবে।* কাগজওয়ালারা ভাবে, রোগের ঔষধ তো বটে, খাইলে কিছু না কিছু উপকার তো হয়ই, যা লেখে তাই ছাপাইয়া দিই। আমি জনৈক কাগজওয়ালার মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছি যে রচি কোম্পানি এইরূপ প্রস্তাব করিয়া থাকে: কোম্পানির প্রতিনিধির একজন টাইপিষ্ট আছে, কোনো কাগজওয়ালা বিজ্ঞাপন লইতে গেলেই তাহাকে সাহেব জিজ্ঞাসা করে এই কাগজ কেমন কাটে জানো? সে যেমন উত্তর দেয় সেই অনুসারে সাহেব নিজেই বিজ্ঞাপনের মূল্য ধার্য্য করিয়া দিয়া বলে বিজ্ঞাপন

---

* শুনিয়াছি অনেক ক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে, বিজ্ঞাপনের সাধারণ দরেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ. চি. স

হইলে ৩৲ টাকা, প্রবন্ধ হইলে ১২৲ টাকা, কোনটিতে রাজী আছ বল? অন্যান্য কোম্পানি নিজেদের ঔষধ লইয়া কেবল ডাক্তারদের কাছেই ক্যান্‌ভাস্ করিতে যায় কিন্তু ইহারা তাহাও যায় না, কারণ ইহারা জানিয়াছে ডাক্তারদের দ্বারা ইহার তেমন কাটতি হইবে না। এমন কথাও নাকি তাহারা বলে—"If we can capture the public we do not care for the doctors"। এই না কি তাহাদের পলিসি।

সিরোলিন রচির বাজারে খুব কাটতি হইতেছে এ কথা সত্য; কিন্তু এ কাটতি কত দিন চলিবে? লোকে অধিক দিন প্রতারিত হইয়া থাকে না,—শীঘ্রই ভুল ভাঙিয়া যায়। সিরোলিন খাইলেই যক্ষ্মা হইতে রক্ষা পাইবে এ কথা বলার মত পাপ আর নাই। ইহাতে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া রোগীকে মৃত্যুর পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হয়। অন্য দেশ হইলে রোচি কোম্পানির এ কথা প্রচার করিতে সাহস হইত না, এবং নিজেদের দেশেও তাহারা সাধারণ পত্রে এরূপ প্রবন্ধ লিখাইতে হয়ত সাহস করে না, কেননা তাহারা জানে যে এরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ দণ্ডিত হইতে হইবে। সম্প্রতি কোনো জার্ম্মান কোম্পানি আমেরিকাতে এস্‌পিরিন সম্বন্ধে সাধারণ স্থানে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছিল—"ইহাতে সকল রকমের ব্যথা আরোগ্য হয়" কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়, তথাপি অতিরঞ্জন করিয়া বলার অপরাধে তাহাদের শাস্তি হইল। কিন্তু আমাদের দেশে মিথ্যা কথা বলার কোনো শাস্তি নাই, যার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলে। তথাপি অদূর ভবিষ্যতে শাস্তি আপনিই উপস্থিত হইবে এ কথা নিশ্চয়। রচি কোম্পানির আরো কয়েকপ্রকার ভাল ভাল ঔষধ আছে। লোকে যখন দেখিবে সিরোলিন সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহা সত্য নয়, তখন উহাদের কোনো ঔষধেই আর বিশ্বাস থাকিবে না।

যে ঔষধ বাস্তবিকই উপকারী বিশেষতঃ যে ঔষধ যক্ষ্মারোগে উপকারী, তাহার জন্য ঢাক পিটাইবার আবশ্যক হয় না। ম্যালেরিয়ার কয়েকটি নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, কোনো সাধারণ পত্রে তাহার জন্য ঢাক পিটানো হয় নাই, অথচ ইতিমধ্যে সুদূর পল্লীবাসীরাও তাহা জানিয়া গিয়াছে।

আরো এক কথা। চিকিৎসকের লেখা প্রবন্ধ হইলেই তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাহা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তাহাতে প্রতি কথায় নজির (data) দেওয়া থাকিবে, বিনা নজিরে কোনো কথাই ধর্ত্তব্য নয়,—কোনো মহাপুরুষ বলিলেও নয়। চিকিৎসক যদি বলিতেন যে অমুক অমুক তারিখে এতগুলি রোগীকে সিরোলিন খাইতে দিয়াছিলাম তাহাদের পূর্ব্বে এত জ্বর ছিল আর সিরোলিন খাইয়া তাহা এই পরিমাণে কমিয়াছে, ইহা আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি তাহা হইলে বিশ্বাস করিতাম। তিনি যদি বলিতেন অমুক অমুক স্যানিটেরিয়মে অমুক অমুক শালে এতগুলি রোগীকে সিরোলিন দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে এতগুলি মরিয়াছে ও এতগুলি বাঁচিয়াছে, তবে সে কথা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু কোনো চিকিৎসক এরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া কিছু লেখেন নাই, সকলেই ভাসা উড়ো ভাবে লিখিয়াছেন। সুতরাং বিজ্ঞাপন দেখিলে যেমন তাহা অগ্রাহ্য করি, এই সকল প্রবন্ধ দেখিলে জনসাধারণ তাহা সেইরূপ অগ্রাহ্য করিবেন। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে চিকিৎসক হইয়াও কেহ কেহ সামান্য লোভে পড়িয়া এইরূপ উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য
ডি-টি-এম্